এবং তুমি

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

কথা ও কাহিনী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ বালি-দুর্গাপুর
জিলা ঃ হাওড়া, পিন ৭১১২০১

মুদ্রক ঃ গীতা প্রিন্টার্স
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

এবং তুমি

॥ সূচীপত্র ॥

॥ স্বর্ণলতা ॥

স্বর্ণলতা নিজের জীবনটাকে একটা 'চ্যালেঞ্জের' মতো বেঁচে নিলেন। আমার ছোটবেলায় ওঁকে দেখেছি ; সচল, কর্মঠ, নিপুণ। দৃঢ়চেতা, সিদ্ধান্তে তৎপর এবং সর্বত্রই আন্তরিক। তখন আমার দেখার দৃষ্টিটি ছিল তরুণ আর ছটফটে। তাই স্বর্ণলতার ভিতরের শক্তি, মনোভাবের প্রসারতা আর দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ধরা পড়ে নি। পড়ার কথাও নয়। তবে সকলের মুখে, বিশেষ করে বড়োদের বিচারে, স্বর্ণলতার বার বার উল্লেখ আমাদের সেই তরুণ বয়সেও ওঁর বিষয়ে সচেতন করে তুলেছে।

তার পরে বহুদিন পার হয়ে গেছে! কতো ঝড়-ঝঞ্ঝা, উত্থান-পতন, কতো পরিবর্তন কতো সংঘর্ষ-সংগ্রাম পার হয়ে সময় কোথা থেকে কোথায় এনে ফেলেছে আমাদের সকলকেই তার আর লেখা-জোখা নেই। শান্ত গ্রাম্য জীবনের পটভূমি ছেড়ে একদিন হঠাৎই দেশ বিভাগের বলি হয়ে স্বর্ণলতা তাঁর সংসার গৃহস্থালী নিয়ে দেশছাড়া হয়েছিলেন। রোদ-বৃষ্টির সঙ্গে সদা-পরাজিত যুদ্ধে, ক্ষুধা আর অভাবের তাড়নায় বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। আর্থিক অসঙ্গতি আর অক্ষম ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়ায় স্বর্ণলতা কোনওক্রমে সংগ্রহের সবটুকু দিয়ে একটা আস্তানার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। সম্পন্ন অতীত, বিধ্বস্ত বর্তমান আর আশাহীন ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায়, প্রৌঢ়ত্বের হীনবল দেহে আর সব হারানোর হাহাকার বুকে নিয়ে তাঁর স্বামী শেষ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে প্রাণবায়ুটুকুকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

তার পরের দীর্ঘ ইতিহাস স্বর্ণলতার নীরব যুদ্ধের ইতিহাস। নিঃস্ব, সর্বথা রিক্ত পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁর সেই মহাযুদ্ধ চলেছিল প্রায় চল্লিশ বছর। সে সবই আজ ইতিহাস, সার্থকতার ইতিহাস। শতছিদ্র সংসার তরীখানি, ভাঙ্গাহাল ছেঁড়াপাল, কোন্ বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, কোন্ দিক নির্দেশ কুশলতায় আর কোন্ ধ্রুবের টানে যে স্বর্ণলতা একদিন সঠিক সুস্থিত কূলের সন্নদ্ধতায় দৃঢ় করে বেঁধেছিলেন, সে বিবরণও আজ ইতিহাস।

বার্ধক্যের স্বর্ণলতাকে যেন অনেক কাছে থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তাঁর মনের দৃঢ়তার উৎসটুকু যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল খুবই সহজে। বৃদ্ধাবস্থা ব্যক্তিকে দুর্বল করে দেয় শরীরে, মনে। খিট্‌খিটে, অতীত-মুখী করে তোলে,—মেজাজে, মর্জিতে। বার্ধক্য ব্যক্তিকে অকারণ সমালোচনায় তীক্ষ্ন কণ্ঠী করে তোলে—এরকম কতো অভিযোগই তো সংসার-সমাজ ছুঁড়ে দেয় বৃদ্ধ সময়টার দিকে! প্রজন্ম প্রভেদ, মূল্যবোধের আত্যন্তিক পরিবর্তন, আশা-আকাঙ্ক্ষার মেরু-বিবর্তন—সব মিলিয়ে যেন অচেনার ঘেরাটোপে বার্ধক্য সময় নিজেকেও হারায়, অপরকেও খুঁজে পায় না। এটাই স্বাভাবিক, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয়। স্বর্ণলতার বার্ধক্য-সময় দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম, আমার নোতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হয়েছিল। স্বর্ণলতার সেই ক্ষমা-সুন্দর দীর্ঘজীবন থেকে আমার জীবনের শেষ-সময়টুকুর জন্যে প্রদীপ জেবলে নিতে চাই।

স্বর্ণলতার সংসার বলতে তখন তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, চারটি নাতি-নাতনী। পরে বেড়ে হল সাতটি। একই মেঝেতে পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী নিয়ে এই যে সংসার একে কোনও অবস্থাতেই ছোট বলা যায় না। তবে স্বর্ণলতার অতীত জীবনে সংসারের সংখ্যাগত পরিমাপ তাঁর বর্তমানের সংসারকে বৃহৎ বলে মনে করে নি। স্বাভাবিকই ছিল। তবে যেটা অস্বাভাবিক ছিল তা স্বর্ণলতার জীবন-দর্শন। সে কথাতেই আমার এই উপস্থাপনা।

স্বামীর মৃত্যুর সময়ে স্বর্ণলতার দায় ছিল চারটি নাবালক পুত্র ও একটি অবিবাহিতা কন্যা। বড়টি, পুত্র, তখন উনিশ বছর; ছোটটিও পুত্র, কালাজ্বরের শিকার, পাঁচ বছর। দ্বিতীয় দায়, কন্যা, পনেরো। আঁচলে চোখের জল মুছেই তিনি ঘোষণা করলেন সব দায় ধীরে ধীরে বহন করবেন, কন্যাদায় কিন্তু সত্বর উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। বিদুরের ক্ষুদ যে অর্থের সঞ্চয়টুকু আছে আর ব্যাঙের আধুলি যে স্বর্ণালংকার তাঁর সঙ্গে আছে তা সবই কন্যাদায়ের উদ্ধারে ব্যয় হবে। এবং, স্বামীর শেষ কাজের জন্যে অযথা দরিদ্রতর হওয়া স্বর্ণলতার মনঃপূত নয়।

আত্মীয়স্বজন অনেকেই এসেছিলেন, পরামর্শের কোনও ঘাটতি কোথায়ও দেখা গেল না কিন্তু স্বর্ণলতা নীরবে সকলের কথাই শুনলেন আর নিজের নির্ধারিত নীতিতে এবং সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। স্বামীর কাজ মিটে গেল,

দ্বিতীয় পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হয়ে একরাত্রের মধ্যেই মারা গেল, বছর না ঘুরতেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে, বুকে পাথর বেঁধে স্বর্ণলতা অবশিষ্টদের নিয়ে কঠিন হাতে সংসারের হাল ধরলেন।

স্বামীর মৃত্যুর ছ'বছর পরে পুত্র বিবাহ করল। পাত্রীর যোগ্যতা বিষয়ে স্বর্ণলতার কোনও দ্বিমত ছিল না, কিন্তু মৃদু বাধা দিলেন প্রায় পনেরো বছর আগে বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যার অমতকে স্মরণ করে। এই মত বিরোধকে কেন্দ্র করে কোনও দীর্ঘ অঙ্ক বিন্যস্ত নাটক করলেন না, ছেলের সঙ্গে কথা বলে, মাতাপুত্র উভয়েই ক'এক ফোঁটা চোখের জলে মতবিরোধের মীমাংসা করে ফেললেন। অনুপস্থিত স্বামীর স্মৃতি একদিকে, অন্যদিকে পিতার অভাব, উভয়কেই সহজে একসূত্রে গেঁথে দিল।

বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণলতা মনে মনে সন্ন্যাস নিলেন। পুত্রবধূকে সব বুঝিয়ে দিলেন, স্বল্পকথায় সংসারের অতীত, বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে তার আঁচলে সংসারের চাবিটি ছেড়ে দিলেন। স্বর্ণলতা একেবারেই দর্শক হয়ে গেলেন। এক দিনের জন্যেও নিজের মতামত ভাললাগা মন্দলাগা দিয়ে পুত্র-পুত্রবধূর নবজীবনে ছায়া ফেললেন না, অন্যান্য ছেলেদের ভালমন্দও বড় বৌ-এর হাতে তুলে দিলেন। অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি সংসারের যাবতীয় ছোট বড় সমস্যা শুনতেন এবং যে সমাধান সব থেকে ভাল বলে ছেলে বা বড় বৌ মনে করতো তাতেই সমর্থন জানাতেন। কোনও বিরোধ, কোনও বিতর্ক স্বর্ণলতার ধারে কাছে আসতো না।

ব্রতপার্বণে, পুজোর সময় অথবা সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে পুত্রবধূ তাঁকে প্রয়োজন জানাতে, মতামত দিতে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করলে স্বর্ণলতা সেই একই কথা বলতেন—যা ভাল হয়, কর। পুত্র যদি তাকে প্রশ্ন করত, 'তোমার নিজের তো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে? ভাললাগা মন্দলাগা? তুমি কেন কিছুই বল না?' সস্নেহ হাসিটি প্রথমেই উপহার দিয়ে পুত্রকে আশ্বস্ত করতেন, সংসার এখন তোমাদের, তাই এর হালে তোমরাই স্বাভাবিক। আমার যখন সংসার ছিল, সংসারের দায়দায়িত্ব যতদিন আমার উপর ছিল ততদিন তো পরিষ্কার মতামত দিয়েছি। দুঃখে-আনন্দে, সুখ-যন্ত্রণায়—সেও তো কম দিন করি নি! এখন আমার তো মুক্তির দিন, নিরাসক্ত সময় কাটানো, প্রবাহে বয়ে চলাই একমাত্র

কাজ। কর্তৃত্ব একটি লোকের হাতে থাকা উচিত, এবং সে যদি যোগ্য নাও হয় তা হলেও যোগ্য হবার জন্যেই সে দায় তারই বহন করা দরকার। তাছাড়া বড় বৌ যথেষ্ট যোগ্য। তাই আমি নিশ্চিন্ত, নির্মোহ।' ছেলে তবুও বলেছে, 'তুমি কিছু না বললে, তোমার অধিকার প্রকাশ না করলে আমরা দুঃখ পাই। আমাদের মনে হয় তুমি যেন আমাদের আপন বলে মনে কর না!'

স্বর্ণলতা মিটিমিটি হাসেন, কোনও উত্তর দেন না তৎক্ষণাৎ। চোখের কোণে কৌতুক খেলে যায়। ছেলে চেপে ধরে, 'অমন করে হাসলে আর তাকালেই কিছু উত্তর দেওয়া হয় না, তুমি কিছু বলবে না কেন?' এবারে স্বর্ণলতা যেন একটু গম্ভীর হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আজ আমার মতামত, ভাললাগা মন্দলাগা, যাকে আমি বলি অকারণ হস্তক্ষেপ, তা তোমরা পাচ্ছ না বলে এতোই উতলা হয়েছো। যদি তা পেতে এবং আমি যদি অনভিজ্ঞের মতো সেই মতামত ইত্যাদি তোমাদের প্রতিনিয়ত দিতে চাইতাম, তা হলে বুঝতে পারতে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। তোমাদের আকৃতির মধ্যেই আমি আমার নীতির সার্থকতা হাতেনাতেই দেখতে পাচ্ছি।' একটুক্ষণ চুপ করে যেন অনেক দূরে কি দেখার চেষ্টা করেন। গলা খাদে নেমে যায়। 'তোমাদের সংসারে যখন আমি এসেছিলাম তখন নিতান্তই ছোট ছিলাম। কিন্তু এটা আমার বুঝে উঠতে বেশি সময় লাগেনি যে বাইরের কর্তৃত্ব অন্তরে বড়ই আঘাত হানে, মনকে অশ্রুবহ করে তোলে। অন্য অনেককেই দেখেছি, অনেক প্রিয়জনের কথা শুনেছি। বধূদের গৃহিনী হয়ে ওঠার প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় তাদের শাশুড়ী-রা; আবার তাঁরাই তাদের পথপ্রদর্শক। অন্যদের কষ্ট থেকে, ভুল থেকে এটা আমি নিঃসন্দেহে বুঝে গেছি! তাছাড়া বয়স একটা বিষয় যার মূল্য দিতেই হবে। যে করে, সংসারের জন্যে উদয়াস্ত খাটাখাটনি করে, ভালমন্দ নিয়ে সদা সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখে এ-সব তারই অধিকারে পড়ে। অবসর জীবন মানে সর্বার্থেই অবসর হওয়া উচিত। অপরকে স্বাধীনতা না দিলে তোমার নিজের স্বাধীনতা তুমি দাবি করতে পার কি?'

স্বর্ণলতা নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে জগৎ তাঁর সৃষ্টির, তাঁর কাজের, তাঁর আত্মপ্রকাশের। ক্রমশই নিজের দৈনন্দিন জীবনকে

একটা সুনির্দিষ্ট ছকের বাঁধনে বেঁধে নিচ্ছিলেন। প্রথমদিকে নাতি-নাতনীদের জন্যে নির্ধারিত সময় সঠিক রাখতে পারতেন না। রান্নাঘরে রোজ সকালে পুত্রবধূকে একটু সাহায্য করা, কুটনো-কাটা, এটা-ওটা করা ছিল তাঁর নিত্যকার রুটিন। তরকারির ঝুড়িটি টেনে নিয়ে জেনে নিতেন কি এবং কেমন তরকারি হবে, কেমন করে এবং কতটুকু কাটাকুটি হবে। যন্ত্রের কুশলতায় কাজটুকু গুছিয়ে দিয়ে চলে যেতেন নিজের কাজে। সেখানে বিভিন্ন মাপের, বর্ণের এবং প্রয়োজনের কাঁথা-সব 'জোয়াড়' করা, গুছিয়ে রাখা এবং পর্যায়ক্রমে তাদের সম্পূর্ণ করার কাজে লেগে যেতেন। একটা ঘরের মেঝে তখন স্বর্ণলতার দখলে ; বলা ভাল কাঁথাদের পিঠের নিচে মেঝেটি ঢাকা পড়ে যেতো। সেই সব ছোট-বড় কাঁথাদের বুকে-পাঁজরে সুতোর বাঁধন তাদের বিশৃঙখল হবার সম্ভাবনাকে ঘুচিয়ে দিত। বাম হস্তটি কাঁথার পিঠের তলায় রেখে স্বর্ণলতা তাঁর ডান হাতের সুঁচের ঢেউ-খেলান চলনে নিপুণসূক্ষ্ম ফোঁড় দিতেন আর একটু একটু করে কখনও কাঁথাকে টানতেন, কখনও বা নিজে এগিয়ে যেতেন! এই সময়ে অনেকবার তাঁকে দেখেছি। মনে হয়েছে মেঝেয় শায়িত নীরব কোনও রুগীকে মৌন-একাগ্রতায় স্বর্ণলতা 'অপারেশন' করে চলেছেন, 'স্টিচ' দিয়ে তাকে নবজীবন দিতে ব্যস্ত আছেন। ধ্যানমগ্ন চেহারা।

স্বর্ণলতা পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়া এবং তাদের আসা বেশি পছন্দ করতেন না। পুত্র যদি তাঁকে তাঁর একাকিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাহলে স্বর্ণলতা একটুখানি হেসে বলেন, 'আমার তো কোনও একাকিত্ব নেই! আমি আমার মনের মধ্যে অতীত আর বর্তমান থেকে আমার পছন্দমতো জনেদের সঙ্গে সর্বদাই কথাবার্তা চালাতে পারি, গল্প করতে পারি, আর যদি কখনও সে-সব কথোপকথন বিপথগামী হয় তাহলে তাকে বন্ধ করে দেবার অপার স্বাধীনতা ভোগ করি। তাই মনের দিক থেকে আমি সব সময়েই সচল, সঙ্গীসাথী সহ বাস করি। শরীরে আমার কোনও রোগভোগ নেই। কাজের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখি। তোমাদের ছেলেপুলে হলে আমার কাজও যেমন বাড়বে অকাজেও তেমনি জড়িয়ে পড়তে হবে। তখন তো সময় একেবারেই থাকবে না।' পুত্র যদি বলে, 'তাহলে সেই শশব্যস্ত সময় আসার আগেই পাড়ায় বন্ধুবান্ধবের জোগাড় করে রাখো না কেন? পালানোর তো

অন্তত একটা দুটো স্থান বা আস্তানা থাকবে—পুত্রবধূর মুখ শুনতে হবে না। নাতি-নাতনীদের পীড়ন সইতে হবে না।'

স্বর্ণলতা গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'এখন তো বেশ মজা করে বলছ, সময় যদি সত্যিই কখনও তেমন অবস্থা তৈরি করে তাহলে এই মজা উবে যাবে, যন্ত্রণার খোঁচা খেতে থাকবে। সে অবস্থা আমার আসবে বলে মনে হয় না। আর বৃদ্ধ বয়সের একটা ধর্মই হল অতীতকে স্মরণ করে বর্তমানের নিন্দা করা। সে আমার দ্বারা হবে না। আমি না পারব অতীতের সবকিছুকে ভাল বলে ঘোষণা করতে, না পারব বর্তমানের সবকিছুকে মন্দ বলে মেনে নিতে। অলস মস্তিষ্কে যে শয়তানের বাসা সে তো কেবল যুবক আর প্রৌঢ়দের বিষয়েই সত্যমাত্র নয়, বৃদ্ধরাও যে সে বিষয়ে সমান দড় তা আমার জানা হয়ে গেছে। বৃদ্ধা মহিলাদের সব থেকে লাগসই আলোচনার বিষয় তো পুত্র-বধূদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর তরুণী-যুবতীদের কাহিনী উপাখ্যান। নিজেদের অচল-অস্তাচল জীবনে অবচেতনের খোঁচায় তাঁরা সদা সর্বদাই কুঞ্চিত-ভ্রূ, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সমালোচক। ও আমার একেবারেই ভাল লাগে না। এ-বাড়ির কচুরিপানা, আবর্জনা ও-বাড়ির ঘাটে, দোরগোড়ায় জমা করতে আমার রুচিতে বাঁধে।' পুত্র সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলেছিল, তাহলে তো তুমি বিকেলে বিকেলে ঝিলের ধারে, পুকুর পাড়ে সবুজ ঘাসের উপর ঘুরতে পার, বেড়াতে পার, দুদণ্ড বসে আপন মনে কাটাতে পার। সে কর না কেন?'

স্বর্ণলতা হেসে ফেলেছিলেন। পুত্রের আন্তরিকতাকে সস্নেহ দৃষ্টিপাতে অনুভব করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে! বিকেল বিকেল একা বেড়ানোটার সময় এলেই কাজে লাগাব। নাতি-নাতনীদের হাত ধরে নিয়ে যাব। ওদেরও বেড়ানো হবে, আমারও হবে। এখন যদি একা একা যাই তাহলে সব দোষ পড়বে তোমাদের উপর। বিশেষ করে পুত্রবধূটির দুর্নাম ছড়াবে! লোকে বলবে 'ঘরে টিকতে দেয় না!'

পুত্রটি বোকার মতো হেসেছিল মাত্র। তার পরে স্বর্ণলতা যে এতোটা ভাবেন তা ভেবে মন ভরা আনন্দ নিয়ে চলে গেছিল।

স্বর্ণলতা কিন্তু সকালে বিকেলে ঘরের বাইরে বের হন। সে কাজের তাগিদে। দু'চারটে লাউ-কুমড়োর গাছ লাগান, উচ্ছে বেগুনের ক্ষেত করেন. ধ'নে পাতার সংস্থান করতে ধ'নের বীজ বোনেন. লঙ্কার চারা লাগিয়ে

তাতে জল দেন। এ-সবই একদিকে নিজের সময় কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নাড়াচাড়া যেমন করে দেয়, অন্যদিকে সংসারের কাজেও লাগে। পুকুরের পাড় থেকে, জমির আশপাশ থেকে মাঝে মধ্যেই শাকপাতা খুঁটে আনেন। হিসেবের সংসারে যা একটু আধটু সাশ্রয় হয় সে তো আছেই, উপরন্তু স্বাদের ইতর বিশেষ হয়, পরিবর্তন আসে। পুত্রবধূও এ-সব বেশ পছন্দ করে। বৃদ্ধ-বয়সের প্রধান দুটি সমস্যার সমাধানের সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়—সচেতন মন আর সচল শরীর। দুটিকেই নীরোগ রাখতে স্বর্ণলতা সদাই সচেতন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে নিয়ে স্বর্ণলতার কোনও শংকা নেই, নেই কোনও অকারণ দুশ্চিন্তা। বড়ছেলে এবং বড়বৌ ওদের অসীম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। ওরাও দাদা-বৌদি বলতে অজ্ঞান। সব আবদার সকল আহলাদ বৌদির কাছে, বৌদির সঙ্গে। দাদাকে ভীষণ ভয় করে, সমীহ করে, এড়িয়ে চলে। ছেলেরা পর হয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা কেন মা'এর কাছে আসে না, আবদার করে না—এ-সব বিষয় স্বর্ণলতাকে একেবারেই ভাবিয়ে তোলে না। স্বর্ণলতার মনে হয় এসবই ঠিক; মা'এর সঙ্গে ওরা কাটাবে গোনাগুনতি ক'একটা বছর; দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকবে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন। প্রাণবন্ত, জীবন প্রাণবান সম্পর্ক খুঁজে নেয়। যেসব সন্তানরা দাদা-বৌদির সংসর্গ ছেড়ে গত-আয়ু মা-বাবার পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিযোজনায় ব্যর্থ হয়। বানপ্রস্থ-জীবন মা-বাবার উচিত সঠিক পথনির্দেশ দেওয়া। স্বর্ণলতা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন এই ভেবে যে ওদের ভবিষ্যৎ স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমানকে গড়ে নিতে পারছে। এটার মধ্যে তিনি পুত্রবধূর যোগ্যতা আর পুত্রদের ভালবাসার চিহ্ন দেখেন।

স্বর্ণলতা তার বৈধব্যকেও শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বামীর কাছে সংসার এবং পুত্রকন্যা ছাড়া আর যা যা পেয়েছিলেন তা, তাঁর মতে, অত্যন্ত কম স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। স্বামী ছিলেন স্বভাব দার্শনিক; গীতা-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবত-চণ্ডী তাঁর অবসর সময়ের সর্বদার সঙ্গী ছিল। সেই সুবাদে স্বর্ণলতা নিষ্কাম কর্মবিষয়ে অবহিত হয়েছেন, উপনিষদের তত্ত্ব জেনেছেন, রামায়ণের নীতিবোধ আর মহাভারতের জটিল ঘূর্ণি আবর্ত অবগত হয়েছেন। বর্ণাশ্রম স্বর্ণলতার জানা, সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ হতে

পারার মধ্যেই যে শান্ত-ধীরতা জন্ম নেয়, মনকে স্থির রাখে, তা সম্যক উপলব্ধি করেছেন। সংসার জীবনে শোক-দুঃখ জরা-মৃত্যু স্বর্ণলতাকে ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত শুকনো পাতার মতো দিশাহীন করে দিতে পারত; একমাত্র স্বামীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির, সহানুভূতিশীল মনের ছোঁয়ায় তিনি নিজেকে নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। আজ এই বার্ধক্যের প্রান্তে এসে তাই স্বর্ণলতা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর স্বামীকে স্মরণ করেন।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত। সংসার তার নিজের মতোই বয়ে চলেছে। আঘাত সংঘাত, উত্থান-পতন পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন প্রকৃতির নিয়মেই এসেছে এবং চলে গেছে। সবই তিনি নীরবে দেখেছেন, সহ্য করেছেন এবং পার হয়ে গেছেন। পুত্র এবং পুত্রবধূর সংসারে তিনি অকারণ কোনও সমস্যা তৈরি করেন নি। তিনি মনে মনে নিশ্চিত জানেন যে ভাল করার চেষ্টা করলেই কারো ভালো করা যায় না; সব ভাল আর সব মন্দই আমাদের নিজ নিজ অর্জনের বিষয়। ঘটনা প্রবাহকে অকারণে জটিল করে তোলার কোনও আগ্রহ কোনও দিনই স্বর্ণলতার ছিল না। তাই তিনি দেখেছেন, শুনেছেন কিন্তু মতামতের জন্যে পুত্রের অপেক্ষা করাটাই শ্রেয় মেনেছেন।

স্বর্ণলতার একমাত্র দুর্বল স্থান ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, তারা। অনেক সন্তানের অকালমৃত্যুর পরে এই তারা তাঁর নয়নের মণি। তারার বাস্তবতা বোধ আর স্বার্থ-কেন্দ্রিক বিচার বিশ্লেষণ স্বর্ণলতাকে মাঝে মাঝেই বিক্ষিপ্ত করে দিত। প্রশস্ত বসতবাড়ি, পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত বাড়িঘর, নাড়কেল-সুপুরির বাগান, পুকুর এবং বাঁশঝাড়ের আয়—এই সবের সর্বসত্ব বড়ছেলের হাতে নিঃশঙ্ক ছেড়ে দেওয়াটা যে ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে তা তারা প্রায় জ্বল-জ্বল করে দেখিয়ে দিত। স্বর্ণলতা চুপ করে শুনতেন, অনেক কষ্টে সহ্য করে নিতেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'দেখি কি করা যায়' মতো করে গোটা প্রসঙ্গটাকেই পাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলতেন। হৃদয়ের টানে তারা ছিল স্বর্ণলতার খুবই কাছের; চিন্তা-ভাবনার জগতে ওঁরা, মাতা-কন্যা, দুই মেরুর অধিবাসী।

স্বর্ণলতার গভীর অনুভব সমৃদ্ধ মনোজগতে মাঝে মধ্যেই তারাঘাত ঘটত। ক'একটা দিন, যে ক'দিন তারা মা-এর কাছে থাকত, স্বর্ণলতার কাটতো অসীম আনন্দে আর নিঃসীম শঙ্কায়। একটা দ্বন্দ্ব যেন স্বর্ণলতার

মনের গভীর পর্যন্ত তোলপাড় করে ফেলত। কি থেকে কি হয় বলা যায়না। পুত্রকেও তিনি চেনেন; তার সততায়, নিরপেক্ষতায় কেউ সন্দেহ করলে সে যতটা ব্যথা পাবে তার চাইতেও অনেক বেশি ভূমিকম্প ঘটাবে। তার তপস্যায় বাধা পড়লে তাণ্ডব ঘটে যাবার সম্ভাবনা। তাই স্বর্ণলতার দিন ক'টি কাটতো ভয়ে ভয়ে। তার পরে একদিন তারা, সপরিবারে, চলে গেলে প্রিয় কন্যার জন্যে মন ভরে যেতো বিষণ্ণতায়, কিন্তু চিন্তার, দুশ্চিন্তার, ঘটত যেন স্নানান্তমুক্তি!

একবার স্বর্ণলতা মনে মনে স্থির করে নিলেন ছেলেকে বলবেন তাঁর নিজের বলে কিছুই তো নেই; কিছু কিছু তো তাঁর থাকা উচিত, যা তিনি নিজের বলেই খরচা করতে পারবেন। কাউকে কিছু দেবার মন হলে তিনি নিজে থেকেই সেটা দিতে পারবেন। এখন তো ছেলের কাছে বা পুত্র-বধূর কাছে বলতে হয়, চাইতে হয়; অপেক্ষা করে থাকতে হয়, ইচ্ছাটার যথাযথ পূরণ হবে কিনা, হল কিনা! একদিন তাই ছেলেকে কাছে ডেকে বলেই ফেললেন। ছেলে চোখ বড়-বড় করে প্রথমে মাকে দেখল কিছুক্ষণ; তারপরে পায়ের পাতায় চিমটি কাটল, হাত টেনে নিয়ে চিম্‌টি কাটল। স্বর্ণলতা পেলব চোখে প্রশ্ন করলেন, 'কি করছিস? উত্তর দিচ্ছিস না কেন? ছেলে বলল, 'আগে দেখে নিচ্ছি তুমি জেগে কথা বলছ না ঘুমিয়ে; তুমি নিজে কথা বলছ না অন্য কেউ তোমার মধ্যে ভর করেছে!' বলেই ভাইদের ডাকল। 'মা কি বলছেন শোন্‌! মা বলছেন তাঁকে হাত খরচা দিতে। টাকা জমাবেন যাতে কাউকে কোনও কিছু দিতে গেলে আমার কাছে চাইতে না হয়, হাত পাততে না হয়!' বলে ছাদ ফাটিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল ছেলে। স্বর্ণলতা চোখে মুখে কুঞ্চন এনে বললেন, 'এতে এতো হাসির কি আছে? আমার ও তো একটা অংশ আছে, না-নেই? আমি সেটা চেয়েছি বলে কোন্‌ পাঁচালী অশুদ্ধ হয়ে গেছে?'

পুত্রটি প্রথমে ছোট দুই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। কোনও ভাবান্তর নেই সেখানে, দাদা-নির্ভরতা ছাড়া। এবারে মা-এর চোখের তারায় চোখ রেখে ছেলে বলল, 'তোমার যা 'অংশ' সে তো আমরা; আর আমরা তো তোমার সঙ্গেই আছি। আর যে অংশ টাকা-পয়সা, জমি-বাড়ি সে তোমার কোন ঝুড়িতে রাখবে? টাকা-পয়সা সোনাদানা যদি বাক্স-সিন্দুকে জমা

করে রাখতে চাও তাহলে তো শেষ নিঃশ্বাস বের হবার আগেই তোমার বালিশের তলায় আর তোশকের নিচে তোমার পুত্র-পুত্রবধূদের অনুসন্ধান-হস্তগুলো তোমার চেতনার সামনেই ঘোরাঘুরি করবে ! সেটা তোমার মনঃপুত হবে ? স্বর্ণলতা তবুও শেষ চেষ্টা করার মতো করে বললেন, 'সে তবু সইবে ; সে তো সেই শেষ জীবনের কথা, চেতনা থাকবে কি থাকবেনা তারই বা ঠিক কি ? আমার বর্তমানটা যে একেবারে ডাহা সত্যি, নিতান্তই বাস্তব ! এখন যদি পাই তাহলে মন ভরে খরচা করতে পারি। তাই পাওয়াটাই ভাল : খরচা করব কি জমাব সে পরে ভাবা যাবে !'

এবারে ছেলে বলল, 'তোমাকে তারা-য় পেয়েছে, তুমি তারা-হত ! তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যদি 'চন্দ্র' বা 'চন্দ্রা' হত তাহলে এতো দিনে তুমি পাগল হয়ে যেতে। সে কথা থাক। কে তোমার মাথায় আঘাত করছে সেটা বড় কথা নয় ; তুমি যে আহত হয়েছো সেটাই আসল কথা।' স্বর্ণলতা বেশ বুঝছিলেন তার পুত্রটি রেগে যাচ্ছে। তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন ! তার মনে পড়ছিল অনেকদিন আগের কথা। তখন মাঝে মাঝেই বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ বিক্রি করা হত। তিনি তখন সেই বাঁশ বিক্রির টাকা চেয়েছিলেন ছেলের কাছে। টাকা তিনি পেয়েছিলেন। তবে ছেলে তাঁকে তখন শাসিয়েছিল যদি ইঁদুরে টাকার 'পোটলা' নিয়ে পালায় তাহলে যেন ছেলের নামে দোষ না পড়ে ! ইঁদুরের নেওয়া পর্যন্ত সবুর সয় নি, সংসারের প্রয়োজনেই সে টাকা তিনি নিজেই বাজারে-হাটে খরচা করে দিয়েছিলেন।

নিজেকে বেশ গুছিয়ে শান্ত করে ছেলে বলল, 'সামান্য টাকা হলে কাপড়ের খুঁটে অথবা কৌটোর মধ্যে রাখা যায় ; জমাতে গেলে 'ঝাঁপি' ভাল, আর প্রয়োজনে মনখুলে খরচা করার মতো, পরিমাণ মতো, টাকা হলে তা ব্যাংকে রাখাই শ্রেয়। চেক্ কাট, খরচা কর। ব্যাস্।' স্বর্ণলতা তাড়া করে উঠলেন ছেলেকে, 'মোটে টাকা নেই আর আমাকে ব্যাংক দেখাচ্ছ ?' পুত্র বলেছিল, 'তোমার টাকা নেই কে বলল ? টাকাও আছে, ব্যাঙ্ক ও আছে। তুমি চেক্ কেটেই দেখ না : তাছাড়া, তোমাকে চেক্ও কাটতে হবেনা, সই মেলানোর সমস্যাও থাকবে না। তুমি আদেশ কর--কোথায় কাকে কতটাকা দিতে হবে, কোন জিনিস কাকে উপহার দিতে হবে, কাপড়-জামা-গয়না—যা বলবে। বলেই দেখ না ! আমাদের সব টাকাই তোমার টাকা, বললেই তোমার

হয়ে যাবে !' 'ঠিক আছে দেখা যাবে,' বলে স্বর্ণলতা কৃত্রিম রাগ দেখালেন, 'বললাম টাকার কথা আর উনি কিনা বলে দিলেন 'চেকের' কথা।'

টাকা পয়সার কথা আর ওঠে নি। প্রয়োজনই হয় নি তার, স্বর্ণলতা সবই ছেড়ে দিয়েছেন পুত্র-পুত্রবধূর হাতে। পালা-পার্বন, পুজো-অর্চনা, সামাজিকতার দেওয়া-থোয়া সবই তো তাঁকে জানান হয়, মতামত নেওয়া হয় এবং যথাবিহিত করা হয়ে যায়। অযথা অর্থের বোঝা বইবার তাঁর দরকারই বা কী ?

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর ঘুরে যায়। ঘুরে ঘুরে আসে। এখন স্বর্ণলতার নাতি-নাতনী হয়েছে, তাদের জন্যে অনেকটা সময় দিতে হয়। বৌমা একা পেরে ওঠে না। ঝি আছে কিন্তু রাঁধুনী নেই। বাচ্চাদের স্নান করানো, জামাকাপড় পরানো, খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো, বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, কত কি। তার পর পড়াশুনো, স্কুল, ক্রমশই কাজের পরিমাণ বাড়ে প্রকৃতি পাল্টায় সময় পাল্টায়। অন্যান্য কাজে সহায়কের ভূমিকা। কিন্তু ঘুম পাড়ানো আর বিকেলের বেড়ানো, এক দুই অ-আ ক-খ আর গল্পবলা প্রধানতই স্বর্ণলতার ভাগে। কাজ বেছে নিয়েছেন নিজেই। 'ফুরসত্' নেই অবকাশের; সারাটা দিনই কোনও না কোনও কাজে বেঁধে রেখেছেন। সংসারে টুকিটাকি সাহায্য, ছেলেমেয়েদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে জনে জনে নাম করে করে কাঁথা তৈরি করা, পাপোশ তৈরি, 'আসন' আর বালিশের ঢাকনা। এমন কি নারকেলের 'শলা' বার করে করে ঝাঁটা তৈরির বন্দোবস্তও করে রাখেন। ছেলেদের দিয়ে সময় মতো তা বাঁধিয়েও নিতে ছাড়েন না।

দ্বিতীয় ছেলের বিয়ে দিলেন। অনেকদিন, অনেক বছর পরে আবার শিশু সন্তান 'মানুষ' করার কাজ পেলেন। সত্তর বছর বয়সেও স্বর্ণলতা যোগ্যতা বিন্দুমাত্র হারান নি। নোতুন উদ্যমে নাতিকে বড় করে তুলতে অনেকটা সময়ই ধার্য করে দিলেন। সেই খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো বিকেলে বেড়ানো আর গল্পবলার জীবন ফিরে পেলেন। দুপুরে আধঘন্টা একঘন্টা বিশ্রাম পেলেই স্বর্ণলতার কোনও কষ্ট থাকে না। তার পরেই তিনি বসে পড়েন কাঁথা নিয়ে অথবা চটের খণ্ডে সুতোর রং-বেরং আলপনা আঁকেন সূঁচের সাহায্যে; তৈরি হতে থাকে আসন। আসনের 'ডিজাইন' নিয়ে বড়বৌ-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তৈরি হতে হতে দেখিয়ে আনেন কেমন হল, ঠিক

হল কিনা, পরের আসনখানা কিরকম হবে—ইত্যাদি।

এখন স্বর্ণলতার দর্শক সমাগম হয়ে থাকে কাজের সময়। তাতে করে কাজের সুবিধার চাইতে অকাজের বোঝা বেড়ে ওঠে। নাতি-নাতনীরা মাঝে মাঝেই নামুনের—ঠাকুমাকে তারা নামুন বলে—কাজের পাশে, সামনে জড়ো হয়, কখনো কখনো তো একেবারে রে রে করতে করতেও মাঝ-মধ্যিখানে বসে প'ড়ে গোছানো কাজ অগোছানো করে দেয়। স্বর্ণলতা সহজ ভাবেই সে সব মেনে নেন। তাঁর তো আর সময়ের অভাব পড়েনি, কাজ সময় মতো শেষ না করতে পারলে তাঁর অর্ডার বাতিল হবার ভয় নেই, তাই বৌ-দের ডাকেন, ছেলেদের ডাকেন, কর্মভণ্ডুল নাতি-নাতনীদের কুশলতা দেখানোর জন্যে, চপলতার নমুনা বিষয়ে অবহিত করানোর জন্যে।

ছোট ছেলের বিয়ে দিলেন। সংসার এখন পূর্ণ। ভরভরাট। সংসার চক্রের মাঝমধ্যিখানে থেকেও স্বর্ণলতা কোথায়ও থাকেন না। সবই দেখেন শোনেন কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু কাউকে বলেন না, করেন না। অরণ্যে না গিয়েও তিনি অরণ্য আশ্রমিকের জীবন যাপন করেন। এখন তাঁর আর এক সুবিধা হয়েছে। টি ভি এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারটুকু আগে বিছানায় শুয়ে অথবা ঘরের কোণে বসে কাটাতে হত। এখন দিনান্তে সব কাজ সেরে তিনি টেলিভিশনটি খুলে দিতে বলেন। কিছু একটা কাজ নিয়ে যান। কখনো পাড়ের সুতো তুলছেন কখনও আসনে ফোঁড় দিচ্ছেন।

সত্তর বছরের স্বর্ণলতাকে অনায়াস গতিতে এবং একটি সাবলীল জীবন যাপনের মাঝে আশিতেই তরুণী বলে ভুল করার কারণ ছিল ; দেহে অবশ্যই নয় মনের দিক থেকে। দেহখানি পরিমিত আহার, নির্ধারিত বিশ্রাম আর সতর্ক কর্মনির্বাচনের মধ্য দিয়ে সচল রেখেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলে বলতেন কাজ আমার নেশা, খাদ্য আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনের উপকরণ মাত্র। আমার মনে আশা নেই হতাশাও নেই। কারো বিরুদ্ধে নালিশ নেই তাই বিচারের জন্যে অপেক্ষাও নেই। সুখ আমার ভাল লাগে দুঃখে আমার জ্বালা নেই। সংসারের ভাল মন্দ অনেকদিন থেকেই অপরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি স্পৃহাহীন। কাজ যা কিছু করি তার যে বিরাট কিছু বাস্তব মূল্য আছে তা আমি মনে করি না ; তবে কাজের মধ্যে আমি বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পাই। একসময়ে বই পড়তাম তখন নোতুন নোতুন

বিষয়, বক্তব্য আর জ্ঞানের সন্ধান পেতাম। জীবনকে বহু-বিচিত্র দিক থেকেই দেখা যায়। সে ছিল আমার অবসর সময়ের আকাশ ; অতীতকে আমি ধীরে সুস্থে নাড়াচাড়া করেছি। নিজের, স্বজনের এবং পরিচিত জনের। দ্বিতীয়-দৃষ্টির স্রোতধারা আমার চিন্তাকে, ভাবনাকে, চেতনাকে শক্তি দিয়েছে, গতি দিয়েছে। সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে যা হয় তাইই হয়। মানুষ নিজের নিজের চিন্তা, অনুভব, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিজ নিজ প্রত্যক্ষকে তৈরি করে নেয়। সেই স্বকৃত প্রত্যক্ষের জগতে আমরা সকলেই অন্য থেকে আলাদা হয়ে বাঁচতে থাকি।'

অষ্টআশি বছর বয়সে স্বর্ণলতা মারা গেলেন। নাতি-নাতনীরা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। বড়টি তো চাকরি করছে। শেষের পাঁচ-ছ'বছর স্বর্ণলতা তরুণীর মতোই নাতির সঙ্গে খুনসুড়ি করতেন, নাতনীর পিছনে লাগতেন। 'তোমাদের জন্যে কাঁথা বানিয়েছি ; তোমরা প্রাণভরে তা ভিজিয়েছ। এবারে তোমাদের সন্তানদের জন্যে নামে নামে কাঁথার ব্যবস্থা করে রাখছি। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিও!' ওরা বড় হয়ে গিয়ে স্বর্ণলতাকে জড়িয়ে ধরে বলতো নাত-বৌ এর জন্যেও কি তুমি কাঁথার ব্যবস্থা করে যাবে, নাত-জামাই এর জন্যে!' স্বর্ণলতা মিছিমিছি ঝগড়া করতেন। যে ছোট সরু লাঠিটা দিয়ে কাঁথাকে টানটান করতেন সেই লাঠিখানা উদ্যত করে তাড়া করতেন।

স্বর্ণলতার শেষ একটি মাস কষ্টে কাটে। দেহখানি এতোই শুষ্ক এবং জীর্ণ হয়ে যায় যে ওষুধের ক্রিয়া বা ইনজেকশনের ফল পাওয়া যায় না। চব্বিশঘণ্টা একই বিছানায় নিজের অবসন্ন, ক্লান্ত রোগজীর্ণ দেহখানি নিয়ে নিদ্রায় আর জাগরণে সমান নিঃশব্দ থাকতেন! সেই অবস্থায়ও স্বর্ণলতা অপরকে বিরক্ত করেন নি, ডাকেন নি, হাহুতাশ করেন নি। শান্ত, সমাহিত, মনে হত যেন, নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত। মৃত্যুর কদিন পূর্বে প্রথম তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামল। বড় বৌ দেখে একান্তে কেঁদে ভাসালো। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সে স্বর্ণলতার ছায়ায়, পাশে পাশে এবং প্রধান গৃহিনীটি হয়ে ওঠার ধাপে ধাপে 'মা'-কে দেখে এসেছে, তাঁর চোখে জল? কখনও তো দেখেনি! তাহলে?

সুখে-দুঃখে সংগ্রামে-সাফল্যে, হারানো আর প্রাপ্তির টানাপোড়েনে এই দীর্ঘ জীবন থেকে চলে যেতে স্বর্ণলতা কি কষ্ট পেলেন? তাই দু'ফোঁটা চোখের জলে জীবনের সুন্দরকে অঞ্জলি দিয়ে গেলেন?

॥ শোভাদি ॥

শোভাদি আমার আপন দিদি নয়। দিদির হরিহরআত্মা বন্ধু-সখী-সঙ্গী বলে আমার খুবই আপন। ছোটবেলায় শতকাজে ব্যস্ত গ্রাম্য জীবনে মায়েরা তাঁদের সন্তানদের জন্যে কাঙ্ক্ষিত স্নেহ নৈকট্যটুকু ক'জনেই বা দিতে পারতেন। আমরা তাই বড় দিদিদের নৈকট্যে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতাম। আমার আপন দিদি বেশ রাশ ভারি ছিলেন, অন্তত আমার বিষয়ে তাঁর স্নেহের পাত্রটি আম্রফলের সরসতায় দেখা না দিয়ে বেলফলের কঠিন আবরণেই প্রতিভাত হত। কিন্তু শোভাদিদি ছিলেন আমের মতোই সরস, আঙুরের মতোই সুমিষ্ট। আমাকে দেখলেই তিনি কাছে ডেকে নিতেন, পাশে বসাতেন এবং অনবরতই আদর করে করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন, আমার শৈশবের অভুক্ত-ক্ষুধার্ত জীবনে শোভাদি তাই মায়ের ভালবাসা আর দিদির স্নেহ-ধারার উৎসটি হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকালে সকলেরই বোধহয় এমনি কোন স্নেহশীলা সর্বংসহা দিদি থাকেন অন্যথা আমরা সকলেই বোধহয় অভিভাবকত্বের ঊষর মরুসদৃশ নিয়মের তাড়নায়, নির্দেশের চাবুকে এবং হৃদয়হীনতার তাপে শুষ্ক-শীর্ণ মৃতপ্রায় বেড়ে উঠতাম। বাল্যের অতীত স্মরণে পিতার দীর্ঘশ্বাস, মায়ের রক্ত-আঁখি আর দাদা-দিদিদের যথাতথা কিল-চড়-কানটানার চিত্রপটে এই সব শোভাদিদিরাই তো স্বপ্নের ঝরনা হয়ে অন্তরের প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখেন।

দেশ বিভাগের ফলে সেই শোভাদি কোথায় হারিয়ে গেলেন। আমার তরুণ যুবক কালের মরুজীবনে আর কোনও শোভাদিকে খুঁজে পেলাম না। অনেক অনেক দিন বাদে আমার সংসার জীবনের মধ্যকালে যখন জীবন আর মরুতাপে বিবর্ণবিশীর্ণ করছে না তখনই একদিন আবার শোভাদিকে খুঁজে পেলাম। আমি খুঁজে পেলাম বলার চাইতে বলা উচিত শোভাদিই আমাকে খুঁজে পেলেন। আমার প্রৌঢ়ত্বের আবরণ ছিঁড়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতে চাইল একটি সুপ্ত বালক—আদুড় গা, ইজের পরা আর শোভাদির মনের ছোঁয়ায় আনন্দ বিভোর। একমাত্র সময় ছাড়া শোভাদির আর কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে আমার মনেই হল না। আমার অভিভূত, বাধাবন্ধহীন বালক-সুলভ উচ্ছ্বাস আর

শোভাদির স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ-প্রীতির ধারাস্রোতে প্রভাবিত হল আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা। শোভাদিকে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি কেন হারিয়ে গেছিলে শোভাদি ?" আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে, শোভাদি বলেছিলেন, "বোকা ছেলে ! আমরা যে পরাধীন ; তাই আমরা তো হারিয়ে যেতেই জন্মাই !"

শোভাদি হারিয়ে গেছিলেন তাঁর নিজের সংসারে। রিফিউজি সংসারের নিত্য অনটনের সদা জাগ্রত দৈত্যের সঙ্গে নৈমিত্তিক যুদ্ধ করতে শোভাদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, সন্তান ধারণ লালন এবং পালন করতে শরীর মনের অনেক অনেক শক্তি-ক্ষমতা-ধৈর্য ক্ষয় করতে হয়েছে এবং এখন এতোদিন পরে শোভাদি দিনের দেখা পেয়েছেন। তাই শোভাদি এখন খুঁজে খুঁজে পুরোনো ভালবাসার স্মৃতিগুলোকে সামনে আনতে চান, দেখতে চান তাঁর আপনদের মধ্যে কে কোথায় কেমন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, মহান্ধকার পার হয়ে কে কে আলোর দেখা পেল !

শোভাদির পাশে বসে তাঁর কথাগুলোকে সেই পুরোনোদিনের মতোই স্নেহসিক্ত মনে হচ্ছিল, তাঁর নৈকট্যটুকুকে মনে হচ্ছিল যেন কত বছর পার হয়ে সুদূর অতীতের স্পর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমার মনের গভীরে একটা শিশু-চাঞ্চল্যকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারলাম না, "চল শোভাদি, আমরা সেই ছোটবেলার দেশের বাড়িতে দালানের কোণে চলে যাই। বাকি সময়টা তো আমাদের জীবনে মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু ব্যথাকে সংগ্রহ করে করে ভারি করে তুলেছি মাত্র। তোমরা পুতুল খেলবে আর আমি তোমাদের ফুট ফরমাশ খাটব ?" শোভাদি মৃদু মৃদু হাসলেন। সে হাসি আমার কতই চেনা, কতই আপন। বললেন, "তুই সেই আগের মতোই বোকা থেকে গেলি ? সে কি হয় ?"

বোধহয় হয় না। যা চলে যায় তা তো আর ফিরে আসার জন্যে যায় না। হারিয়ে যাবার জন্যেই সরে সরে যায়। আমার স্ত্রী শোভাদির জীবনের অনেক কথা শোভাদির মুখেই শুনে নিলেন। সংসারের কথা, কষ্টের কথা, আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে শোভাদির সংগ্রামের কথা, সন্তানদের পুষ্টি এবং সংসারের হাল ফেরাতে একগাদা গরু বাছুর লালন-পালনের কথা, গৃহনির্মাণে শরীরপাত করা পরিশ্রমের কথা। অনেক অনেক কথা। সুখের কথা, দুঃখের

কথা। সব ছাপিয়ে শোভাদির প্রাপ্তির আনন্দ, সফলতার সাফল্য এবং যুদ্ধে বিজয়ের কথা যেন সকলকেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল।

এর পরে শোভাদি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার জন্যে তাঁর মনের কোণে একটা আসন যেন সেই বাল্যকাল থেকেই টান টান পাতা আছে। আমিও মাঝে মাঝেই শোভাদির বাড়ি গেছি। না গিয়ে পারি নি। অতীত স্মৃতি আমার মনে রিন-রিন করে আবহ তৈরি করত। শোভাদিকে দেখলেই আমি যেন আমার বাল্যকালটাকে স্পর্শ করতে পারতাম, যেন দু'হাত ভরে পান করার সুখ পেতাম!

আমার বদলীর চাকরি। স্থান থেকে স্থানান্তর করে করে যখন অবসরান্ত দাঁড়ে বসার সময় এলো তখন অনেক বেলা পার হয়ে গেছে। নিজের জীবনের ঘূর্ণিতে আর পাঁচজনের মতো আমারও অন্তহীন সমস্যা আমাকে শয়নে স্বপনে বিব্রত করে মারছে। স্ত্রীর বয়স বেড়ে গেছে, কন্যার চাইতে এখন জামাতাবাবাজীবনকে বেশি সমীহ করতে হচ্ছে, পুত্র ক্রমশই স্বগৃহে বিগতস্পৃহ এবং বধূমাতার মাতা পিতার প্রতি বেশি বিনম্র নত। বর্ষান্তে গৃহের মেরামত, অবসরান্তের বিদুর প্রাপ্তিকে নিপুণতম ব্যবচ্ছেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন কুশলতা এবং জীবনের এ-যাবৎ অনুশীলিত মূল্যবোধগুলোকে সন্তর্পণে বাক্স পেটরা বন্দী করে তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত—এই এতো সব কাজের ফাঁকে শোভাদি প্রবেশের পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথবা আমার মধ্যে সেই বাল্য কালটাই কি হারিয়ে গেছিল?

শোভাদি বোধহয় আমার স্ত্রীর হৃদয়ের কোনও এক গোপন গভীর তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে থাকবেন। তাই কোনও এক অপ্রায়শ প্রাপ্য একান্ত মুহূর্তে আমাকে শোভাদির খবর নিতে অনুনয় করলেন। আমিও তথাস্তু বলে মান্য করলাম। দেখে ভাল লাগল যে আমার বাল্য হারা জীবনে শোভাদি হারিয়ে গেলেও স্ত্রীর প্রৌঢ় তন্ত্রীতেও শোভাদি সমান ঝংকার তুলতে পেরেছেন।

আমাকে মিথ্যা বলতে হয়েছিল। আমার বিশ্বাস আপনারা আমার অবস্থায় পড়লেও মিথ্যা বলতেন। বলতে পারতেন যে শোভাদি এখন একেবারেই একা? অসুস্থ অবসরপ্রাপ্ত পেনশনহীন স্বামী এখন শয্যা শায়ী? পথ্যের সংগ্রহ এবং ঔষধের যোগানহীন জীবনে একমাত্র সম্বল তাঁর প্রতীক্ষা? বলতে পারতেন যে বড় ছেলেটি বৌকে নিয়ে আলাদা থাকে

মাসান্তে দেখা হয় কি হয় না ? মেজ ছেলে চাকরির কারণে অন্যত্র থাকে ? ছোটটি সারাজীবন বঞ্চিত হয়েছে ভেবে মা বাবাকে ত্যাগ করে নিজের সংসারের শান্তি অটুট রাখছে ? একটি মাত্র মেয়ে শোভাদির। চাকরি ক'রে শ্বশুর বাড়ির দায় দায়িত্ব সব পালন ক'রে অফিস ফেরার পথে এবং রবিবার রবিবার ক'রে সে মাকে দেখতে আসে ? ক্ষতবিক্ষত হয় মা ও মেয়ে ? বলতে পারতেন যে-শোভাদি সংসারের জন্যে নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছিলেন, সন্তানদের মঙ্গলের জন্যে যে-শোভাদি দিনান্ত নিশান্ত দুর্ভাবনায় কাটিয়েছেন তিনি এখন পরিত্যক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ? একেবারেই একা ? আমি বলতে পারিনি। স্ত্রীকে বলেছিলাম, "শোভাদি ভাল আছেন।"

॥ হ্যালো ? কে বলছ ॥

টেলিফোনটা বাজছে। ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় স্টেটস্‌ম্যানে ডুবে আছি। উঠে গিয়ে রিসিভার তুললাম : 'নমস্কার, কে বলছেন ?' একটি অত্যন্ত কচি গলা ভেসে এলো—'তুমি কে বলছ ?' খুবই মিষ্টি করে জানতে চাইল—'তোমার বাড়িতে কেউ নেই ?' অপরপ্রান্তের বক্তার বয়স এবং মানসিকতা স্মরণ করে কণ্ঠে যথাসম্ভব মিষ্টতা এনে বললাম—'দাদুন, তুমি কোথা থেকে বলছ ?' চট্‌জলদি উত্তর এলো—'আমি দাদুন নই, আমি বাবুসোনা। মানিকতলা থেকে বলছি। তোমাদের বাড়িতে আর কেউ নেই ?'

ভাবলাম রেখার ছেলে নয় তো ? রেখা আমার ভাগ্নী। মানিকতলায় থাকে। তাহলে তো রেখা তার ছেলেকে নিয়ে আমাকে ফোন করতে এসেছে। লাইন ডায়াল করে ছেলের হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে থাকবে। ছেলেকে স্মার্ট করার বাসনায় ? ছেলের টেলিফোন প্রতিক্রিয়া দেখার ইচ্ছায় ? আমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে ? বললাম : 'বাবুসোনা ? কি মিষ্টি তুমি ! তোমার মাকে দাও।' অপরপ্রান্তের আমার সদ্যপ্রাপ্ত বাবুসোনা সঙ্গে সঙ্গেই জানাল : 'আমার মা তো এখানে নেই !' বললাম, 'তাহলে তোমার পাশে যিনি আছেন তাঁকেই দাও, কথা বলি।' কচি কণ্ঠের উত্তর ভেসে এলো : 'আমার পাশে তো কেউ নেই ?' আমার আগ্রহ বেশ বেড়ে উঠছিল। বললাম : 'তাহলে তোমার সামনে বা পিছনে বা চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁকেই দাও।' তখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ভাগ্নীর ছেলে না হলেও এমন কেউ ওখানে আছেন যিনি আমার সঙ্গে বা আমার পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা এক নিমেষেই ঘুচে গেল : 'আমি তো বাড়িতে এখন একাই আছি ; তোমার বাড়িতে আর কেউ নেই ?' বাবুসোনার প্রশ্নের উত্তরটুকু আগেই দিয়ে নিলাম : না, আমার বাড়িতে আর কেউ এখন নেই, ওরা বেড়াতে গেছে আর একজন এখনও অফিস থেকেই ফেরে নি। আমি এখন একা একাই আছি।' যেন সহানুভূতি জানাতেই প্রশ্ন ভেসে এলো : 'তুমিও একা থাকো ? আমি তো রোজ একা থাকি !'

এক ঝাঁক জিজ্ঞাসা আমার মনে ভিড় করে এলো ঃ তুমি আমার টেলিফোন নাম্বার পেলে কোথায় ? নিজেই ডায়াল করেছো ? মা-বাবা ? অফিসে ? কেউ নেই যখন তাহলে কি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ? তোমার দেখাশুনো করার জন্যে তোমার কাছে কোনও দিদি বা মাসি নেই ? তোমার ফোন নাম্বার কত ? এতো সব প্রশ্নের ঝাঁক এড়িয়ে গেল, অথবা আগ্রহই দেখালো না। অন্য কেউ থাকলে তাকে টেলিফোনটা দিতে বলে নির্দেশ দিল ঃ 'অন্য কাউকে দাও, আমি কথা বলব।'

আমার মনে এবারে বিস্ময় আর সহানুভূতি পাশাপাশি আনাগোনা করতে লাগল। এতোটুকু শিশু একেবারে একা কি করে থাকে ? কেমন করে সময় কাটায় ? তাহলে কি যার উপর দায়-দায়িত্ব রেখে ওর মা-বাবা অফিস বা কাজে গেছেন সেই ব্যক্তি অন্য কোনও আকর্ষণে ওকে একা ফেলে চলে যায়, চলে গেছে ? কণ্ঠের পেলবতায় আর বাঁধুনিতে পাঁচ-ছ' বছরের বলেই মনে হল। সম্পন্ন ঘরের ছেলে। একই ছেলে হবে কারণ আর কেউ তো ওর সঙ্গে এই সময়ে ছিল না। ওর একাকিত্বকে যেন আমি ছুঁয়ে ফেলতে পারছিলাম। আনন্দ হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে ও যত্র-তত্র ডায়াল করতে করতে আমার নাম্বারটিই ডায়াল করে বসেছে। ওর ছোট্ট জীবনটুকুর গভীর শূন্যতাবোধকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিল। আকস্মিক ঠিকই। কো-ইনসিডেন্স ! কে যেন বলেছিলেন যে একটি বাঁদর যদি অনন্তকাল টাইপ-করে চলে তা হলে সে নাকি একসময়ে সেক্সপিয়রের সকল সৃষ্টিই বাস্তব করে ফেলতে পারবে ! আমাদের বাবুসোনা কি তাহলে তার রোজ-দিনের শূন্য সময় টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকল টেলিফোনওয়ালাদের সঙ্গেই কথা বলে ফেলবে না ? (না, এখানে টেলিফোন নিগমের কোনও প্রশস্তি যেন কেউ খুঁজবেন না ! বাবুসোনা একদিনও বয়স না বাড়িয়ে এই কাজটি করে যাবে, আর তা যদি মেনে নেওয়া যায় তা হলে কলকাতার সব ফোনগুলোই একদিন না একদিন সাড়া দেবার মতো হবে তাও মেনে নেওয়া যায় !)

আমার ঘরে অন্য কেউ ছিল না, তাই বাবুসোনাকে তার মনের মতো শ্রোতাবক্তা দিতে পারলাম না। আমি যে তার মনঃপূত হইনি সে হয়তো আমার কণ্ঠস্বর, আমার বয়স, আমার বাচনভঙ্গি ! আমি নিরুপায়। তাই বললাম ঃ 'আমিও একা তুমিও একা। আমরা দুজনে মিলে তো আর একা

রইলাম না। আমরা কিছুক্ষণ তো আড্ডা দিতে পারি, মনের কথা বলতে পারি, পারি আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে ভাগ করে নিতে!' কিছুক্ষণ ও-প্রান্তে কোনও সাড়া পেলাম না, শুধু বাবুসোনা যে ধরে আছে তা বুঝতে পারছিলাম তার শ্বাসপ্রশ্বাস এবং কিছু কিছু সাব-ভোকাল শব্দ-অনুরণনে। 'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না'—সম্বিৎ ফিরে পেলাম, আমার ভাষা তো বাবুসোনার ভাবকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে। সম-বয়স আর সম-মানসিকতা এক থেকে অন্যে ভাবের আদান-প্রদানে, অনুভবের সঞ্চারণে অত্যন্ত প্রয়োজন। সে তো আমি অনেক পিছনে ফেলে এসেছি! আজ প্রথম কষ্ট হল শৈশব ফেলে এসেছি বলে, দুঃখ হল বাবুসোনাদের সঙ্গে কথা বলার কায়দাটি হারিয়ে ফেলেছি বলে। এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে মন চলাচলের সাঁকোটি কবেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলে।

বললাম ঃ 'তোমার কথা শুনতে আমার খুউব ভাল লাগছে, তুমি কথা বল।' বাবুসোনার সেই এক কথা ঃ 'অন্য কেউ নেই? অন্য কাউকে দাও কথা বলব।' বুঝলাম মনের মানুষ না হলে কথা আর কথা হয়ে ওঠে না। বাবুসোনা যা খুঁজছে তা আমার মধ্যে নেই। যে কথা ওর বলার আছে তা শোনার জন্যে আমি উপযুক্ত পাত্রই নই। ও রিসিভার রেখে দিল। আমার কেমন যেন একটা অবসন্নতার ঘোর হল। কি যেন হারিয়ে ফেললাম। মনে হল বাবুসোনা যদি আমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলত, যদি ওর বিষয়ে আরও কিছু জানাত তা হলে আমার অনেক অনেক ভাল লাগত। শুষ্ক পত্র-মর্মরে কিশলয়ের হিন্দোল অনুভব করতে পারতাম। তা হল না; হবার নয় বলেই হল না!

মহাপুরুষেরা বলে গেছেন একা কেহ থাকিও না। আর কবি সাহিত্যিকরা বার বার বলেছেন আমরা সকলেই একা, প্রত্যেকেই এক একটি দ্বীপ মাত্র। আবার দার্শনিকেরা তো এই একাকিত্বের মধ্যেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্ভব বলে মনে করেছেন। তাহলে? একাকিত্বের মধ্যে আমরা সকলেই হারিয়ে যাই, মিথ্যা হয়ে যাই। এটা সামাজিক দৃষ্টি। বহুর মধ্যে আমরা নিজেদের খুঁজে পাই, সত্য হয়ে উঠি। এটাও সামাজিক। আবার নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব না দিতে পারলে সম্পদ আহরণ, নিজেকে চেনা-জানা, আর ভবিষ্যৎ ভাবনার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। আমাদের বেশির ভাগ একাকিত্বই

ক্ষণিকের, সময়ের ছোট-বড় বেড়ার বেষ্টনে। আসলে আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে অন্যসকলে আছেন, বহুজন মিলেই আমাদের পরিবেশ-প্রেক্ষিত। তাঁরা সকলেই আপন, সকলেই পর। আমাদের সমাজ-পরিবার-চেতনার আয়নায় এই আপন-পর প্রতিফলিত হয়। যখন কাছে কেউ থাকে না তখনও আমরা কল্পনায় এঁদের কাছে পেয়ে থাকি। আর যদি কখনও বাস্তব একাকিত্ব কল্পনার বহুত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেই ফেলে, বহুকে মনে মনেও কাছে পাওয়া না যায়, তবেই আমরা হারিয়ে যাই, একা হয়ে পড়ি। এটাই একাকিত্ব।

বাবুসোনা মনে মনে জানে যে তার মা-বাবা একটা সময় অন্তর আবার তার পাশে এসে হাজির হবে। ওর একাকিত্ব নেই, একা-একা থাকা আছে। আর মা-বাবার অনুপস্থিতিতে যে ওর দেখাশুনা করার জন্যে আছে সে সুযোগ নিচ্ছে। এই অনুপস্থিতিটুকু সেই ব্যক্তি অনেক মূল্যে, অনেক সত্যমিথ্যা স্তবস্তুতি দিয়ে সংগ্রহ করছে নিশ্চয়ই। সে নিশ্চয়ই বাবুসোনাকে ঘুষ দিয়ে এই সময়টুকু চুরি করে থাকে। আর বাবুসোনা টেলিফোনের ফুটো-ফুটো ঘরগুলোতে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে নিজের একা-একা সময়টুকুকে ভরে নিতে চায়। ওর সত্য-মিথ্যার জগৎই তৈরি হয় নি ; ধীরে ধীরে তা অবশ্যই একদিন তৈরি হয়ে যাবে ; বড়দের সেই দানে বা অবদানে বিকৃত অভিজ্ঞতা যতদিন সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন ও টেলিফোনে বন্ধু খুঁজবেই, কথা বলে একা-একা সময়টুকুকে নিজের মতো করে ভরাট করে নিতে চাইবেই।

আমার তো সকলেই আছে। ছেলে-মেয়ে-পুত্রবধূ এবং ফুটফুটে চঞ্চল একরাশ দুষ্টুমি ভরা দাদুন। আছে রান্নার লোক, আছে দাদুনকে দেখা-শুনা করার জন্যে একটি বাচ্চা মেয়ে। সব মিলে কলমুখরিত দিন-সপ্তাহ-মাস। তা সত্ত্বেও তো মাঝে মাঝে আমি একেবারেই একা-একা হয়ে যাই। প্রতিদিন নয়, মাঝে মধ্যে। কেউ তখন আমার দেড় হাজার ফুটের সুপরিসর বাসগৃহে থাকে না। তখন অবশ্যই আমি আমার নিজের মধ্যে, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমি কাগজে কলমে কথা বলাই, সেই কথা অনুসরণ করি, আর সব কথাকে কোনও এক মোহনার দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করি। বাবুসোনার সামনে কাগজে-কলমে বিবাহ দেবার, কথা বলানোর, সময় আসে নি। তাই

বোধহয় সে টেলিফোন-যন্ত্রটিকে মাধ্যম করেছে। নিঃশব্দ কথার এলাকায় পৌঁছুতে পারে নি বলেই বোধহয় বাবুসোনা সুকণ্ঠ কথার মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছে। সংযোগ পেলে কথা বলে, নিজের একাকিত্ব জানায় আর মনের মতো মন পেলে হয়তো রিসিভার রেখে দেয় না।

দীর্ঘ এই জীবনে অনেক শৈশবকে দেখেছি জানালায় মুখ গুঁজে বাইরের জগতকে কাছে টেনে আনার চেষ্টায় ব্যাপৃত। পথ দিয়ে চলমান প্রাণের সঙ্গে নিজের বন্ধদশার মুক্তি খোঁজে তারা। কথা বলে, ডাকে। তার কাছে যাবার জন্যে হাতছানিও দেয়। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রাণময়। কিন্তু বাবুসোনা যে টেলিফোনে দূরকে নিকট করার পদ্ধতিটি ব্যবহার করছে সেটি অবশ্যই অনেক হার্দ্য, অনেক ঘনিষ্ট আর মিষ্টি। আমার খুবই ভাল লাগল একা-একা থেকে মুক্তির এই সহজলভ্য পথটির ব্যবহার। পেন-ফ্রেন্ড বলে যে সম্পর্কটি সমাজে চালু আছে সেও তো এই দূর থেকে অচেনা-অজানাকে কাছের করে পাবার চেষ্টা। কিশোর তরুণের মধ্যে বাইরের জগতে প্রবেশ ও বিচরণের অনন্ত বাসনা পেন-ফ্রেন্ড সংগ্রহের মূল প্রেরণা। এখানেও সেই 'তরুণ গড়ুড় সম ক্ষুধার আবেশ' এদের পীড়ন করে, পরিবার পরিজনের মধ্যে মনের নিকট-দূর প্রসারটিকে অনুভব করতে পারে না, থোড়-বড়ি-খাড়া-ময় জীবনের অন্ধকূপ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টায় এই সব তাজা প্রাণ আর উন্মুখ মনগুলো পাখা ঝাপটায়। পত্র-মিতালি গড়ে নিয়ে আদিগন্ত প্রাণ সন্তরণের মহাকাশটি খুঁজে নেয়।

দূরভাষ-বন্ধুত্ব, টেলিফোন-ফ্রেন্ড, বাবুসোনার জন্যে সেই দিগন্তকে খুলে দিয়েছে। বাবুসোনার এখনও নাম্বার মিলিয়ে যোগাযোগ সূত্রটি উন্মোচন করার হয়তো বয়স আসে নি; হয়তো সেই প্রয়োজনবোধ, সভ্যতা-ভব্যতা বোধের কণ্টকগুলো বাবুসোনার জীবনে সত্য হয়ে সঙিগন-উঁচানো-পাহারায় নিযুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই এখন অপরপ্রান্তে সাড়া পেলেই ও আঁকু-পাঁকু করতে থাকে: 'আর কেউ নেই?' বাবুসোনা কোনও কচি কণ্ঠ খোঁজে, অপাপবিদ্ধ বয়সকে অন্বেষণ করে আর প্রতীক্ষা করে যদি 'বন্ধু' কেউ মেলে।

বয়স হয়ে গেলে আর বন্ধু জোটে না; বন্ধু খোঁজার মনটিই বোধহয় হারিয়ে যায়। বাস্তবতা, প্রয়োজন, এক্সপিডিয়েন্সি, অর্থাৎ এক-দুই-তিন-দুই

এক-দুই-তিনের যন্ত্রাপিষ্ট ভারবাহী জীবনের পেষণে বন্ধু-দৃষ্টিতে ছানি পড়ে যায়। আমরা, বয়স্করা, তাই বাবুসোনাদের মনকে বুঝতে পারলেও আর ছুঁয়ে দিতে পারি না ; অনুভব করতে পারলেও আর তেমন করে অনুরণন সৃষ্টি করতে পারি না। তাই তো ও বলে ঃ 'আর কেউ নেই ? হ্যালো ! অন্য কাউকে দাও !'

এতদিনে, এই ঝরে যাবার বয়সে এসে, বাবুসোনার কণ্ঠে যেন নিজের একাকিত্বের ভিতরেও একটা নিঃস্বতার ছায়া দেখলাম ! আমরা ফুরিয়ে গেছি, হারিয়ে গেছি ; আমরা এখন অবশিষ্টের দলে। 'অন্য কেউ'রাই এখন কাঙ্ক্ষিত, প্রার্থিত, অপেক্ষিত। কোনও এক দার্শনিক বলেছিলেন ঠাকুরদাদা আর নাতি-নাতনীরা ভাল বন্ধু—গ্র্যান্ড পেরেন্টস্ এন্ড গ্র্যান্ড চিল্ড্রেন মেক গুড ফ্রেন্ডস্। তখন আশার আলো দেখেছিলাম : এই সত্য চিন্তা-ভাবনা আর দার্শনিক চেতনার ক্ষেত্রেই কেবল সত্য বলে মনে হয় নি, জীবনেও সত্য বলে প্রত্যয় হয়েছিল ! আজ, এতোদিন পরে, বাবুসোনা যখন পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল, আমার সঙ্গে কথা না বলে 'অন্য কারো' সঙ্গে কথা বলতে চাইল, তখন কেমন যেন আহত বোধ করলাম !

শিশুদের সঙ্গে মা-বাবার, প্রথম পুরুষের, স্নেহভালবাসার চাইতে কর্তব্যের দায় থাকে অবিচ্ছেদ্য বেশি। স্বভাবতই তাই একটা সুপ্ত বিরোধিতা অংকুরিত হতেই পারে। অভিভাবকদের ভাবতেই হয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে। তাই শৃংখলাবোধ, পঠন-পাঠন, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি বহুবিধ দায়, বহুতর নিষেধের নিগড়, অনিবার্য হয়ে ওঠে। অসন্তুষ্টি, অশান্তি, বিরক্তি স্বভাবতই দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু গ্র্যান্ড পেরেন্টস ? ঠাকুর্দাদের তো মাত্র স্নেহের, মমতার আর আদরের সম্পর্ক। তাই এই বৃদ্ধদের প্রাপ্য মধ্যম-পুরুষের, যুবক-প্রৌঢ়দের, ভ্রূ-কুঁচকানো শাসন। কিন্তু শিশুদের চোখে ফুটে ওঠে বিস্ময়, সহানুভূতি আর ঘনিষ্ঠতা। শিশুরাই তো বৃদ্ধদের প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল ! বাবুসোনা তাহলে কেন আমাকে বাতিল করবে ?

বাবুসোনা মনে মনে ওর বাবা-মাকে বিরুদ্ধ শক্তি বলে মনে করতে শুরু করেছে ? বঞ্চনাই প্রধান প্রাপ্য বলে ভাবতে শুরু করেছে ? বাবুসোনার মা-বাবা রোজ বাইরে চলে যায়—অফিসে দপ্তরে কাজে। কচি মনে এই বিরহ

নিশ্চয়ই কোনও মধুর ছাপ ফেলে না, যত আদর আর যত উপহারই না স্তূপীকৃত করা হোক! শিশু যা চায় তা বস্তু জগতের সম্ভার নয়, মনোজগতের আবেগ, অনুভব আর সুরক্ষা। সিকিউরিটি। ওর জীবনে বঞ্চনাটা তাই সত্য আর সার্বিক বলেই মনে হয়ে থাকবে! মধুর, সুগার-কোটেড, সকাল সন্ধ্যার আচরণ নিশ্চয়ই শিশু মনের অভ্যন্তরে অভাবের বিরাট শূন্যটুকুকে, বঞ্চনার গভীর অনুভবটুকুকে ভরাট করে তুলতে পারে না। বড়দের কি তাহলে বাবুসোনা সামান্যীকরণ—ইউনিভার্সলাইজ—করে ফেলেছে? আমার কণ্ঠস্বরকে ও যে-বয়সের প্রতিনিধি বলে ভেবেছে সে ওই বড়দের বয়সই হবে বোধহয়। তাই আমিও বাতিল; বঞ্চক হিসেবে, ব্যস্ত সমস্ত স্বার্থপর সামাজিক জীব হিসেবেই ওর কাছে অগ্রহনীয়?

তাছাড়া ওকে দেখাশুনো করার জন্যে যে মেয়েটি বা মাসিটি আছে? [থাকারই কথা, অন্যথা সংসার চলবে কি করে?] সেই ব্যক্তিটিও তো বাবুসোনার চোখে চতুর, স্বার্থপর এবং সুযোগসন্ধানী; অন্যথা ওকে একা রেখে সেই বা দূরে যাবে কেন? অনুপস্থিত হবে কেন? শত-সহস্র কারণ যেমন ওর মা-বাবার রয়েছে ওকে একা ফেলে দীর্ঘসময় বাইরে কাটানোর, ঠিক তেমনিই তো সেই মাসিরও শত কারণ থাকবে সরে পড়ার। আমাদের বিচার্য বিষয় শিশুমনের কাছে এই সব ঘটনার মূল্যায়ন, অনুভব এবং প্রভাব। কাছের জনেরা দূরের লোকের মতো ব্যবহার করে; দূরের লোকেদের তাই খুঁজে নিতে চায় কাছের লোক হিসেবে।

আমাদের, বড়দের, একাকিত্বের সঙ্গে ওদের, বাবুসোনাদের, একা একা জীবনের তুলনা চলে? আমরা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ব্যক্তি কেন্দ্রের টানে একা, স্বার্থের বিন্দুতে একা, অস্তিত্বে একা, ব্যক্তিত্বে একা আর জ্ঞানে-অনুভবে অভিজ্ঞতায় একা। আমরা যৌথ জীবনেও একা, সামাজিক জীবনেও একা, একা একা থাকলে তো একাই। জীবন যুদ্ধের চাপে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে এবং প্রতিবেশ-পরিবেশের প্রভাবে আমাদের একাকিত্বটুকুকে আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেই, আঁকড়ে ধরে থাকি। অপরদিকে বাবুসোনা? ওর যখন আত্মীয় পরিজন দরকার তখন তারা নেই, তারা নিজ-নিজ বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে দূরে সরে আছে। বন্ধুজনের অভাবই ওর শূন্যতার কারণ। এই শূন্যতা আমাদের মতো ওরা

নিজেরা তৈরি করে নেয় না ; ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই ওরা জানালায় দাঁড়িয়ে বন্ধু খোঁজে, পত্র লিখে মিতালি পাতাতে চায়, টেলিফোন তুলে মনের মানুষ পেলে, কথা ব'লে শূন্যতাকে ভরভরাট করে তুলতে চায়। আমরা আনন্দকে ফেলে দিয়ে প্রয়োজনের বস্তু দিয়ে আমাদের জীবনকে ভরে তুলি ; ওরা প্রয়োজনের বস্তুকেই আনন্দের মাধ্যম করে ব্যবহার করতে চায়। আমাদের কলম বাজার খরচা লেখে, ওদের কলম মিতা-তুমি আমার-মিতা বলে গান গেয়ে উঠতে চায়। টেলিফোন তুলে আমরা বলি "ক্যায়া ভাও ক্যায়া ভাও ?" আর সেই যন্ত্রটিই ওদের কাছে 'হ্যালো, আমি বাবুসোনা বলছি ; ওদের কাউকে দাও'—ব'লে প্রিয়জনের অন্বেষণে উন্মুখ হয়ে ধ্বনিময় হয়।

বাবুসোনা আমার একান্ত মনে যে প্রশ্নের ঝংকার তুলেছে তার অনুরণন শেষ হয়েও সমাপ্ত হতে চাইছে না। ওকে আমি বোঝার চেষ্টা করেই চলেছি, বোঝাতে চেষ্টাও করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বিফলতার কারণ কি ? অনেক অনুসন্ধান তো করলাম তবুও যেন মন ভরল না। ওরা বোধহয় অনেক বেশি বোঝে, বুঝতে পারে। আমরা ওদের বোঝার জগতের কোনও হদিস পাই না, সম্ভবত রাখিও না। আমরা যখন প্রশ্ন-তর্ক-জিজ্ঞাসা, বিশ্লেষণ-সমীক্ষা-পর্যালোচনা করে জীবনের জ্ঞান ভাণ্ডারকে ক্রমশ সম্পন্ন করে তুলতে ব্যস্ত ; যখন আমরা পাত্রাধার-তৈল-না-তৈলাধার-পাত্র করে যুক্তি-প্রক্রিয়া-সিদ্ধান্তের ঘূর্ণাবর্তে ঘুর-পাক খেয়ে মরি তখন ওরা বোধহয় কোনও সরল-নিটোল অনুভবে সত্যকে ধরে ফেলে। প্রকৃতিই বোধহয় ওদের মধ্যে এই স্বজ্ঞা বা ইন্‌টুইশনের এ্যানটেনা স্থাপন করে দিয়েছেন যাতে ওদের জানা-চেনার জগৎ সহজ ভাবেই ধরা প'ড়ে যায়। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আমরা যে সকলেই অভিনেতা তা ওদের কাছে, ওদের বড়-বড় প্রসারিত চোখের তারায় এক মুহূর্তেই সত্য বলে ধরা দেয়। ওরা তো নাটক করে না, নাটক করার মতো জীবন-স্টেজ ওদের তৈরিই হয় নি। ওরা তাই দর্শক। দর্শকের চোখে ফাঁকির অংশটা উজ্জ্বল ধরা পড়ে।

সেই কাল্পনিক বাঁদরটি তো দ্বিতীয়বার সেক্সপীয়রের সৃষ্টি টাইপ করবে ব'লে বলা হয় নি! বাবুসোনাও কি দ্বিতীয়বার আমার নাম্বার ডায়াল করতে পারবে ? সেই সম্ভাবনা কতটা ? প্রবাবিলিটি ফ্রিকোয়েন্সি ? আমি কি অপেক্ষা করে থাকতে পারি ? কোনও গণিতজ্ঞ কি আমাকে একটু অবহিত করাবেন ? এবারে আমি যে বাবুসোনার মনের তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি ?

॥ তারাদা ॥

দু'টি পিরিয়ড-এর মাঝখানে একটা ফাঁকা পিরিয়ড, অনেকে বলেন অক্সিজেন রি-ফিল করার সময়, দু' চার জনের কাছে 'পানীয় ভরণের বেলা', আবার কারো কারো মতে কণ্ঠকে পরবর্তী ক্লাস-এর জন্যে চিৎকার-উপযোগী করে তোলার ওটাই অবকাশ। কোনও দলেই সামিল হবার সময় হল না কারণ খবর পেলাম গ্রন্থাগারকক্ষে আমার জন্যে কোন এক 'আ-মরণ লক্ষ্মীছাড়া' অপেক্ষা করে আছেন। পরিচয়ের ব্যাখ্যা দূত মহাশয় দিলেন না, তাই ভাবনা পাখা পেল।

অকুস্থলে পৌঁছেই দৃষ্টি বিদ্ধ হলাম। তারাদা! প্রায় এক যুগ পরে দেখা। তার পাশে একজন, সামনে একজন নিয়ে তারাদা জম্পেশ আড্ডা দিচ্ছেন বুঝলাম। কাছে যেতেই হাঁক শুনলাম, "গুলি মার!" পাশে যেতেই বুঝলাম টারগেট আর যেই হোক আমি নই। বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "হঠাৎ এই গ্রন্থাগারের চারদেয়ালের মধ্যে চেয়ার-'বিষ্ট' হয়ে কোথায়ই বা রাইফেল পেলেন কোথায়ই বা টারগেট?" তারাদা একইভাবে কথার গুলি চালালেন, "গুলি করাটাই আসল, যেখানে লাগবে সেটাই জানবেন সঠিক টারগেট। গুলি করলেই দেখবেন একটা-না-একটা হারামজাদা-লক্ষ্মীছাড়ার গায়ে লেগে যাবে। ব্যাস্।" বলতে বলতে দুহাতের জমা উষ্ণতাটুকু আমার একটা হাতের মধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে যেন উজাড় করে দিতে চাইলেন।

এতোদিন পরেও যে তারাদাকে এক লহমায় চিনলাম সে তার পিতৃদত্ত চেহারায় পাস-পোর্ট-এ নয় স্বোপার্জিত কন্ঠ-বাদনে আর বক্তব্যের ক্ষেপণ-কর্কশতায়। তারাদার কণ্ঠটি স-মিল এ কাঠ চেরাই করে, আর শব্দগুলো ভাঙ্গা পাথরের টুকরোর মতো চারধারে ছিটকোতে থাকে। আশে পাশে যাকে পায় তাকেই আঘাত করে, উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তারাদার শত্রুও বলতে পারবে না যে তারাদা কখনই আহত করেন; হালকা বিষয়কে ভারি করে বলা আর অত্যন্ত ভারি বিষয়কেও হাল্কা করে বলার ক্ষমতা তারাদার কণ্ঠায়ত্ত।

তারাদার বিগত পঁয়ষট্টিটি গ্রীষ্ম তার দেহের অনেকস্থানেই ছাপ মেরে

গেছে। সামনের দুটি দাঁত যে নেই তা পূরণের কৃত্রিম চেষ্টা না করে গুলি মেরেছেন, গালদুটি ফুলো-ফুলো হয়ে ওঠায় তাদের তিনি তাঁর দেড়বছরের নাতির থাম্‌চানোর জন্যে টারগেট বলে ছেড়ে দিয়েছেন, এবং একটু ঝুঁকে পড়া দেহের ভার বইতে বইতে হাঁটু দু'টি অনেক আগেই জং-ধরা পুরোনো কব্জার মতো বাতে ক্যাঁচ্‌-কোঁচ্‌ করে চলেছে বলে তারাদা তাদেরও 'হারামজাদা' বলে গুলি মেরে দিয়েছেন।

অথচ তারাদার পাশে কিছুক্ষণ বসুন, কথা বলুন দেখবেন তিনি কেমন অবলীলায় ঋতুর আক্রমণ মনের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। পুরন্দর পাহাড়ের এন সি সি ক্যাম্প-এ যে চঞ্চলতা তারাদার মনের সম্পদ ছিল, পুনার সমতলে যে আন্তরিকতা চুম্বক হিসেবে অপরকে কাছে টানতো আর পশ্চিমবাংলার ভিজে জমিতে যে সবুজে-শ্যামলের ছোপ তারাদার কাছে গেলেই টের পাওয়া যেতো, তার কোনও অংশই তারাদাকে, এতোদিনেও, ছেড়ে যায় নি। যায় নি বলা বোধহয় ঠিক হল না, তারাদার স্বভাব তাদের কাউকেই যেতে দেয় নি। মনে হয় সব কিছুকেই গুলি মারতে মারতে তারাদা নিজের মনের দিকে আর বন্দুকের নলটি ঘুরিয়ে ধরার সুযোগই পান নি, মনেও হয়নি সে কথা।

তারাদার গৃহে গৃহিনী আছেন, সংসারে পুত্র-এবং-পুত্রবধূ আছেন এবং জীবনে রস সঞ্চারের জন্যে একটি দেড় বছরের নাতি আছে। এই সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটি তারাদার ভাষায়, একটি 'আস্ত শাল', এবং অন্যসকলের চেষ্টায় একটি আস্ত শূল ও বটে। তারাদার বহু-বর্ণ কাজের জগতে এই ক্ষুদে ব্যক্তিটি অনবরত খোঁচার মতো তারাদার আষ্টেপৃষ্ঠে প্রোথিত থাকতে চায়, মুহূর্ত বিচ্ছেদ তার সয় না, স্বভাবেও নেই! আবার ক্ষণ মাত্র অদর্শনে শূলসম মনের গভীরে বেদনাবোধের, অভাববোধের জন্ম দেয়। তারাদা সেখানেও 'মারো গুলি' বলে হাঁক ছাড়েন কিন্তু গুলি খোঁজে দূরের বিন্দু, কাছের জন তো গুলির রেঞ্জ-এই পড়ে না! সে যে থাকে গলা জড়িয়ে!

তারাদা একটা অন্যত্র-অপ্রাপ্য বাগান করেছেন। সেখানে বিভিন্ন জাতের ফলকে কাছাকাছি এনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। সেখানে জলবায়ুর নিয়মকে গুলি মেরে এমন সব ফুলের সমারোহ ঘটিয়েছেন যারা বাস্তব জীবনে একঠাঁই হতে নারাজ। কেরালার পাশেই কাশ্মীর, বসরার

কাছেই বারাসত ; ল্যাঙড়ার বন্ধু ফজলী, তোতাফুলির অঙ্গনেই আতা-ডালিমের সহাবস্থান। তারাদা এই বাগানেই একমাত্র গুলি না মেরে মধু ছেড়েছেন—মৌমাছির চাষ করে তারাদা ফুলের সঙ্গে ফুলের 'ফুলশয্যা'র ব্যবস্থা পাকা করেছেন, বাসরের মৌ-সানাই সেখানে বারো মাস তিনশ পঁয়ষট্টিদিনই আকাশ-বাতাস ম' ম' করে রাখে। আর সদাসর্বদা তারাদার শাল-শূল সদা-চঞ্চল সাগরেদ নাতিটি কাজের বাধা হয়ে, অকাজের কাজী হয়ে আর অদর্শনের মন-কেমন-করা আড়ি-ভাব হয়ে তারাদাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

তারাদা গাছকে ফল ধারণ করতে, বৃক্ষলতাগুল্মতৃণাদিকে ফুলভারে বিকশিত হতে আর নাতিকে প্রকৃতি প্রীতি শেখাতেই সময় শেষ করেন না। তিনি সকালে একদল তরুণ তাজা প্রাণ নিয়ে দৌড়ের তালিম দিয়ে থাকেন। এটা তাঁর দিনের কাজ নয়, কারণ দিনমণি আকাশে প্রকাশ পাবার আগেই, উষাকালেই, তিনি এটি শেষ করে ফেলেন। হাঁটুর ব্যথাকে গুলি মারতে তিনি সাইকেলে অধিষ্ঠান করেন, এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই দ্বিচক্রযানের গতিকে মিলিয়ে রাখেন।

তারাদার একটি মেয়ে আছে। বিবাহোত্তর জীবনে সে স্বামী সঙ্গে তেপান্তরের পারে মহা আনন্দের ঘাটে সংসারের তরী ভিড়িয়েছে। পুত্র পুত্রবধূ দুজনেই চাকরি করে ; অর্থের আবাহনে আর আনন্দের উপভোগে তারা বেশ সচল, স্বাধীন, পিছুটানহীন। তারাদার ভাষায় তারা-গিন্নী সংসারে আর তারাদা বাগানের ভ্যারেণ্ডায় গুলি মেরে চলেছেন ; টারগেট প্র্যাকটিস্ অবাধ এবং অনন্যোপায়। একমাত্র বাধা দেড়বছরের শালশূল। ছাদের নিচে থাকলে গিন্নীকে, বাইরে থাকলে তারাদাকে নিয়ে সেই 'আস্ত শাল'টি টারগেট প্র্যাকটিস করে।

তারাদার জীবন তাই তীব্রগতি গুলি ট্রাজেকটরিতে সরল। তারাদা কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেন না কারণ সকলেই 'হারামজাদা,' সকলেই সদাসর্বদা পাঁয়তারা ভাঁজছে অপরকে কি করে কাজে লাগানো যায়, কতো সহজে, অজান্তে, ব্যবহার করা যায়। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যে অপরকে ব্যবহার করতে হবে, সকলেই করে, কিন্তু এমন ভাবে করতে হবে যেন ব্যবহৃত লোকটি মনে করে যে তাকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে, তার

জন্যেই সবকিছু, তার মতামতের উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করছে এবং ইত্যাদি। তাই তারাদা মাঝে মাঝেই হাঁক ছাড়েন 'মারো গুলি'।

ক্লাস-এর সময় হয়ে এলো। বিদায় নিতে গেলাম তারাদার কাছ থেকে। দু'পা এগিয়ে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, "মারো গুলি, মারো গুলি করে চলেছি অনেকদিনই ; এখন যেন বুঝতে পারছি আসলে কবে থেকেই আমরা সকলেই বন্দুক হয়ে অপরের স্কন্ধে চেপে আছি। আর গুলি গুলো আমাদেরই অস্তিত্ব ছিদ্র করে, তছনছ করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে! কোথায় টারগেট ? কোথায় কি ?"

ভাবতে ভাবতে চললাম : ক্লাসকে কি গুলি মারা যায় ?

॥ তাংকা সোনা ॥

এখন আমার অফুরন্ত সময়। নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। কারণ সব সময়টুকুই তো এখন নষ্টের দলে! প্রত্যেকের জীবনেই তো একটা সময় থাকে যাকে সে হিসেব করে খরচা করে, নষ্টের হাত থেকে যতটাই বাঁচাতে পারে ততটাই সে সাশ্রয় ক'রে জমার ঘর পূর্ণ ক'রে তোলে। তখন সময় থাকে অমূল্য; এখনও আমার প্রায় তাই, অ-মূল্য, মূল্যহীন! কাজ করার মতো কাজ নেই, সময়কে অমূল্য করে পূর্ণ করার মতো সময়েরও অভাব। সব সময়টাই একই শব্দে টিক্‌টিক্‌ করে চক্রাকারে ঘুরপাক খায়। ছোট কাঁটাটা যেমন সরে সরে যায়, বড়কাঁটাটাও ঠিক তেমনি ঘুরে ঘুরে যায়। ওরা ওদের বিভিন্ন অবস্থানে কোনও বিশেষ বার্তা বয়ে আনে না। একেবারেই একঘেয়ে।

তাংকা সোনা আমার অলস জীবনে বয়ে এনেছে একটা পরিবর্তনের ঢেউ। তাংকা আমার নাতি; পুত্রের ঘরে পুত্র। ওর শতেক নাম, যেমন হয়ে থাকে। শমীক ওর পোশাকী নাম, ঋক্‌ ওর মাসির দেওয়া অভিধা। দেদই, লাট্টু, ডিংডং, মাম্মাম এবং আরও কত। সামনের চব্বিশে জুলাই বছর পূর্ণ করে জন্মদিন করবে। গতমাস পর্যন্ত দেহ-ভাষায় ও ওর যাবতীয় প্রয়োজন আর সকল অনুভবকে প্রকাশ করেছে। কণ্ঠের ধ্বনির তীব্রতায়, প্রসারে, সূক্ষ্মতায় এবং মাঝে মাঝে ছন্দের দোলায় মনোভাব প্রকাশে সঙ্গতের কাজ করে চলেছে। এ-মাসেই প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে চলনের এবং ভাবপ্রকাশের জন্যে। পদদ্বয় যে শুধুমাত্র হামাগুড়ি দেবার যন্ত্র নয়, ক্ষেপণ করার এবং লম্ব-দেহ অগ্রগমনেরও সহায়ক সে সত্য এই দশাদশে ও টের পেয়ে গেছে। এবং ধ্বনি এখন শব্দের মাত্রায় নিটোল হতে চাইছে।

শিশু তো আর কেবলমাত্র মাতৃক্রোড়েই সুন্দর নয়, গৃহে সুন্দর, চলনে সুন্দর, প্রকাশে সুন্দর, অপরের এবং নিজের কোলেও সুন্দর। আসলে শিশুরা সুন্দরের নিটোল প্রকাশ। বিশেষ করে বৃদ্ধদের অলস অবসর সায়রে শিশুরা পদ্মের শোভায় ফুটন্ত ছুটন্ত জাগ্রত সুন্দর। মনের মিল কেন এতো বেশি হয়? নৈকট্যের জন্যে এই দ্বিপ্রান্ত টানের উৎস? সে কি অকাজের বেসাতি

নিয়ে দু'জনেরই কারবার বলে ? শিশু তার অফুরন্ত অবসরকে অকুশলী হাতের অকাজ-কুকাজ দিয়ে ভরে রাখে, যেটি করার নয় সেটিই সে করে, যেখানে যাবার নয় সেখানেই সে যায়, যে বস্তুটি ধরার নয় সেই বস্তুটির প্রতিই তার টান সর্বাধিক। আবার, বৃদ্ধজন তার অঢেল অবকাশকে একইভাবে অকাজে ভরিয়ে রাখে। কিন্তু তফাৎ এই যে শিশুরা 'সোনা' 'সোনামণি' আর বৃদ্ধরা 'তামা-পিতল', নষ্ট কর্মের গোড়া !

তাংকা সোনা কিন্তু এতোসব বোঝে না। তাই সে ধেয়ে ধেয়ে চলে আসে আমার কাছে ; সবিশেষ আমার টেবিলে। আমার লেখা-পড়ার টেবিলটি তাংকাসোনার 'মক্কা' ! আমি যেমন এই টেবিলটাকে অকাজের সংগ্রহে প্রতিনিয়তই ভারি করে স্তূপীকৃত করে তুলতে সময় কাটাই, তাংকাসোনাও মনে মনে বেশ একটা নৈকট্য অনুভব করে। তাই এটা ওর স্বর্গক্ষেত্র। দোয়াত-কলম-কালি, পেন-পেন্সিল-ইরেজার, পিনকুশন-পেপার-ওয়েট-পেপার কাটার, স্টেপ্লার-পেপারপাঞ্চ-লাইটার, সিগারেট-দেশলাই-ছাইদানী, কাগজপত্র, বই-পুস্তক—সব মিলিয়ে তাংকাসোনার কাছে আমার টেবিলটি একটি ক্ষেত্র কর্ম-বিধিয়তের অপূর্ব সুযোগের সমাহার। তার উপরে আছে একটি দূরভাষযন্ত্র, টেলিফোন। অন্যসব বস্তুই ওর কাছে জড় বস্তু, ঘাঁটার ব্যাপার, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিস্ক্রিয় মাধ্যম মাত্র ; একমাত্র ঐ টেলিফোনটিই ওর মতে জ্যান্ত ! ওকে দরজায় দেখলেই আমি কলম বন্ধ করি. টেবিলে শয্যাশায়ী সাদা কাগজের বুক ঢেকে দেই, 'পাথর'-চাপা দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় সময় গুণতে বসি। তাংকাসোনা পেন্সিল পেলেই পাথর সরিয়ে তার নিজের কথা কাগজের বুকে এঁকে দিতে দেরি করে না !

লেখা শেষ হতে না হতেই সে টেলিফোনের রিসিভার তুলে 'হ্যাও' বলে ওর ছোট-ছোট আঙুল দিয়ে ডায়াল করার চেষ্টায় ছিদ্রগুলোয় আঙুল চালাতে থাকে। তাংকা কথা বলতে চায়। আমাদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলে ও নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করে। তাই ও বন্ধু খোঁজে, প্রিয়জনের অন্বেষণ করে ?

আমরা সকলেই কি এক একজন তাংকা ? নৈকট্য আমাদের বিতৃষ্ণ করে তোলে ? ইংরেজী প্রবাদে যেমন আছে, নৈকট্য কি ঘৃণার জন্ম দেয় ? কাছের জনদের ছেড়ে আমরা প্রতিনিয়তই দূরের মনটিকে ছুঁয়ে দিতে চাই, স্পর্শ নিয়ে

তাজা হতে চাই ? আর তাই কি আমরা সর্বদাই মনে মনে ঠিকানার ফুটো ফুটো ঘরগুলোতে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে বলেই চলি 'হ্যালো', হ্যালো' ? যাকে এবং যাদের সর্বক্ষণ দেখি, কথা বলি, যাদের না হলে দৈনন্দিন বাস্তব বাঁচাটাই মার খেয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা, সেই তাদের জন্যে প্রতিদিন কতবারই তো আমাদের ভুরু কুঁচকে যায়, চোখের কোণ সরু হয়ে ওঠে, কণ্ঠ হয়ে ওঠে কর্কশ ! সেই তারা, কখনও স্ত্রী কখনও পুত্র, কখনও স্বামী কখনও কন্যা, এবং আরও কতো শতো পরিবার সূত্রের টানাপোড়েনে কখনও টানটান কখনও ঢিলেঢালা বুনটের প্রকাশে বাস্তব।

কেন এমন হয় ? কেন হতেই হবে এমন কষ্ট-ক্লিষ্ট মনোভাব ? দেহভাষা, যা এখন তাংকাসোনার একমাত্র ভাবপ্রকাশের ভাষা, সেই ভাষা আমরা ছাড়িয়ে এসেছি অনেক কাল আগেই। শব্দের ভাষা আমাদের কণ্ঠায়ত্ত্ব, প্রকাশে সত্য। কিন্তু তাই কি ? এমন কি হতে পারে যে আমরা যা বলতে চাই তা প্রকাশ করতে পারি না, আর যা প্রকাশ করে ফেলি তা বলতে চাই না ? অথবা, আমি-আমরা তোমার-তোমাদের বলা কথা থেকে যা বুঝি তা তুমি-তোমরা যা বোঝাতে চাও তা থেকে একেবারেই আলাদা ? ভাষাও সবটা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, বাহিত ভাবও শ্রোতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। শব্দ চয়ন বয়ন ক্ষেপণ ইত্যাদি যেমন প্রভাব ফেলে প্রকাশের গুণ-মান-মাত্রায়, তেমনি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের ভাষাও তো, সঙ্গতের মতোই, নেয়ে চলে ধেয়ে চলে ভাবের গতিকে সার্থক করে তুলতে। আর এই করতে গিয়েই যাবতীয় গোল বেধে যায়। 'ধান থেকে পান', অন্তর্নিহিত ভাব, উদ্দেশ্য, ব্যঞ্জনা, তাৎপর্য এবং 'পেটে এক মুখে আর', ইত্যাদির টীকাটিপ্পনী বক্তা শ্রোতার দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শব্দ কি শুধু তাহলে মনোভাব প্রকাশেরই মাধ্যম নয়, মনোভাব লুকোনোরও মাধ্যম ? হেতু ? সংসারের বহুবিধ ঝামেলা আর সমস্যার কুঁজী মন্হরা ?

এতো কথার উত্তর আমার জানা নেই ; এটুকু জানি যে আমার তাংকাসোনার শব্দ নিয়ে ঝামেলা, ভাষা নিয়ে কচকচি একেবারেই নেই। নেই তার প্রধান কারণ সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি ; আর আমরা বড়রা, সেই ফলভক্ষণের সুদীর্ঘ অভ্যাসের জন্যে নিকটকে করেছি দূর, আপনকে করেছি পর, জীবনকে করে তুলেছি রিক্ত রুক্ষ কর্কশ ! তাংকাসোনার আঁচল নেই

তাই আঁচলে হীরা ফেলে কাঁচ সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না ; ওর সংরক্ষণের প্রয়োজনই নেই তাই ও যা কিছু পায় তাকেই খেলার আনন্দে গ্রহণ করে, বর্জন করে—নিরুদ্বেগ। আমরা সারাজীবন আঁচলে আর থলেতে সংগ্রহের হিসেব করতে করতে যখন অবেলায় এসে শেষ হিসেবের মুখোমুখী হই—ফাইনাল এ্যাকাউন্ট করতে বসি তখন প্রায়শই দেখি সেই আঁচলখানি শূন্য থলেখানিও শূন্য। যা দিয়ে ভরে তুলেছিলাম তা সব যেন ভার হয়ে পিছু তাড়া করে।

'ল্যাংটার ভয় নেই বাটপাড়ের' ; কিন্তু তিল তিল করে সংগ্রহের, সম্পদের ভার বাড়িয়ে তুললে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। ছেলে বেশি পায়, পেল ; মেয়েরা স্নেহের পাত্রী তাই তাদের ভাগে 'সিংহ', স্ত্রী বলেন 'আমার কী রইল ?' মেয়ে বলবে 'দিদিকে/বোনকে বেশি দিলে' ; পুত্রবধূ ফোঁস্ ফোঁস্ করে চোখের জলে প্রশ্ন করবে, 'আমরা কি ভেসে এসেছি ?'—এবং ইত্যাদি। না থাকার কোনও জ্বালা নেই—একমাত্র 'নেই' টুকু ছাড়া। থাকার অনেক জ্বালা। ভাগের জ্বালা, বাঁটোয়ারার যন্ত্রণা—কমবেশির, বঞ্চনা-প্রাপ্তির, ক্রন্দন-উল্লাসের এবং ইত্যাদি।

আমার তাংকাসোনার কিছু নেই বলে সবই আছে : ভাষা ওর যন্ত্রণার কারণ নয় যেহেতু তা আঙ্গিক ছাড়িয়ে দূরপ্রসারী জীবনাঙ্গনটি পায় নি এখনও। একমাত্র অক্ষমতা ছাড়া ভাবপ্রকাশের জন্যে ওর আর কোনও জটিলতা নেই। আমরা তো সারাটি জীবন ধরেই মিত্রকে শত্রু করে করে সামনে এগুলাম, দু'চারজনকেই মিত্র বলে ধরে রাখার চেষ্টার শেষ পরিণাম এখনও অজানা ! আর তাংকাসোনা অনায়াস হাসিতে সকলকেই আপন করে নেয়, নিচ্ছে। পাত্র-মিত্র নেই স্থানকালের বিচার নেই, যখন যেখানে আছে তখন সেই স্থান-কাল-পাত্র মাত্রেই ওর মিত্র, বন্ধু, সাথী।

তা হলেও দেখেছি তাংকার চোখের মণিতে মন মাপার অ্যানটিনা লাগানো আছে। অনাবিল মনে আবিলতা ছায়া ফেলে। তাংকা টের পায়, সরে যায় ; মায়ের কোলে লেপ্টে থাকে, দাদুনকে ছাড়তে চায় না। কেন ? 'ওয়েভ লেংথ'—মনের সরসীতে সমতালের এবং মাত্রার তরঙ্গ ভঙ্গ হয় না। অথচ ওর নিজের বয়সের কাছেপিঠের সবাই ওর মন-তরঙ্গে একতালে থেকে শততালের ঝংকার তোলে। মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। হাসির উল্লাসে চোখের ঝিলিকে

আর কণ্ঠের কোকিলে সকলকেই জানিয়ে দেয় ঃ আমরা নিঃস্বার্থ আমরা অনাবিল আমরা তাজা আমরা প্রাণবাণ।

আর আমরা ? স্বার্থের দড়িতে বাঁধা, প্রয়োজনের দিগদর্শনে কম্পাসে চালিত অহং-এর এভারেস্ট অভিযানে পরিচালিত জীবনখানিকে অবসরের দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখে অতীতের গামছাখানা কাঁধ থেকে হাতে নিয়ে বর্তমানের ঘাম মুছতে মুছতে সময় কাটাই ! না কি ও ঘামই নয় ? অশ্রু ?

তাংকাসোনার সময় থেকে আমরা সকলেই দিনরাত সর্বস্বপণ করে কি এই অলস অপরাহ্নের পথিক ? কখনই না ; প্রথম-শৈশব আর দ্বিতীয়-শৈশবের মাঝখানে একটা বিরাট পৃথিবী, সুবিস্তীর্ণ পরিসর ! দুই প্রান্তের মাঝের সেই ভূমৈব সুখম্-কে কে অস্বীকার করতে পারে ? সকালের তরুণ তপন আর বিকেলের অস্ত সূর্য যদি সত্য হয় তাহলে দিবাদ্বিপ্রহরের নিদাঘকে কে অস্বীকার করতে পারে ?

তাই সে ঘামও নয় অশ্রুও নয়। অতীতের মৃদুমৃদু ব্যজনমাত্র ; যে যেমন দেখে বোঝে ভাবে !

।। তপুর বিয়ে ।।

তপুর বিয়ে হয়ে গেল। 'কোন তপু ?'—বলে অমন করে তাকিয়ে থাকার কোনও মানে নেই। তপুকে আপনারা অনেকেই চেনেন। দেখেছেন, কথা বলেছেন এবং এমন কি অনেকেই আপনারা একসঙ্গে পড়াশুনো বা চাকরিও করেছেন। অচেনা নাম কিন্তু চেনা চরিত্র।

তপু সম্পন্ন ঘরের ছেলে। পোশাকে আশাকে, কথায় বার্তায় আচারে আচরণে সে তার সামাজিক অবস্থানটি নিজের চারপাশে মলাটের মতো মেলেই রাখে। ছাত্রজীবনে সহপাঠীরা, চাকরি জীবনে সহকর্মীরা এবং ক্লাব জীবনে বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীরা সর্বক্ষণই তপুর চারপাশে থেকেছে। তপু হাসলে তারাও হেসেছে, কথা বললে তারা চুপ করে তপুর কথা শুনেছে। চালচলনে সম্পন্নতা ছাড়াও তপুর আর একটা গুণ প্রকাশ পেত। নেতৃত্ব। সবাই তপুকে প্রধান বলে মনে করত। তপু গুরু, তপু নেতা, তপু উজ্জ্বল। দলের মধ্যে থেকেও সে আলাদা।

তপু যখন কলেজের ক্যান্টিনে যেতো তখন ভিড় বাড়ত। কো-এডুকেশন কলেজ। তাই মেয়েদের ভিড় ক্রমশই নগণ্য থেকে গণ্য হয়ে উঠছিল। পুরোনো বন্ধুরা দু'চার জন ছিটকে গেল বৃত্তের বাইরে। সংখ্যা পূরণ হল নোতুন মুখের আগমনে। তপুর খরচা বাড়ছিল, মেয়েদের চা-তৃষ্ণা সহজেই মিটছিল। কলেজ ছাড়ার আগেই তপুর কানে অনেক কোকিলের ডাক পেঁাছালো। সেই সঙ্গীত-মূর্ছনাকে তপু স্বাগত করলেও মূর্ছা যাবার মতো মনের গড়ন তপুর ছিল না। পদ্মপাতায় জল করে তপু কলেজ জীবন পিছনে ফেলে এলো। সেই সঙ্গে কলেজের বসন্ত দিনগুলোকেও।

পাড়ায় তপুর বেশ নাম-ডাক হয়েছে। আড্ডায়, সরস্বতী পুজোয় এবং পাড়ার নাটকে, জলসায় তপুর বিশিষ্ট ভূমিকা। সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে তার কন্দর্পকান্তি দেহসৌষ্ঠবটিকে সে প্রত্যেক উপস্থিতিতেই প্রধান করে নিতে পারে। জানে কখন স্টেজের উপরে উঠতে হয়, ঘুরতে হয় এবং কখন মাইকের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ঘোষকের ভূমিকাটি সহজ ভঙ্গিতে পালন

করতে হয়। তপু তাই পাড়ার যুবসমাজের মধ্যমণি। সে প্রায় সকলেরই তপুদা।

তপুর নৈকট্যের লোভে তাই ছেলেরাও যেমন ঘুরঘুর করে, মেয়েরাও তেমনি। অন্দর মহলে খোঁজ নিলে জানা যাবে যে অনেক প্রৌঢ়-বৃদ্ধরাই তপুর বিষয়ে আগ্রহী। কারো ভাগ্নী, কারো ভাইঝি কারো বা ছোট শ্যালিকা। সেই সম্ভাব্য অভিভাবকরা নানান সময়ে, অনুষ্ঠানে এবং সুযোগে একটু বেশি পারমিসিভ হয়ে ওঠেন। অনেকে বাড়িতে ভাই ফোঁটার ব্যবস্থা করেন 'টার্গেট'-কে আশে পাশে রেখেই। অনেকে পাঠ্য-বিষয়ে উপদেশ-পরামর্শের প্রয়োজনে কাছে টানেন। তপু সবই বোঝে। অভিজ্ঞতা বাড়ে। সচেতনতাও বাড়ে। আর সেই সঙ্গে নিজের মূল্য-বেলুনটিকেও বেশ পুষ্ট-পুষ্ট বোধ করে।

প্রথম যৌবনের এই সচেতন পুষ্টি নিয়ে তপু যখন একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকরি পেল তখন বন্ধু-বান্ধবের বৃত্তে বহু বান্ধবীর আনাগোনা দেখতে পেল। তপুর বেশ ভাল লাগে। ভেতরে ভেতরে একটা দ্রুতবহমান স্রোতস্বিনীর দ্রুত-ভঙ্গ অনুভবও টের পায়। তাই তপুর ঘরে ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। ক্রমশই বহুস্থানের সঙ্গে তপুর দ্বৈত-পরিচয় ঘটতে থাকে। রেবাকে নিয়ে যেখানে যায় রুমীকে নিয়ে ঠিক সেই জায়গাটিতে যায় না। খরচের বিষয়টা তপুর অতীতেও কোন সমস্যা ছিল না, এখনও কোন ব্যাপারই নয়। তাই হাসি মুখে সঙ্গ-সুখ আর প্রিয়-নৈকট্য সহজ হয়ে তপুর সন্ধ্যাগুলোকে বর্ণময় করে তোলে।

ফেলে আসাটাই তপুর স্বভাব। ধরে রাখাটা ওর চরিত্রে নেই। যাদের ও ফেলে ফেলে আসে, রেখে রেখে যায়, তারা অনেক কষ্টেই তপুকে অপসৃয়মাণ দেখে, বহু বেদনায় তপুকে চিনতে পারে। তপুর চলমান জীবনের পিছনে তাই বহু তর্জনীর ঊর্ধ্বমুখ উত্তোলিত ছবি দেখা যাবে। সেই তর্জনী-মিছিলে অনেক মা-বাবা, মামা-মামির হাত যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি দেখা যাবে অনেক রীনি, মিনি, নিমিদের হাতও। তপুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সময়ও নেই। প্রয়োজন তো নেইই। তপুর সচেতনতা একটা নিশ্চয় মাত্রা পেয়ে গেছে ততদিনে। সে জানে একটি নয় দু'টি নয় বহু তিলোত্তমাই তার জন্যে যে কোনও সময়েই পাওয়া সম্ভব।

এবং ক'দিন যেতে না যেতেই তপুর অফিসের মধ্যেও জল্পনা হতে শুরু করে। স্তুতিও যেমন আছে নিন্দাও তেমনি আছে। বড়দের অন্তরালে আলোচনা, সমবয়সীদের জটলা আর মহিলা মহলে নিঃশব্দ একলা-মনের আলোড়ন।

প্রথম প্রথম যা ছিল খেলা খেলা, ভালোলাগা, তাই ক্রমশ হয়ে দাঁড়ালো নেশা। তপুকে নেশায় পেল। তপু এখন প্রায়ই বাড়িতে আর ডিনারের প্রয়োজন বোধ করে না। বাইরেটাই যেন নৈশ আহারের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। ডবল্ বিল্ দিতে তপুর কোনও কষ্ট তো নেইই বরং তাতেই তৃপ্তি। প্রথম প্রথম তপু নেশা করতে শুরু করেছিল এবারে নেশায় তপুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল।

বাড়িতে তপুর মা-বাবা অবশ্যই উপযুক্ত ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে শুরু করেছেন। তপু টের পেয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির জাল বিস্তার করে বিয়ের জালকে এড়িয়ে চলেছে। ঘরটা এখন আর তপুকে টানে না, বাইরেটাই যেন বেশি আকর্ষণ করে। মধু যা কিছু আছে জীবনে তা মৌচাকে নয়, ফুলের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে আছে। তপুর মনোভাবটা এমনিই।

এবং এই ফুল থেকে ফুলে মধুর অন্বেষণে চলতে চলতে তপু যেন মৌচাকের সত্যকে আর দেখতেই পেল না। কিন্তু সময় কারো জন্যে বসে থাকে না। সে নিরবধি সচল, আগুয়ান। তপুও কোনও ব্যতিক্রম নয়।

তাই তপুর জুলফিতে বরফের চিক্‌চিকানি দেখা দিল। অনিবার্য। বসন্তকাল-তো কোনও চিরস্থায়ী ঋতু নয়! ফুলের প্রাচুর্য হারিয়ে তপুর জীবনে অভাব দেখা দিল। ফুলের মধু না পেয়ে তপু বোতলে-বন্ধ মধুতে মন দিল। বন্ধুরা বলল—'এই হয়'; বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বললেন—'আগেই জানতাম'। মা-বাবা ভাবলেন আর দেরি করা চলে না।

সুতরাং শুরু হল 'তিলোত্তমা'-অন্বেষণ। ঠিকানা থেকে ঠিকানান্তরে ঘুরে মা যাকে পছন্দ করেন, বাবা তাকে বাতিল করেন। এবং 'ভাইসভার্সা'। মা খোঁজেন দুধে-আলতা বর্ণজ্যোতি, বাবা চান বনেদি বংশ। মা দেখেন মেয়ের চোখের চাউনি আর বাবার দৃষ্টি পাত্রীপক্ষের সম্পন্নতায়। মা জানতে চান মেয়ে গান-বাজনা জানে কিনা, রেডিও-টিভিতে অনুষ্ঠান-যোগ্যতা আছে

কিনা ; আর বাবা ভাবেন তন্বীতে প্রার্থিত পরিচ্ছন্নতা আছে কিনা। এই করে করে, মেয়ে দেখে দেখে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন মা-বাবা তখন কোথায়ও কোনওরকমের একমত হলেই ছেলের মতামতের ডাক পড়ে। ছবি দেখে, ইতিহাস মিলিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিতান্তই দেখে এসে ছেলে বলে, 'তোমাদের মতিভ্রম হল ?'

তপুর সহপাঠীরা যখন পুত্র-কন্যার স্কুলে ভর্তির সমস্যা নিয়ে ভাবছে তপু তখন পাত্রী পছন্দাপছন্দের বিষয় নিয়ে বিব্রত হচ্ছে। এবং সহকর্মীরা যখন নিজেদের দাঁত তোলানোর আর স্ত্রীদের মেদবাহুল্য নিয়ে বেশ চিন্তিত তপু তখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে তিলোত্তমা ছেড়ে 'উত্তমা হলেই চলবে' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এবং এই বিলম্ব আরও ফলাফল রেখে যাচ্ছে জীবনের বেলাভূমিতে। তপুর কপালটি ক্রমশই একটা ছোট খাট খেলার মাঠ হয়ে উঠছে! মরুভূমির এলাকা বাড়ছে ব্রহ্মতালুকে কেন্দ্র করে। এবং কানের পাশের বরফ এখন অনেক অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। প্রচলিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির প্রয়োগে সেই শুভ্রতা একটা বর্ণাভায় দ্যুতিময়। দোকানের কেনা চুলে মাথার মরুদেশে মরূদ্যান তেমন স্বাভাবিক ঠেকে না! তদুপর সেই পুরোনো চেতনা অস্তাচলে : তাই এখন উত্তমা ছেড়ে মধ্যমাতেও নিরুত্তাপ। মা-বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার পাত্রী নির্বাচনে মন দেন। তপু আর মেয়ে দেখতে যায় না।

পাড়ার মিতা, নীতা, নমিতারা এখন শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে অকারণেই 'তপু-দা' বলে খোঁজখবর নেয়। ভাগ্নী, ভাইঝিরা মুখ আড়াল করে বাঁকা হাসে। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে দু'চার কথায় শেষ করে দিয়ে তারা সরে পড়তে চায়। তাদের অনেক কাজ, অনেক দায়, সময়ের অনেক অভাব। আর অফিসে ? তপু ভাবে চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয় ? অন্য কোনও চাকরি পেলে অবশ্যই দ্বিতীয়বার ভাববে না তপু।

ঘটক ? তাই হল। যা একসময়ে ছিল অত্যন্ত সহজ, স্রোতের মতো যা একসময়ে তপুর ঘাটে উত্তাল ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়তে চাইছিল, তাই এখন ঘটক লাগিয়ে করতে হল। ঘটকে কি না পারে ? ছয়-কে নয় আর নয়কে ছয়—এতো ঘটকের এক আঙুলের কাজ। চুটকি ভর সমস্যা।

তাই, সকলে যখন তপুর আশা ছেড়েই দিয়েছিল, যখন সকলের ভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে হেলে পড়েছিল তখন হঠাৎ তপুর জীবনে সানাই-এর পোঁ দেখা দিল। ছাপানো সোনা-জলে রাঙানো কার্ড, নহবত, ফুলের মালায় সাজানো মারুতি গাড়ি আর উজ্জ্বল পোশাকের খস্ খস্ আওয়াজ তুলে বিয়ে এলো তপুর জীবনে। সময় যখন চলে গেল তখনই কেবল তপুর সময় হল। সময়ের সব বন্ধুদের একে একে হারিয়ে তপু অসময়ের স্ত্রীকে একা ঘরে, ফাঁকা ঘরে, নিয়ে এলো।

তাই বলছিলাম তপুর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হল গত বৈশাখে। একদিকে প্রকৃতিতে থার্মোমিটারে তাপের ঊর্ধ্বগতি পারদ অন্যদিকে তপুর মনোজীবনে অন্ত-বসন্ত গ্রীষ্মের ধূসরতা। তপু তাই সংক্ষেপে বিয়েটা সেরে ফেলতেই চেয়েছিল, সম্ভব হলে রেজিস্ট্রিমতে। মা বাবা বলেন, 'কেমন করে হবে ? একমাত্র ছেলে !' তাই বেশ জাঁক-জমক ব্যবস্থাই হয়েছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী-শুভানুধ্যায়ী সকলেই সাদরে নিমন্ত্রিত ছিলেন।

আর এই ধরনের সাধারণ সংযোগের মহাযজ্ঞে যা যা হয় তা সবই হল। আনন্দ-উদ্বেল শিশু-কিশোর, ফিস-ফিস মতামতে তরুণ-তরুণীরা, তির্যক বক্তব্যে যুবক-যুবতীরা এবং কটু-তিক্ত-কষায় মন্তব্যে পান-মুখে প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা বেশই মশগুল হলেন। সামনা-সামনি সকলেই সপ্রশংস হলেন ; একটু আড়াল পেলেই কেউ তপুর বয়স, বউয়ের পরিধি, কেউ তপুর টাক, ক'নের নাক নিয়ে কটাক্ষ করলেন। কেউ বললেন তপুর যা হোক একটা হিল্লে হয়ে গেল, কেউ বললেন মেয়েটির অতীত না জানলে কিছুই বলা যায় না। সকলেই কিন্তু খাদ্যখানার প্রশস্তি করতে ভুললেন না, ভুললেন না অভ্যাসমতো টেকুরটি তুলতে।

তপু এতোদিনে দাঁড়ে বসল। তপুর মতে জীবনকে ভোগ করতে গেলে একটু অবেলা-তো হবেই। ভোগের শেষে যদি দুর্ভোগ থাকেই তো করা যাবে কি ? অন্যেরা বলেন দুর্ভোগটাই দীর্ঘ হবে, ভোগটা স্বল্প। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন ঃ ভোগ করেছে একা, দুর্ভোগটা ভুগতে হবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ পরিবার নিয়ে। যেমন একা মাঠে গোল দিচ্ছিল সেটাই তপুর ভাল ছিল ; এখন গোলকিপার পেয়ে সবই ওর গোলমাল হয়ে যাবে।

অন্যের কথায় তপু কান দেয় না। দেয়নি। তাই তপুর বিয়ে করাটা হল।

॥ বড় বৌদি ॥

আমার বড় বৌদিকে আমি হয়তো কোন দিনই কাছে পেতাম না। কিন্তু হঠাৎই একদিন তাকে দেখতে পেলাম। শুধু দেখতে পেলাম বললে ঠিক বলা হবে না। একদিন হঠাৎই আমি প্রায় বিক্ষিপ্ত হয়ে বৌদির সংসার বৃত্তে ঢুকে পড়লাম। প্রবেশ মুহূর্তে অবশ্য সামনেই যিনি হাজির হলেন তিনি আমাদের 'কেনা' দা। সবে ষোল শেষ করে সতেরোর দিকে এগুচ্ছি। গ্রাম আর আধা শহর পার হয়ে কলকাতাকে বিরাট লাগছে, অবিশ্বাস্য লাগছে, বিস্ময় আর কেমন একরকমের ভয় ভয় ভাব মনকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। তাছাড়া অত্যন্ত ছোট বেলায় ক'এক বার মাত্র কেনাদাকে দুর্গাপুজোর সময়ে সাজাইলের বাড়িতে দেখেছি। আমি দেখেই চিনেছি, কিন্তু পরিচয় দিয়েই নিজেকে চেনাতে হল। নিজের বলে তো তখনও কোনও পরিচয়ই তৈরি হয় নি তাই পিতার পরিচয়ই আমার পরিচয়। আমাকে ডাক নামেই চিনলেন গোপালদা। চিনলেনই কারণ স্কুলের শেষ ক্লাসটি তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে আমাদের স্কুল থেকেই পড়েছিলেন। আমার গাত্র-বর্ণ, স্বাস্থ্য-সম্ভার, এবং লেখাপড়ার চমৎকারিত্বের জন্যে গোপালদা আমাকে অনেক নামেই ডাকতেন। সে সব নাম সমাজতান্ত্রিক বিচারে নবকুলের প্রতিনিধিদের জন্যে কদাচিৎ ব্যবহারযোগ্য ছিল। অভিনব সব অভিধা যুক্ত করে আমার প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অকাতরেই তিনি প্রকাশ করতেন। আমার খারাপ লাগলেও আমি গোপালদা'র প্রতি কখনও রাগ করিনি, অশ্রদ্ধা, করা তো দূরের কথা! গোপালদা খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। তাই ছিলেন আমার হিরো। তাঁর সব দোষ তাই ক্ষয় হয়ে যেতো। তাছাড়া গোপালদার হাতের লেখাটি ছিল দারুণ শিল্প-সুষমা মণ্ডিত। যেন ছবি লেখেন। আর শুনতাম ছাত্র হিসেবেও নাকি গোপালদা বেশ ভাল।

ঘরের মধ্যে যখন পুরোনো চেনা মুখগুলো নোতুন করে পেলাম তখন কলকাতার ইঁট-কাঠ-পিচের ভয় যেন একটু-এক-টুকরে দূরে সরে যেতে লাগল। এমন সময়ে ঘরে এলেন আমার বড় বৌদি। এক ঝাঁক সুন্দর যেন পাখা ঝাপটিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরের দরজা পার হয়ে এক ঢেউ প্রশ্ন

হয়ে আমার চোখের উপর আছড়ে পড়ল, 'কই দেখি কে তিনঠাকুরপো ?' আমার চোখে তিনি কি দেখলেন কে জানে। আমার তো মনে হয় সেখানে একমাত্র আদিগন্ত বিস্ময় থমকে ছিল। কোনও মহিলা এমন হতে পারেন ? এতো সুন্দর এতো স্বচ্ছন্দ ? 'এ যে দেখি একেবারেই পুচকে ঠাকুরপো ! এসো, আমার কাছে এসো তো দেখি'—বলে দু'পা এগিয়ে এসে আমাকে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে গেলেন। কলতলা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে নাও, খেতে দেবো, আর কথা শুনবো।' বলেই বড় বৌদি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

গ্রামে ছোটবেলাটা কেটেছে মা-মাসি-দিদি-পিসিদের সংগে। ছোট-বড় সকলেই আবাল্য চেনা। তাদের কাউকেই মহিলা বলে মনে হয় নি। এই প্রথম একজন মহিলাকে দেখলাম এবং কোনও শ্রেণীতেই তাঁকে ফেলতে পারলাম না। তার বড় ছেলে অসীম প্রায় আমার বয়সী। বড়বৌদির নড়াচড়া কথা বার্তা শুনতে পাচ্ছি। মগে করে জল নিয়ে কলতলায় দাঁড়িয়ে হাত পা পরিস্কার করছি। চোখে-মুখে জল দিচ্ছি। কিন্তু মনটা পড়ে আছে বৌদির কাছে, পিছনে পিছনে ঘুরছে, একেবারেই অচেনা লাগছে, একেবারেই নোতুন ! একটা দূরত্বকে তো বৌদি এক ঝটকায় মুছে দিলেন, কিন্তু আমার মনের গ্রাম্য ভয় ? বৌদি আমাকে জয় করে ফেললেন।

রান্না ঘর থেকে হাঁক দিলেন, গোপালঠাকুরপো চটপট স্নান সেরে নাও, তোমার সময় হয়ে গেছে। অসীম অঙ্কগুলো হল ? কই তুমি তৈরি হলে না ?' এই শেষ নির্দেশটি অবশ্যই আমার কেনাদার প্রতি। পরে অনেকদিন দেখে দেখে বুঝেছিলাম বৌদির সকাল শুরু হয় অনেক সকালে। এবং তাঁর সকালটা একটা এক প্যারাগ্রাফের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন আছে কিন্তু ফুলস্টপ সেই প্রায় সাড়ে দশটায়। তিন ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে তবে বৌদির সকালের ছুটি। পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টার দীর্ঘ বুনোটের সকাল। আমি বেকার ছেলে। তাই প্রায়ই হাতের লাঠি হিসেবে 'এটা আন' 'ওটা একটু করে দাও' 'সেইটা একটু এগিয়ে দাও' বলে নির্দেশ দিতেন আর অনভিজ্ঞ আমি যখন হাবাগঙ্গারামের মতো এদিক ওদিক করতাম তখন মিষ্টি মিষ্টি হাসতেন আর বলতেন 'তোমার দ্বারা কিছুই হবে না গো তিনঠাকুরপো !'

বড় বৌদি ছিলেন তার সংসারের কেন্দ্রবিন্দু। ছিলেন শক্তির উৎস। কেনাদার 'ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড'। আমাদের সকলেরই মাতা-বন্ধু-মিত্র। স্বামী-স্ত্রী, তিনটি সন্তান এবং আমরা তিনটি নির্ভরশীল অস্তিত্ব—আমি, গোপালদা এবং সুজয়। সুজয় সম্পর্কে আমাদের ভাগ্নে। তাছাড়া কালিঘাটের সেই ৬নং প্রতাপাদিত্য রোডে প্রায়ই পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় স্বজনের আনাগোনা লেগেই ছিল। কেনাদা বলতেন 'ট্রানজিট-ক্যাম্প'; আমি ভাবতাম 'প্ল্যাটফর্ম নয় কেন?' একটা চওড়া অন্ধ গলির প্রায় শেষ প্রান্তে এই বাড়িটি। সামনে একফালি সরু দাওয়া, প্রথম ঘরটি বেশ বড়। তার পাশের ঘরটি রান্নাঘরের পথে পড়ে এমন একটি সরু-পাড় ঘর। আড়াআড়ি একখানা চৌকি আর একটা চেয়ারের পর যে জায়গা পড়ে থাকে সেটি যাতায়াতের পথ। এই ঘর ছাড়িয়ে এক-পা বাইরে রান্না-ঘরের দরজা। এক ছাদের নিচে নয়, আলাদা। তাই রোদ-বৃষ্টির আক্রমণে সেই এক-পা ক্ষেত্রটি আক্রান্ত। বৌদি এক লাফেই পার হতে পারেন সেই ফাঁকটুকু। বাঁদিকে এক চিলতে বাঁধানো চাতাল। তার পাশে কলতলা, উপরে করোগেটেড্ টিনের উষ্ণীষ, নিচে সিমেন্টের চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটি করপোরেশনের জল পান করে সময় ধরে ধরে। তবে কলের বাঁট থেকে সোজাসুজি নয়, টিনের ডোঙা বেয়ে বেয়ে। পুরো ব্যাপারটা আমার গ্রামের চোখে খুবই মজার মনে হত! ছিদ্র দিয়ে জলের আগমন? ঘটি মেপে মেপে তার ব্যবহার? কেমন যেন আসলে কৃত্রিম মনে হত সব। কেমন যেন খেলা ঘরের যোগ্য বন্দোবস্ত! যা ছিল বিস্ময় তাই সয়ে গেল ক'দিনেই।

ক্রমশই এই কলকাতায় সহজ হয়ে উঠেছিলাম। বৌদি আমার সহায়। খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যখন সুজয়, দুলাল এবং অন্যান্যরা হুমড়ি খেয়ে পড়তো তখন আমি থাকতাম হয় বৌদির কাছে নয়তো বৌদিরই কোনও কাজে বাইরে। চাকরি আমার পছন্দ নয়। ছবি আঁকা শেখার ভূত তখনও আমার ঘাড় থেকে নামে নি। তাই ফাঁক পেলেই সকাল-বিকেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি আর সাইন-বোর্ড লেখার ঘুপসী দোকান দেখলেই সেখানে ঢুকে পড়ি। থাকা খাওয়ার জায়গা পেলে বিনা পয়সায় কাজ করে দেবো। এটাই ছিল আমার প্রস্তাব। এদিকে ভবানীপুর থানা ওদিকে টালিগঞ্জ পোল পেরিয়ে বেশ কিছুদূর। বালিগঞ্জ স্টেশন একদিকে তো চেতলা অন্যদিকে, হেন রাস্তা

নেই যে ঘুরছিনা। এ-বেলার সঙ্গে ও-বেলা যোগ হয়। যোগফলও শূন্য নামে হাতেও থাকে শূন্য! দোকানে-দোকানে আমার যোগ-এর যখন এমনি ফল তখন দিনে দিনে আমার বিয়োগফলও শূন্যই হতে লাগল।

বৌদি আমাকে আশ্বস্ত করেন। 'কিছু একটা হবেই'। তিনিই ছিলেন আমার মন্ত্রদাত্রী। আমি অভাগা। দিনান্ত শূন্য ঝুলি নিয়ে যখন ফিরে আসি ঘরে তখন 'আশা'-মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি আমাকে প্ররোচিত করেন 'পুণঃ স্হানের সন্ধানে'!

দাদা বি,এ বি,এল। কিন্তু ওকালতি করেন না। দাদার দুটি চোখের মধ্যে বেশ তীব্র 'দৃষ্টি-পার্থক্য' ছিল। সম্ভবত জনগণের মধ্যে জনগণের জন্যে কোর্টে সওয়াল জবাবে তার অনীহা ছিল। হাকিম যদি ভুল করে মনে করেন যে উকিল অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখছেন? অথবা যদি জেরা করার সময়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষী তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দেয় এবং ভাবে যে অন্য কাউকে প্রশ্ন করা হচ্ছে? তাহলে? দাদা তাই চাকরিই বেছে নিয়েছিলেন! সেখানে দুটি চোখের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ততটা বিপদ-জনক না-ও হতে পারে!

কিন্তু দাদার মনোভাবের কোনও দ্বিত্ব ছিল না। বৌদি যা করেন তাই অনুমোদিত। আর বৌদিকে দেখেছি সোজা কথা পরিস্কার করে বলতে তার কোনও অসুবিধা হয় না। কাজে বৌদির কোনও কষ্ট ছিল না। কিন্তু সংসার চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তিনি শুধু জানতেন বা বুঝতেন তাই নয় অপরকেও জলের মতো বুঝিয়ে দিতেন। গোপালদা চাকরি করতেন। তাকে টাকা বাড়িয়ে দিতে বলবেন। 'এক দুই মাস থেকে একটা ব্যবস্হা করে নাও তিনঠাকুরপো, তার পরে টাকা দিতে হবে। পারবে না? বেশি দেরি হলে চলবে না।' কিন্তু যতদিন না আমি কিছু একটা ব্যবস্হা করতে পারছি ততদিন মনে কোনও কষ্ট না রেখেই চেষ্টা করতে হবে আমাকে। শহরের র‍্যাশানের দাবি প্রত্যেককেই মেটাতে হবে। তাই বলে মনে এক ব্যবহারে অন্য পাবেনা তোমার বৌদির কাছে। মনে-মুখে আমার বড়বৌদি পরিস্কার।

সকালের রান্নাঘরের 'প্যারাগ্রাফ্' শেষ হলে শুরু হত তার ঘর গোছানো ঘর পরিস্কারের পালা। জামা-কাপড়, এটা ওটা সব জড়ো করে কলতলা।

এক নাগাড়ে ঘণ্টাখানেক আবার পরিচ্ছন্নতার সাধনা। সাবান জল চারদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে ফেনা ফেনা হয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বৌদির হাত চলছে যন্ত্রের মতো।' তিনঠাকুরপো, চলে এসো, এক সঙ্গে করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 'আমি তো একপায়ে খাড়া। সব ধুয়ে-চিপে আমাকে দিয়ে বললেন—'বেশ ঝাড়া দিয়ে দিয়ে টানটান করে মেলে দেবে, কেমন? আমি স্নানটা সেরে নেই!'

একঢাল কালো চুল পিঠের উপড় ছড়িয়ে নিয়ে বড় ঘরে বৌদি বসবেন চেয়ারে! সামনে সেলাই কল। পা এবং হাত চলবে সমান তালে। আগে কখনও সেলাই কল এতো কাছে বসে দেখিনি। এমন করে অন্তত দেখি নি। সেখানে তো বৌদি বসতেন না। সে তখন তো জামা-প্যান্ট সেলাই হল কিনা দেখতে গেছি মাত্র। সেলাই কলটিও যে একটা দেখার বস্তু তা তার পিছনে মনের মতো বৌদি না থাকলে জানাই হত না! আর কতো সেলাই যে থাকত বৌদির! রোজ-বসা চাই। কিছু না কিছু তাঁর রোজই আছে। আর বলতেন—'তিনঠাকুরপো, আমরা বেশ একটু পরে খাব, হ্যাঁ? এক সঙ্গে? বেশ গল্প করে করে?' আমি হাঁ করে বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম! এতো সুন্দর করে কি করে কথা বলে লোকে? বলা যায় তাহলে? মাঝে মাঝে মনে হত আমাদের গ্রামের মহিলারা যদি বৌদির মতো করে কথা বলতে পারতো তা হলে বোধহয় গ্রামের ছেলেদের আর কোনও দুঃখই থাকত না।

অথচ **এই** বৌদিটির আমার বৌদি হবার কথা নয়। সে জেনেছিলাম অনেক পরে। আমার জেঠামশাই, কেনাদার বাবা, ছেলের জন্যে মেয়ে দেখে দেখে আর পছন্দ করতে পারছেন না। ঘর পছন্দ হয় তো মেয়ে পছন্দ হয় না, মেয়ে পছন্দ হয়তো ঘর পছন্দ হয় না। বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ করে গেলেন উত্তর কলকাতার কোনও এক বাড়িতে। মেয়ে দেখতে। রাশভারি লোক, ছ'ফুট মতো দৈর্ঘ্য এবং মানানসই চেহারা। অনেক আসুন বসুন করে মেয়ের বাবা কাকারা জ্যেঠামশাইকে তাঁদের বৈঠকখানায় বসালেন। সবে গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছেন। তামাকের ব্যবস্থা হয়েছে। গল্পস্বল্প ছোট-ছোট বাক্যে একটু একটু করে এগুচ্ছে। জ্যেঠামশাই-এর দৃষ্টি ঘরের দেয়াল-মেঝে-আসবাবপত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সামনে-পিছনে

দূরে-কাছে আসা-যাওয়া করছে। ভিতরের দিকের দরজার পাশে উপস্থিতির আভাস দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। পাশের দরজা দিয়ে ভিতর বাড়ির কিছুটা অংশ ক্যামেরা-চোখে দেখা যায়। জ্যেঠামশাই-এর নজর চার দিকেই সজাগ। দু'এক জন যারা এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে তাদেরও তিনি বেশ ভাল করেই দেখছেন। মেয়ের বাবাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন তার তিনটি কন্যার মধ্যে 'এই'-টিই বড়। দ্বিতীয়টি বছর দেড়েকের ছোট। জ্যেঠামশাই বললেন আপনার মেয়ের চুল তো বেশ আজানু-দীর্ঘ! বর্ণটি বোধহয় কাঁচা হলুদের মতো এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মেয়ের বাবার চক্ষুস্থির! প্রথমে আমতা আমতা করে বললেন—'ঠিক তা তো নয়. তবে শ্যামলাই বলা চলে। আর চুল বেশ লম্বা তবে মেজো মেয়ের মত নয়। বড় মেয়ে তো বেশ পাতলা গড়ন। এবারে মেয়েকে এখানে আনার আজ্ঞা দিন, নিজেই সামনে বসিয়ে দেখে নেবেন।' জ্যেঠামশাই মেয়ের কাকাকে প্রশ্নকরে জেনে নিলেন বাইরে. ভিতর বাড়িতে থালা হাতে যাকে তিনি দেখেছেন সে দ্বিতীয়া কন্যা। প্রথমা নয়।

জ্যেঠামশাই নাকি তখনই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন: মেয়ে দেখাতে হবে না। মেজো মেয়েকে তিনি নিয়ে যাবেন যদি আপত্তি না হয়। বড়মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা সকলে মিলেই করা হবে। ততদিন জ্যেঠামশাই অপেক্ষা করবেন। প্রথমে বজ্রপাত, ক্রমে বিস্ময়ের বাতাবরণটি সরিয়ে দিয়ে জ্যেঠামশাই ওঁদের মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এবং যথাসময়ে সেই দ্বিতীয়াকেই অদ্বিতীয়া করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।

এই হল আমার বৌদির পতিগৃহে আগমনের প্রাথমিক ইতিহাস। ইতিহাস না উপাখ্যান তা আমার পরখ করা হয় নি। তবে তরুণ বয়সের যে ক'টি মাস বৌদির সান্নিধ্যে কেটেছে তা আনন্দেই কেটেছে। জ্যেঠামশাই ঠিক করেছিলেন না বেঠিক, বরণ করে যাকে ঘরে এনেছিলেন সেই বৌদি কতটা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ করেছিলেন ইত্যাদি বহু বুড়োটে প্রশ্ন সেই সময়ের কচি মাথায় কখনই প্রবেশ করে নি। তবে যতদিন সেই বৌদির ছায়ায় ছিলাম ততদিনই দেখেছি যে বৌদির সৌন্দর্য যেমন তীক্ষ্ন ছিল, তাঁর দৃঢ়তাও তেমনি তীব্র ছিল। অথচ কখনও ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোনও কটু কথা বলতে শুনি নি. সব্যসাচীর মতো দু'হাতে শতকাজ অক্লান্ত করে চলেছেন

অথচ কপালে কখনও ভাঁজ পড়তে দেখিনি আর দেখিনি দাদার সঙ্গে কখনও ঝগড়া-বিবাদ করতে। সেটা বৌদির গুণ না আমার দাদার গুণ তা তখন বুঝিনি। বারে বারেই মনে হয়েছে সব বাড়ির সব বউরা কেন বৌদির মতো হয় না। অসীম-অরুণকে স্কুলে পাঠানো অথবা মাধুরীকে ঝুঁটি বেঁধে দেওয়া থেকে শুরু করে দাদার ব্যাগটি গুছিয়ে দিয়ে টিফিনের কৌটোটি বিষয়ে ছোট-খাটো নির্দেশ দেওয়া সবই যেন সুনিপুণ পরিপাটি ছিল।

দুপুরে মহিলাদের একটা দিবা-শয়ন বা দিবা-নিদ্রার ব্যাপার ছোট বেলাতেও দেখেছি বড়-বেলাতেও দেখেছি। বৌদির সে পাট ছিল না। কিছু না কিছু কাজ তার যেন ঘড়ির কাঁটার চলনেই বাঁধা থাকত। বুঝতে পারতাম না কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না তিনি কাজের জন্যে হন্যে হয়ে অপেক্ষা করতেন! কখন যে বিকেল হয়ে যেতো তা বুঝতে না বুঝতেই বৌদির তৎপরতা টের পেতাম। কলতলায় অনেক কাজ। রান্নাঘরের কাজ। এবং সব সেরে নিয়ে নিজেকে বেশ পরিপাটিটি করে গুছিয়ে নিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্যে অপেক্ষা। ততক্ষণে দ্রুত হাতে জলখাবারের ব্যবস্থা শেষ! বৌদির এই দিনলিপি যেন কবিতার এক-একটা 'স্ট্যানজার' মতো সাজানো থাকতো। রাত্রের রুটি সন্ধ্যাতেই করে ফেলতেন। ছেলে মেয়ের পড়ার সময় তাদের পাশে হয়তো একটু বসলেন। সঙ্গ দিলেন। টুকিটাকি প্রশ্ন করলেন। অঙ্ক দেখে দিলেন। আবার মাঝে মধ্যে ঠাকুরপোদের আর ভাগ্নের পিছনে লেগে একটু আধটু খুনসুটি করেও যেতেন। দাদা হয়তো কাগজ নিয়ে বসেছেন। তার পিছনে একটু লাগা চাই। আমার দিকে তাকিয়ে দাদা হয়তো একটু মুচকি হাসি দিলেন। বুঝলাম ওটা অবশ্যই বৌদিকে দিয়েছেন! কিন্তু দাদার এই অনন্যদৃষ্টি নিয়ে কখনই কোন কথা বলতে শুনিনি। দাদা নিজে অবশ্য মাঝে মধ্যে রসিকতা করতেন নিজেকে নিয়ে। ট্রামে বাসে কি দুর্ভোগ হয়েছে সে কথা বলতেন। হয়তো সত্যি হয়তো বানিয়ে বলা! তখন অতশত বুঝি না। একবার দাদার মুখের দিকে, একবার বৌদির মুখের দিকে হাঁ করে তাকাতাম। আর অবশ্যই বোকার মত হাসতাম।

রাতের ৬ নম্বর বাড়িটা যেন একদিকে আড্ডাখানা অন্যদিকে পাঠশালা হয়ে উঠতো। উভয়ক্ষেত্রেই বৌদি হতেন সূত্রধর। আটটা থেকে ন'টার মধ্যে

সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ। কিন্তু আমার কেমন ম্যাজিক্ ম্যাজিক্ মনে হত। কোথা থেকে আসে কোথা চলে যায় বুঝতে পারিনি প্রথম প্রথম। ঐ বিছানাপত্রের কথা বলছি। খেতে যাবার সময় যে ভাবে ঘরের অবস্থা দেখে যেতাম ফিরে এসে একেবারেই অন্য চেহারা, অন্য বিন্যাস দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ঘর ভর্তি ঢালাও বিছানা, বালিশ, পাশবালিশ, মশারীর চাঁদোয়া! ওদের তেঁতুলপাতায় স্থানাভাব না থাকলেও দুলির বাড়িতে দুলালের ওখানে চলে যেতাম রাত্রের ঘুমের জন্যে। এ ব্যবস্থাটা ক'দিন পরেই করে নিয়েছিলাম। এখানে স্থানের টানাটানি আর ওখানে লোকের টানাটানি! তাই এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

বৌদির কাছে আমার দিনলিপি বর্ণনা একটা দ্বিপ্রাহরিক কাজ ছিল। আমরা একসঙ্গেই খেতাম। সকালের সকল কাজের এবং অকাজের বর্ণনা বৌদি মন দিয়েই শুনতেন। হুঁ-হ্যাঁ দিতেন। মন্তব্য করতেন। আমার ভীষণ ভাল লাগত, আপন আপন মনে হত। ছবি আঁকার চেষ্টা তখন অথৈ জলে। সুতো-বোতামের ব্যবসা করছি। ব্যবসা তো নয় 'ফেরি' করছি। 'হকিং'। দোকানে দোকানে। বৌদিই বলেছিলেন, পথ দেখিয়ে ছিলেন। বলে ছিলেন যারা 'টেলারিং-এর কাজ করে তাদের টুকি-টাকি অনেক জিনিস লাগে যা তারা হাতের কাছে পেলে আর দোকানে যাবে না। বড় বাজার থেকে কিনে আনবে আর দোকানে দোকানে যোগান দেবে। ব্যাস্ লাভের অংশ তোমার পকেটে। বললাম "ক্যাপিট্যাল?" "আমার হাতে তো কিছুই নেই তোমাকে দেবার মতো।" অনেক প্ল্যান করে সে কাজ করে ছিলাম। দুলি আমাকে কুড়িটি টাকা দিয়েছিল। তাতেই আমার অনেক কাজ হয়ে ছিল। সে অন্য কথা অন্য কাহিনী।

দু'সপ্তাহের মধ্যেই আমার মুখে হাসি দেখে বৌদি খুব খুশি হয়ে ছিলেন বাহবা দিয়েছিলেন। আমার দাদা 'বৌদির দিকে' তাকিয়ে আমাকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। "তোমার হবে, আমি বলেদিলাম তোমার হবে।" বলেছিলেন। গোপালদাও শুনে খুব খুশি হয়ে ছিলেন। আমার দিনগুলো ক্রমশই উত্তেজনাময় হয়ে উঠছিল। আর বৌদি যেন আগ্রহ করেই আমার দিনলিপি শুনতে চাইতেন। এমন হয়েছে যে দুপুরে আমার ফিরতে বেশ দেরি। বেলা গড়িয়ে গেছে। ভয়, একটু লজ্জা কিছুটা সংকোচ

নিয়ে যখন ঘরে ফিরেছি তখন দেখেছি বৌদি না-খেয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন! হয়তো শেলাই নিয়েই বসে আছেন। "তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাও, এক সঙ্গে খাব।" আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই স্নেহময়ী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কখনও রুষ্ট হতে দেখি নি।

তখন সেই বয়সে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিতুলনা আপনা থেকেই মনে চলে আসতো। সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আমার সচেতন অতীত জীবনেও বৌদি পেয়েছি, জ্যেঠিমা পেয়েছি, মা, দিদি, মাসি পেয়েছি। তাদের সঙ্গে আমার মাটির সম্পর্ক। আমার ঘরের মধ্যে আমার বৌদি ছিলেন। জিতেনদা আমার আপন জ্যাঠতুতো দাদা। কেনাদার চাইতে কিছু বড়। আমার সেই বৌদি শহরের নন। আধা শহর আধা গ্রাম তাঁর স্বভাবকে তাঁর মতোই করে গড়ে তুলেছিল। অনেকাংশে ফর্সাই ছিলেন কিন্তু, এমন শ্রী ছিল বলে মনে হয় নি। অন্তত এই বৌদির মতো সে-মুখে স্নেহের শ্রী মমতার কমণীয়তা কখনই দেখি নি। এমন হতে পারে দীর্ঘদিনের অন্যায় অত্যাচার আমার সেই স্বগৃহ বৌদিকে আমার প্রতি বিরূপ করে থাকবে. হয়তো কিছু শাসনের দায়ভাগ বহন করে বৌদি আমার কাছে শ্রীহীন 'অভিভাবক' বলে গণ্য হতেন। হতে পারে আমার চোখের দোষেই বৌদিকে 'বৌদি হিসেবে' পাই নি!

ছ'নম্বরে এসেই আমি একই ব্যক্তির মধ্যে মাকে পেলাম, দিদির ভালবাসা পেলাম আর বৌদির আদর পেলাম যা গ্রামের বাড়িতে পাইনি। বিশ্বাস করুন বয়সের অত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বৌদিই ছিলেন আমার বন্ধু, পরামর্শ-দাতা। তখন আমার সেই ছোট্ট জীবনে বলার মতো কোনও কথাই ছিল না। এখন অবশ্য মনে হয় কথা থাকলেই বলা যায় না, কথাটা বলার মতো মনটাই আসল। অনুভবের তহবিলে এমন কোনও সঞ্চয় ছিল না যা প্রকাশ করে আনন্দ পাওয়া যায়, অপরের আগ্রহকে ধরে রাখা যায়। এখন মনে হয় বৌদির সঙ্গে তখন যে অনেক-কথা বলতাম, বন্ধুর মতো আমার সেই অর্থহীন প্রলাপ যে বৌদি মন দিয়ে শুনতেন তা আমার কোনও গুণে নয় বৌদির সহানুভূতিশীল মনটাই আমাকে দিয়ে বলাতো। কি বলতাম? এখন তো ভেবেই পাইনা অত যে কথা খেতে বসে বলতাম তার বিষয় কি ছিল? খাবার পরে ঘণ্টাধিক যে সময়টুকু বৌদির পাশে পাশে কাটিয়ে দিতাম তা কি দিয়ে ভরাট

হত ? হয়তো আমার অবান্তর দিনলিপিই ছিল সেই কথার বিষয়। হয়তো বাড়ির কথা হত, মহেশ্বরপাশার দিদির কথা হত, আমার ছোটবোন আর ভাইদের কথাও বলতাম। আবার এমনও হতে পারে এ-সব কিছুই না। আমি যে কলকাতায় দোকানে দোকানে ঘুরি সেই সব কথা, বড় বাজারের কথা আনন্দবাজারের সম্ভাব্য চাকরির কথা—এই সব ছাই পাশ দিয়েই আমাদের মনের সেতুবন্ধন ঘটতে থাকত। আমার সেই সব কথার মধ্যে গ্রাম্য ছেলে-মানুষী, কৈশোরের কাঁচা-সবুজ বোকামিই প্রকাশ পেত। আমার অবাক মনের মধ্যে আসলে বৌদির সন্নিধ্যই আমাকে হয়তো বাচাল করে তুলত।

এখন মনে হয় প্রত্যেক মনের গভীরে একটা পূজার বাসনা দিঘির মতো স্থির হয়ে অপেক্ষা করে। বৌদিকে তো আমার দেবী বলে মনে হত। কোনও মহিলার সঙ্গে বৌদির মিল খুঁজে পেতাম না। যে বয়সে মনে কাশ-ফুলের ঝুটি পুচ্ছ-তোলে, যে বয়সে হৃদয়ের আকাশে পাখির ডানা-মেলা সংক্ত-গতি শেফালি-ফুলের মতো গন্ধবহ হয়, প্রাণের চঞ্চলতা যখন সবেমাত্র কুলু কুলু অজানার উদ্দেশ্যে ছন্দবন্ধ গতি পায়, হঠাৎই সেই বয়সে সোজা সামনে বৌদিকে পেয়ে আমার সব চেতনা, সকল অনুভব সমস্ত আকাঙক্ষা পুজা হয়ে ঝরে পড়েছিল।

অল্পদিনের ব্যবধানে আমি আমার গুহ-বৌদি ছাড়া তিনজন বৌদিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। মহেশ্বরপাশার বাত্যাবিক্ষুব্ধ দিনান্তে যখন আমি একেবারে একাকিত্বের নিঃসীম নির্জনতায় দিন যাপন করছি তখন পেয়েছিলাম প্রসাদ-বৌদিকে। ফুলতলা। ফুলতলা ছিল দোলতপুর স্টেশনের পরের স্টেশন, কলকাতার দিকে। প্রসাদদার কথা ছোটবেলা থেকেই এতো শুনেছি যে তিনি আমাদের মতো মর-ছাত্রদের কুলে অমর কিশোর বলে সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। প্রসাদদা আমাদের সাজাহলের স্কুল থেকেই স্টার-মার্কস নিয়ে এবং একাধিক বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ছাত্রদের কাছে প্রসাদদা ছিলেন উদাহরণ। স্কুলেও যেমন শিক্ষকদের কাছে শুনতে হত, বাড়িতেও তেমনি অভিভাবকদের কাছে। বাবার চিঠিতে সেই প্রসাদদার ঠিকানা পেয়ে ফুলতলা গেছিলাম। ইংরেজীর দুর্ধর্ষ এম. এ. প্রসাদদা সিভিল-সাপ্লাইতে তখন কাজ করেন। আমি তাঁর কাছে

গেলাম তাঁর বৈদগ্ধের সন্ধানে নয়, চাল-ডাল-চিনির সন্ধানে! বাজারে পাওয়া দুষ্কর। সেই সুবাদে প্রসাদ বৌদির সঙ্গে পরিচয়।

মাটির কাছে দৈনন্দিনের আটপৌরে অভিভাবক বৌদির বাইরে সেই আমার বৌদি পাওয়া! তাঁতের কাপড়ে মাড়ের গন্ধ, ধোপদুরস্ত বাসা-বাসা বৌদি দেখে তাই বেশ নোতুন নোতুন লেগেছিল। বয়সে আমার বড় বৌদির চাইতে ক'এক বছরের ছোটই হবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিম-ছাম, ফর্সা বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। তিনি আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন খুবই সহজে! কিন্তু বড়বৌদিকে দেখে যেমন অবশ অবশ মনে হয়েছিল, প্রসাদ বৌদিকে দেখে সেরকম হয় নি। ভাল লেগেছিল তার আপন করা ভাবটি, শ্রদ্ধা করেছিলাম তার পরিপাটি ব্যক্তিত্বকে। এর বাইরে অন্য কোনও ভাবের অঙ্কুর দেখা দেয় নি। সেখানেও আমার উপস্থিতি প্রয়োজনের তাড়নায়। আমি প্রার্থী। ছ'নম্বর প্রতাপাদিত্যেও তো আমি প্রার্থী হয়েই গেছিলাম। কিন্তু ফুলতলায় আমি আমার প্রয়োজনের থলের মধ্যে বাস্তবকে গ্রহণ করেছি। এবং ফিরে এসেছি। ছ'নম্বর যেন আমার সর্বদেহে শান্তিজল ছিটিয়ে আমাকে অঞ্জলি ভরে দান করেছে। ফুলতলায় সেতুবন্ধ ছিল না, ছিল একটা বাঁশের, প্রয়োজনের বংশ-খণ্ডের, সরু যাতায়াতের পথ। ছ'নম্বরে যেন পেলাম একটা প্রশস্ত মনের সড়ক-যোগ, একটা সেতুবন্ধ, যেখানে আমি যাতায়াত করতে পারলাম আমার সবটুকু নিয়ে। আমার গ্রাম্যতা, আমার অনভিজ্ঞ তারুণ্য, আমার অসহায় বর্তমান—সবই যেন একটি কোমল মনের সহানুভূতিশীল আঁচলে বাঁধা পড়ে গেল।

সাজাইলে, ফুলতলায় এবং কিছুদিন পরেই দেয়ানগঞ্জে, বৌদিদের সম্পর্কের খাতায় যেন ডেবিট-ক্রেডিটের হিসেবে আমার লেজার এ্যাকাউন্ট। দেনা-পাওনার খতিয়ানেই সে হিসেব শুরু এবং শেষ। তার বাইরে আর যা' কিছু তা যেন অপ্রয়োজনীয়, বাজে ব্যাপারের বোঝা। প্রতাপাদিত্য রোডের কিন্তু কোনও লেজার এ্যাকাউন্ট খোলাই হল না। প্রথম দিন থেকেই, বলা যায় প্রথম দর্শনেই, বুঝে গেলাম এ- বৌদি আমার হিসেবের ঘড়ায় তোলা জল নয়, মেঘনার গভীর গতিস্রোতটি যেন কলকাতার চার-দেয়ালে কেনাদার সংসার পাড়ে আটকা পড়ে ঋজুচলনে স্থির-গতি হয়ে আছে। এ-বৌদি আমার প্রয়োজনের পিপাসা-বারি নয়, জীবন-বোধের অবগাহন-স্নিগ্ধতার মহানদী।

বৌদি আমাকে আহার আর সংক্ষিপ্ত বাসস্থান দিয়েছিলেন, সেটা বড় কথা নয় ; সে যেন স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু বৌদি আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন, মনের জোর বাড়িয়েছিলেন, এগিয়ে যাবার শক্তি যুগিয়েছিলেন আর আমার বাইরে-বাইরের আমিটাকে যেন কোনও মন্ত্রবলে ঘর-ঘর আমিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। কোন্ মায়ামন্ত্রে যে তিনি এটা করেছিলেন তা আমার জানা নেই। অনেকের যেমন কথা নয়, জীবনটাই বাণী হয়ে ফুটে ওঠে, এ বোধহয় তেমনিই ছিল।

এই ছ'নম্বরে থাকার সময়েই বিশ্ব আমার চোখে আবর্তসংকুল অনিশ্চয়তা নিয়ে বারে বারে আমাকে এদিক-ওদিক তাড়িত করেছে। নানাসময়ে নানা রূপে। কখনও 'ছবিতে সাইনবোর্ডে' টানছে, কখনও স্বাভাবিক অনুকম্পা বশে কোনও অজানা-অচেনার চেহারায় চাকরির হাতছানি, কখনও বা লক্ষপতি ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আঁচড়ে, পূর্ণ সিনেমার দেয়ালে, র‍্যাকের মধ্যে থরে-থরে সাজানো রঙ-বেরঙের কাপ-প্লেট-ইউটেনসিল হয়ে। টালমাটাল জীবন তরীটিকে ঠিক পথে চালনা করার জন্যে স্বাভাবিক অভিভাবক, মা-বাবা, কাছে নেই। যে দিক-নির্দেশ যন্ত্র ব্যক্তি তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি করে নেয় তা তখনও আমার মধ্যে ছিলই না। আমার সকল চিন্তা সকল ভাল-মন্দ বোধ তখন একজনের চোখের তারায় আর মনের কম্পাসে পরিচালিত। সেই চোখ আমার বড় বৌদির, সে মনটিও তাঁর।

এরকম সময়ে নরেশদার আবির্ভাব। নরেশদা বড়দার পরের পরের ভাই, তৃতীয় জন। চতুর্থ জন, ভোলাদা। তাঁকে আমি চিনতাম কারণ দেশের বাড়িতে দশমশ্রেণী শেষ করেছেন। নরেশদাকে চিনিনা, মানে যে বয়সে দেখলে 'চেনা'টা চেনা হয় সেই বয়সে তাকে দেখিনি। ঢাকায় ব্যবসা। দেয়ানগঞ্জ-এ। কলকাতায় বাজার করতে এসে আমার দিকে তার নজর পড়ল। ক'দিন কাটল বাজার করার ব্যস্ততায়। একদিন আমাকে টান মেরে সঙ্গে করে বড়বাজার নিয়ে গেলেন। বাজার করা শেখাবেন, ব্যবসা শেখাবেন, দেয়ানগঞ্জে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যে গেলেন তাও সম্ভব হল সেই বৌদির কথায়। "যাও না ঘুরেই এসো বড়বাজার থেকে, নোতুন জগৎ দেখতে পাবে, ব্যবসার আর এক ধাপ, আর এক রকম। তারপরে দেয়ানগঞ্জ যেতে না চাইলে যাবে না, ব্যাস্।"

আমার কাছে যা ভীষণ শক্ত-বলে মনে হচ্ছিল, বড়বৌদি তা এক কথায় সহজ করে দিলেন।

নরেশদা যে আমাকে বেশ নজর করেই দেখছিলেন তা বুঝেছিলাম আগেই, এবং বৌদির সঙ্গে আমার বিষয়ে যে আলোচনাও হচ্ছিল, হচ্ছিল দাদার সঙ্গে তাও আমার চোখে পড়েছে। দু'দিন নরেশদার সঙ্গে কাপড়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে, লোহাপট্টিতে যাতায়াত করে দেখলাম ব্যাপারটা যত কঠিন বলে মনে হয়, এই ব্যবসায়িক কেনাকাটা, তা তত কঠিন নয়। নরেশ দা বললেন, "চল আমার সঙ্গে।" বললাম, "কেমন করে হবে? বাবার মতামত ছাড়া?" মোক্ষম জায়গায় 'সুইচ্' টিপলেন, "বড় বৌদি বললো তো হবে?"

কেনাদাকে সামনে বসিয়ে বৌদি অনেক গম্ভীর করে একটি সিদ্ধান্তকে ধাপে ধাপে উদ্ঘাটন করলেন। সেদিন বৌদির অভিভাবক রূপটি বেশ বড় হয়েই ভেসে উঠেছিল। মা-বাবা থেকে দূরে, তাঁদের বড় ছেলে বিষয়ে সেই দিনের সিদ্ধান্ত যে বেশ গম্ভীর ছিল তা বোঝা গেল বৌদির কথাবার্তায় এবং কেনাদার মৌন সমর্থনে। তবে শেষকালে বৌদি বলেছিলেন যে আমার বাবা যদি অন্যরকম কোনও মত দেন তাহলে অবশ্যই যেন আমি সে রকম করি এবং দেয়ানগঞ্জে আমার জ্যেঠামশাই যদি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন না করেন তাহলে অবশ্যই যেন আবার ছ'নম্বর প্রতাপাদিত্য রোডে ফিরে আসি।

কলতলাতে যে বৌদিকে সাবান কাচা করতে দেখেছি। যাঁকে দেখেছি একটার পর একটা রুটি কতো সহজেই গল্প করতে করতে খুন্তি দিয়ে উল্টে পাল্টে তৈরি করছেন, যাঁকে ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে এবং স্বামীর পিছনে লাগতে দেখেছি, সেই বৌদিই যে প্রয়োজনে কতো অন্যরকম হয়ে যেতে পারেন তা দেখে আমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। বৌদি শুধু সুন্দরই ছিলেন তাই নয় অত্যন্ত দৃঢ়ও ছিলেন।

সব থেকে স্মরণের যা তা হল এই যে বৌদি আমার বৌদিই ছিলেন। তাঁর মুখে "তিন ঠাকুরপো" যেন এই সেদিনের কথা।

।। মুনিদা ।।

মধ্যদিন তখনও অদূরে। দ্বিতীয় পিরিয়ড সবে শেষের দিকে। এমন সময়ে অধ্যক্ষের নোটিস ছাত্রছাত্রীদের চারদেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিল। অধ্যাপক মহল অনিলের আশেপাশে উষ্ণ পানীয়ের আকর্ষণে একে একে জুটে যেতে লাগলেন। যাঁরা ক্লাস-এর জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে গুছিয়ে গাছিয়ে মগজের থলি ভরে ধীর পায়ে মহাবিদ্যালয়ে সদ্য প্রবেশ করছিলেন তাঁরা বিরস বদনে পণ্ডশ্রমের কথা স্মরণ করেই বোধহয় ঝোলা-ব্যাগ টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে ধপাস্ করছিলেন।

প'ড়ে পাওয়া সময়কে কাজে লাগাতে মুনিদার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। আড্ডা দেবার এমন মওকা হাতছাড়া করা চলবে না। পর্দা সরিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। ঘরে মুনিদা একা-ঘরে এক-প্রান্তে নেহাৎ একাকী থেকেও একা ছিলেন না। এক রাশ উষ্মা তাঁকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম কারণ মুনিদা সমানে আঙুল মট্‌কাচ্ছিলেন, বসেছিলেন বেশ আড় হয়ে এবং চোখ ছিল মেঝের সঙ্গে আটকে। মুনিদার কতখানি রাগ হয়েছে তার মাত্রা মাপা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তিনটিই যখন উপস্থিত তখন রাগের বিষয় এবং প্রকৃতি যে ভীষণ তা বুঝতে মোটেই সময় লাগল না।

আমার মনের হালকা ভাব দিয়ে মুনিদার মনকে ছুঁয়ে দিতে চাইলাম "কি ব্যাপার? কে সেই নরাধম যে আপনার আঙুল মটকায়? কোন্ সে বিষয় যা আপনাকে আড় ক'রে মেঝে-দৃষ্টি করল?" মুনিদা চোখ দিয়ে সামনের চেয়ারে নির্দেশ করলেন আর 'বচন' দিয়ে ব্যক্তিকে, "চতুষ্পদের মস্তক"! বুঝে গেলাম সেই হেড অফ্ দি ডিপার্টমেন্ট-সমস্যা। মুনিদার বিভাগে হেড্ ছাড়া আর চারটি পদ বা পোস্ট আছে। চারিপদ ঘটিত দোষ তো আছেই কারণ পদ-চতুষ্টয়ের গতি-ছন্দ-গন্তব্য এবং দিক সর্বদাই অমিত্র-আখর কেটে কেটে চলে। আর ওঁদের যে মাথা বা হেড তিনি এই বেঢপ-চলন বিভাগ-প্রাণীকে নিয়ে অনবরত দাবার ঘর কাটতে ভালবাসেন। মুনিদা বলেন, বিভাগীয় বিষয়ে তাঁর যতটাই বিকর্ষণ বিভাজনের নীতিতে তিনি

ততটাই আকর্ষণ বোধ করেন। এই মাথাকে নিয়ে মুনিদার যতটা মাথাব্যথা তার চাইতে অনেক বেশি শিরঃপীড়ার কারণ অন্যত্র। চারটি পায়ের মধ্যে একটি স্বেচ্ছায় এবং পূর্বইতিহাস হেতু ল্যাজের মতো ব্যবহার করেন এবং উৎফুল্ল হয়ে ব্যবহৃতও হন! কোনও পা যখন ল্যাজের মতো স্থান ও মূল্য ধরে তখন তা পদত্বের ধিক্কার, ল্যাজের অগৌরব। মুনিদার রাগ সেখানেই।

মুনিদাকে আমি খুবই আপন ভাবি। মুনিদা আমাকে ভাবেন তার চাইতেও বেশি। তাই মুনিদার গৃহ-বিবাদের কথাও যেমন জানি তেমনি বিভাগ বিভাজনের বিষয়ও অজানা নয়। তাঁর জীবনের আনন্দের ফলার সন্দেশে আমার সব সময়ে যে ভাগ জোটে তা নয়, কিন্তু মুনিদার বেদনার লোষ্ট্র-লগুড় গুলো প্রায় সবই তিনি আমার জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে থাকেন। কারণ বোধহয় এই যে মুনিদা মনে করেন যে তাঁর ভাগের দু'চার ঝুড়ি লোষ্ট্র আর দু'চার বান্ডিল লগুড় আমার পর্বত প্রমাণ সংগ্রহের চাপ ও ভারকে বিশেষ হেরফের করাতে পারবে না। এই ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ধনী বলে মনে করেন বলেই বোধহয় আমার অভিজ্ঞতার নির্যাস-নির্দেশ আশা করেন।

মাথার গুঁতোয় আর ল্যাজের ঝাপটায় মুনিদা বেশ বিব্রত। বাকি যে দুটি পা বিভাগীয় চলনে সামিল তারা প্রকৃতই দুর্বল, প্রকৃতির জন্যে এবং প্রকৃতি বলেও। দু'জনই মহিলা। বিবাহিত জীবনে নিজ নিজ গৃহের সমুদয় সামঞ্জস্য রাখতে আর দৈনন্দিন ক্লাসের চিৎকার চাহিদা মেটাতে তাঁদের সকল মানসিক জমার অ্যাকাউন্ট এবং সমস্ত শারীরিক শক্তির পুঁজি শেষ হয়ে যায়। নিজ নিজ শূন্য মাথা নিয়ে দাবাড়ু বিভাগীয় মাথার চুসি সামলানো তাঁদের সাধ্য নয়।

মুনিদা আছেন ঠিক মাঝমধ্যিখানে। তাঁকে ডেকে নেবার কেউ নেই। এ-পারে মাথা-ল্যাজার ছন্দবদ্ধ সিং-ঝাপটা আর ও-দিকে মৌন-মূক নিশ্চেষ্টতা। আঙুল মটকানো ছাড়া মুনিদার আর কিইবা করার আছে? আছে! বলেছিলাম, "মুনিদা, মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে অফিসারী করুন।" অবাক বিস্ময়ে মানে খুঁজেছিলেন। মুনিদা স্বভাব-মাষ্টার। যে কোনও সমস্যা এলেই তিনি নিজের বক্তব্যকে দ্যাট ইজ টু সে, ইন আদার ওয়ার্ডস, অর্থাৎ, ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে বসে যেতেন। অনেক কথা বলা মুনিদার স্বভাব সিদ্ধ।

তার ফাঁকে ফাঁকে মুনিদা তাঁর স্মৃতির থলে থেকে ঈশপের গল্প, বিদ্যাসাগরের উপাখ্যান আর শত-শত কবিতার লাগসই উদ্ধারে, নিজ বক্তব্যকে তেজালো এবং অখণ্ডনযোগ্য করার চেষ্টা করতেন। আর সেই বহু-কথনের আধিক্যের মধ্যে হেড এবং টেল মুনিদাকে ঘায়েল করার রসদ খুঁজে পেতেন। নেভার ট্রাই টু মেক এ গুড কেস বেটার—বলে বলে মুনিদাকে কখনই সচেতন করতে পারি নি। মুনিদা তাই খেসারত দিচ্ছেন আঙুল মটকে।

মুনিদার হেড 'শতং বদ মা লিখ' নীতিতে বিশ্বাসী, নাহলে ডকুমেন্ট বাড়ে। মুনিদা নিজে স্বভাব শিক্ষক তাই কথায় একবার পেলে তিনি কোথায় থামবেন জানেন না। ফলে সাপ্তাহিক অফ্-ডে নিয়ে মহাভারত তৈরি হয় কিন্তু ডে স্থির হয় না, ইউ জি সি সেমিনার-এ কে ডেপুটেড হবেন তা স্থির করতে ডিপার্টমেন্টাল মিটিং-এ কুরুক্ষেত্র লেগে যায় কিন্তু কোনও সমাধান হয় না। ইস্যু যেখানে ছিল সেখানেই ফ্রিজ্ড্ হয়ে যায়, কথার পর কথা, তর্কের উত্তরে তর্ক, ডাইভারসন্ থেকে ডাইভারসন্ হয়ে হয়ে সেরিবেলাম যথেষ্ট উত্তেজিত হয় সেরিব্রাম কাজ করতে সময় পায় না। হেড উত্তাপের জ্বালা নিয়ে ল্যাজের ব্যজনের অপেক্ষা করে; মুনিদা আঙুল মটকাতে চেয়ারে আড় হয়ে বসে মেঝে-দৃষ্টি থাকেন।

মুনিদা সেদিন দুঃখ করে বললেন, "জানেন, সারা জীবনই আমার এই আঙুল মটকে কাটল! সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় নিয়ম-কানুন আসলে কোনও নিরপেক্ষ কিছু নয়—নাথিং অ্যাবসোলিউট—সবই ব্যক্তি-সাপেক্ষ। যে যখন হাতে স্টিয়ারিং পায় সেই তখন ঐ সব সত্য-মিথ্যার নিয়ামক-চালক-নিয়ন্তা বনে বসে। টুইস্টেড এন্ড ফিটেড, নিজ নিজ প্রয়োজনে এবং স্বার্থে যা সার্থক ভাবে ব্যবহার করা যায় তাই সত্য, ন্যায়, নিয়ম। ছোটবেলায় আমার পাঁচ বছরের বড় দাদাকে দেখেছি নিয়মকে কেমন অবলীলায় মুচড়িয়ে 'কিল-কিল' খেলায় আমার পাওনা প্রত্যেক দানের শেষেই মিটিয়ে দিচ্ছেন আর নিজের বেলায় এ্যাকাউন্টে জমা করছেন। সেই বয়সেও পিঠে অনেক ব্যথা সহ্য করে নিয়মের ফাঁক এবং ফাঁকি বুঝতে পেরেছিলাম। তার পরে সারাজীবনই দেখলাম অনেক কিল না খেলে 'কিল খাওয়ার নিয়ম'-এর ফাঁক ফোকর বুঝে উঠতে পারি না। এটা কি আমার বুদ্ধির দৈন্য? সরল বিশ্বাসের পাওনা? কি এটা?"

মুনিদার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ভূয়ো-দর্শন নেই আমার। যেটুকু দেখেছি এবং দেখছি তাতে বুঝে গেছি যে বুদ্ধির দৈন্যও যদি হয় তা হলে মুনিদা সেই দীনদলে একা নন, বহুর মধ্যে একজন মাত্র। সাধারণ মানুষ সরল বিশ্বাসেই জীবনে পথ চলে। অসাধারণদের কথা আলাদা। সব সমাজেই অসাধারণরাই হেড হয়ে বসেন; তাদের টেল এর অভাব হয় না। আর অগণিত পৃষ্ঠদেশের যোগান দেবার দায় তো আমাদেরই। নান্যপন্হা!

———

॥ হারুর মা ॥

যাঁরা কথাশিল্পী তাঁরা কথার মালা গেঁথে গেঁথে কথাকেও যেমন প্রাণ দান করেন, মালাকেও তেমনি শোভন-সুন্দর করে তোলেন। যখন তাঁরা কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলেন তখন তাঁরা সেই বিষয়কেই নয়ন-নন্দন ফুলসাজে সজ্জিত করে সর্বজনের মনমোহন করে উপস্থাপিত করেন। কোনও ব্যক্তিকে যখন তাঁরা নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপিত করেন তখন সেই ব্যক্তি, সেই যে কোনও ব্যক্তিই, শ্রোতা-পাঠকের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী স্থান পেয়ে যায়। কথা-শিল্পীর শব্দ-বিন্যাসের মাধুর্যে আর হৃদয়ের অনুভবে ভিজানো তুলির টানে অনেক তুচ্ছ কথা উচ্চকথার মান পায়, অনেক সাধারণ জীবন অসাধারণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি কালো মেয়ে আলোময় হয়ে ওঠে, আর আমরা সকলেই সেই কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখের গভীরে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করার সুযোগ পেয়ে যাই।

হারুর মা এক সর্বহারা দরিদ্র জননীর নাম। নিজের একটা শৈশব অবশ্যই ছিল যা হয়তো সে কখনই স্মরণে আনে নি। ছিল একটা তরুণ বয়স যাকে তার মা-বাবা অপরের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে সামাজিক দায় থেকে মুক্ত হয়েছিল। স্বামীর ঘরে এসেও যে হারুর মা নিজেকে খুঁজে পেলনা তা তো তার নামের মধ্যেই প্রকাশ পেয়ে গেল। আসলে হারুর মা-রা কোনওদিনই একটা আস্ত ব্যক্তি নয়, একটা স্বতন্ত্র-স্বাধীন অস্তিত্বের বিন্দু-বৃত্তে নিজেদের দেখতে তারা সুযোগই পায় না। ছ'টি সন্তানের জননী হারুর মা প্রথম জীবনে পিতার কন্যা হয়ে মধ্যজীবনে স্বামীর স্ত্রী হয়ে এবং বাকি জীবন পুত্রের জননী হয়েই কাটিয়ে গেল।

হৃতশ্রী দরিদ্র ঘরের ঘেরাটোপে একাধিক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে দিয়ে হারুর মা যখন প্রায় বিরক্তির তাড়নায় আর অনাবশ্যকতা বোধের জ্বালায় স্বামী পরিত্যক্ত তখনই হারু এসে তাকে বাঁচাল; হারু তাই তার জীবনের Lease deed, তার জীবনের প্রলম্ব দৈর্ঘ্যের অভিজ্ঞান হয়ে এলো। যখন নিজের অর্থহীন জীবনে নিজের ইচ্ছায় মরার বাসনাটুকুকেও আঁকড়ে ধরার মতো জোর খুঁজে পায় নি হারুর মা তখনই তার হারু এসে তাকে সেই বাঁচা-মরার অধিকার দিল।

বাঁচা-মরার অধিকার পেলেও খাদ্য-যোগানের অধিকার দিল কি ? স্বামী অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মার খেতে খেতে অকালেই বয়সের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দাওয়াকে আপন করে নিল। সংসারের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর একটি কাজ সে নিয়মমতো করে যেতো। বিড়ি ধ্বংস করা আর হারুর মাকে বিরক্ত করা। এই অপোগণ্ড সন্তানদের মুখ চেয়ে হারুর মা সারাদিন গৃহ থেকে গৃহান্তরে 'গৃহকাজে' সহায়ক হয়ে অর্থের যোগান নিশ্চয় করতে লাগল। নিজের গৃহ বলতে তার রইল উনুন আর ভাতের হাঁড়ি।

হারুর মা'র হাড় জিরজিরে শরীর, কোটরাগত চোখ আর জলে-বাসনের আক্রমণে হাতে-পায়ে হাজা মতো সাদা-সাদা ছোপ! হারুর মার মুখে কথা নেই, সম্ভবত মনেও কোন কথা বলার মতো করে সে খুঁজে পায় না। মুখ বুজে কাজ করে, এক বাড়ির কাজ শেষ হলেই "যাচ্ছি বৌদি" বলে অন্য বাড়ির দিকে ছুট দেয়। সময় কোথায় দু'দণ্ড বসে কাটানোর ? অনবরত সময়কে টাকা বানাতে ব্যস্ত হারুর মার জীবন যন্ত্রের মতো কর্কশ-শুষ্ক, কঠিন।

আমার সদ্যজাত শিশুর জন্যে হারুর মার কাজ বেড়ে গেল। টাকাও বাড়ল, মুখে দু'একটা করে কথা ফুটল এবং ক্রমশই সময়ে টান পড়তে লাগল। অনেক পরে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম শুধু সময়েই নয়, হারুর মার মনেও টান পড়ছে। ধার্য সময় থেকে বেশি সময় বাচ্চার কাছে থাকে, যখন তার আসার সময় তার অনেক আগে আসে আর যাবার সময় বেশ বিলম্বিত হয়। ওর সময় আর কাজের ধরন ধারণ এখন আর মাসান্তে অর্থ পরিমাণে মাপা যায় না! যে কাজের জন্যে ও টাকা পায় সে সব কাজ যেনতেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলে, আর যে কাজ ওর করার নয় সেই কাজে এখন ওর যেন অফুরন্ত সময়। বাচ্চা এখন একটু একটু বড় হচ্ছে, তার কান্না বাড়ছে, বিরক্তি প্রকাশের পরিমাণ বাড়ছে, দুষ্টুমির ধরন-ধারণ বাড়ছে। সুযোগ পেলেই "বৌদি আমার কাছে দাও"—বলে হারুর মা সেই চপল শিশুকে কোলে নিয়ে বসে যায়, আসন-পিঁড়ি হাঁটুতে উপর-নিচে দোল দেয়, পাখি দেখায় আর অক্লান্ত বক্‌বক্‌ করে। বাচ্চার কান্না মুছে যায় কিন্তু হারুর মার সময় হারিয়ে যায়। দুই অসম বাক্যবাগীশের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকে সরবে, সানন্দে এবং ছন্দে-লয়ে। সন্তানের জননী

রান্না ঘরের ছ্যাঁক-ছোঁকের বাতাবরণে কখনও বা আড় চোখে সেই অসম মিলনের সংগীতকে উপলব্ধি করেন, আমার লেখা-পড়ায়, ভাবনায় অকারণ ছেদ পড়ে।

হারুর মা এতোদিন সন্তান প্রসব করেই মায়ের কাজ শেষ করতে বাধ্য হয়েছে। শিশুকে লালন-পালন করার মধ্যে যে মাতৃত্ব সহজে প্রকাশ পায়, সাবলীল মুক্তি পেয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলে তার খবর তো জানাই হয় নি হারুর মার। তাই নিজের ঘরের সর্বহারা আঁতুড়ে, আঁতুড়-ঘরে, হারুর মার বন্ধদশা শেষ হলেই সে অর্থের সন্ধানে মাতৃত্বের উৎসধারাটিকে কোমরে-আঁচল বেঁধে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। শিশুর কান্না তাকে বিব্রত করতে পারে নি, দুষ্টুমিও পারেনি প্রত্যক্ষের জগতে প্রবেশ করতে। আর শিশুর হাত-পা নাড়া? আকাশ-বাতাস নেড়ে-চেড়ে খেলা করার চপলতা? উচ্চারিত অর্থহীন শব্দ ক্ষেপণ? সব মিলিয়ে কাছের লোকদের কাছে টানার যাবতীয় বালখিল্য আচরণ? এ-সবই হারুর মার জন্যে নয়, কারণ সে তখন অন্য কারো গৃহে সন্তানস্নেহকে শিকলে বেঁধে, হৃদয়ের অপত্য-প্রীতিকে বাসন-মাজার জলে ভাসিয়ে দিয়ে তণ্ডুল সংগ্রহ সংগ্রামে নিযুক্ত। একদিন হয়তো হারুর মা ভুলেই গেছিল যে স্নেহ একটা দ্বৈত সম্পর্ক যা নৈকট্য খোঁজে, শৈশব একটা সুন্দরের ক্রমশ প্রকাশের কাল, মাতৃত্ব একটা লালন পালনের নাম, শুধু প্রসবের নয়, একটা পীযূষ-ধারার মোহানা-প্রাপ্তির অনুভব, আঁতুড়-অন্ত দ্বিত্ব-মাত্র নয়!

আমার মনে হল হারুর মা তার অভুক্ত হৃদয়ের অবদমিত মাতৃ ক্ষুধার তৃপ্তির জন্যে তার অতি কৃপণ সময়কেও ধীরে ধীরে অফুরন্ত করে তুলছিল। মনের অতীত মরুভূমিতে আমার সন্তান হয়তো হারুর মার অজান্তেই মরূদ্যানের পত্তন করে ফেলেছে। হারুর মার মধ্যে যে একটা দিক্‌হারা উদ্‌ভ্রান্ত মাতৃত্ব অবস্থা আর পরিবেশের মার খেয়ে খেয়ে মৃতপ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে কোনও এক নিভৃত কোণে অপেক্ষা করে ছিল তা যেন এতোদিনে বন্যার আকার নিয়ে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল।

"বৌদি, আমি চাটুজ্যেদের বাড়ির কাজটা ছেড়ে দিলাম!" টেবিলে আমার কলম থেমে গেল। অনেক আগেই ভেবেছিলাম যে এটা ওর কপালে আছে। আমাদের বাড়ি সেরে ও যেতো চাটুজ্যেদের বাড়িতে। নিত্যদিন বিলম্ব তারা সইবেন না এ তো নিশ্চিত। "কেন?" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার

টাকা কমে যাবে না ?" হারুর মা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "ওদের ওখানে কাজ করতে ভাল লাগে না। আর তাছাড়া এতো বাড়ির কাজ আমার শরীর আর সহ্য করতে পারছে না।" হারুর মা দ্রুত ভিতরে ঢুকে গেল, 'দাদুসোনা' করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল আমার ছেলেকে নিয়ে।

চাটুজ্যেদের বাড়িতে সবই আছে, ভালো মাইনে, কম লোক, অল্প কাজ। কিন্তু ওখানে শিশু নেই ; এখানে আমার বাড়িতে শিশু আছে এবং সে অত্যন্ত দুষ্টু। হারুর মার অর্থ-অন্ধ স্বার্থ-জীবন এখন একটা শিশুর হাতের মার খেয়ে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল ! স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলাম যেন ওর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

হারুর মা প্রায় পনেরো বছর একনাগাড়ে কাজ করল। বদলীর চাকরিতে আমরা বহু বছর বাইরে কাটালাম। হারুর মাকে অবসর ভাতার ব্যবস্থা করে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হারুর মা আবার কাজে লাগল। কিন্তু ক'দিনেই বুঝলাম হারুর মার সেই জগৎ কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার ছেলেমেয়েরা অনেক বড় হয়ে গেছে। একেবারে ছোটটিও এখন কলেজ যায়। দেখে বুঝতে পারি হারুর মা এঘর ওঘর করে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। ছেলেমেয়েদের দেখে কিন্তু যেন চিনতে পারে না। সে দোষ হারুর মার নয়, আবার ছেলেমেয়েরও নয়। সে দোষ সময়ের, অদৃশ্য সময়ের, দীর্ঘ অদর্শন জনিত শূন্য সময়ের।

হারুর মার মেয়েগুলোর একে একে বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু 'হাড় জুড়োয়' নি। মাঝে মধ্যে মায়ের কাছে এসে তার দৈন্যকে তারা বাড়িয়ে দেয়। স্বামী অনেক আগে চলে গেছে এবং অনেকটা ভারই কমিয়ে দিয়ে গেছে। একমাত্র ছোট ছেলেটাই ভরসা। শৈশবের ক্ষীণদেহ, অপুষ্ট ল্যাংচানো হাড়জিরজিরে কাঠামোটায় এখন তারুণ্যের ছোঁয়া লেগেছে, আমরা চলে যাবার পর হারুর মা বোধহয় 'সন্তানহারা জননীর' মতো নিজের ছোটটাকেই দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিল। তাই বোধহয় হারুর মা সবকিছুই হারাতে বসেও খুঁজে পেয়েছিল কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে মোহানার প্রশান্তি, উৎসের পীযূষ ধারাকে মনে মনে সজীব সচল করে প্রবাহিত করেছিল, ব্যর্থতাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল।

———

॥ সরলা ॥

সরলা বিয়ের পরদিনই শ্বশুর বাড়ি চলে গেল, তাইতো নিয়ম। কিন্তু নিয়ম যে এতো বেদনাদায়ক তা সরলা গত তিনচার মাসের প্রস্তুতিপর্বে বোঝেনি, কাল রাতে, এমনকি ভোর রাতেও তেমন করে অনুভব করে নি। চলে যাওয়ার সম্ভাবনা, আর চলে যাবার বাস্তব ক্ষণটির মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ তা ঘুণাক্ষরেও সে টের পায়নি। মা-বাবা ভাই-বোনকে ছেড়ে যখন সত্যি সত্যিই যাবার জন্য পা বাড়াতে হল তখন বেনারসীর আঁচলে, ফুলের মালার পাঁপড়িতে সদ্য আলোড়িত হৃদয়ের ব্যথাগুলো যেন ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

সরলার মা তাঁর জামাই এর কাছে বার বার করে একটা কথা বলেছিলেন, "সরলা আমার নামেও সরলা মনেও সরলা, তুমি বাবা, ওকে একটু দেখে শুনে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।" তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। জামাই বার বারই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল, "আপনি কিছু ভাববেন না, মা। আমরা সকলেই দেখব, আমি তো দেখবই।" তবুও মায়ের মন শান্ত হতে পারে নি, "তোমার মাকে ব'ল, সরলা এখন থেকে তাঁরই মেয়ে। আদর করা শাসন করা এখন থেকে একা তাঁরই কাজ। তিনি যেন সরলাকে নিজের মতো করে তৈরি করে নেন।" আঁচলে চোখ মুছে তিনি জামাই-এর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

চব্বিশটি বছরের তিল তিল করে গড়ে ওঠা অতীতকে,—শৈশবের শত স্মরণ, বাল্যের খেলাঘর, কৈশোরের চয়ন-সঞ্চয় আর যৌবনের ঊষাক্ষণ থেকে প্রভাতের পাখি ডাকা সকাল—সবকেই কেমন এক দিনে, এক লহমায় ফেলে রেখে যেতে হল। যেন নিজেকেই ছিন্ন করে, দ্বিখণ্ডিত করে অনিশ্চিত অজ্ঞাত ভবিষ্যতের থালায় নৈবেদ্য করে অজানা-অচেনা কোন এক বা একাধিক দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিতে হল। শুভদৃষ্টির স্বল্প দেখায় যাকে সে জীবনে প্রথম দেখল এবং চিনল তার কতটাই বা সে দেখতে পেল? কতটাই বা সে চিনতে পারল? তারই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ করে সঁপে দেবার জন্যে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিল।

সরলা সুন্দরী নয় কিন্তু শিক্ষিতা। সে গৃহকর্মে নিপুণা নয় কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহী। বাইরের চাইতে সরলা নিজের অন্তরের মধ্যেই নিজের জগৎ তৈরি করে সন্তোষ লাভ করে। বাইরের বস্তুগত ভোগের প্রতি নয় অন্তরের মননশীল উপভোগের জন্যে সে লালায়িত। তাই সরলা লেখাপড়ায় যতটা মন দিয়েছে তার শতগুণ বেশি মনোযোগ দিয়েছিল গান শিখতে, ছবি আঁকতে, কবিতা পড়তে। সংবেদনশীলতা সরলা চরিত্রের প্রধান গুণ, অত্যন্ত অনুভবী মন। শরীরের শত কষ্টে সরলার দুঃখবোধ নাড়া খায় না, মনে এতটুকু আঘাত ওকে উতলা করে তোলে। সরলার মা বাবা এ-সব জানেন। এবং জানেন বলেই তাঁরা অত্যন্ত ভীত, উৎকণ্ঠিত। অতীতদিনের মূল্যবোধে অনুশীলিত সরলা কি আধুনিক গতিসর্বস্ব সমাজের কাছে পরাভূত পর্যুদস্ত হবে?

দেখে শুনে, দু'টি পরিবারের প্রধানরা একাধিক বার পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সর্ববিষয়েই একমত হয়ে—মতানৈক্যকে adjust করে নিয়ে—যে বিবাহ অনুষ্ঠান ঘটল তা তো সর্বার্থেই আনন্দময় এবং শুভদায়ক হবার কথা। কিন্তু তা হয় কৈ? সরলার মা-বাবা পাত্রের পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলে, গৃহ-বিন্যাস দেখে আর তাঁদের পুত্রকন্যাদ্বয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করে এসে বলেছিলেন, "অত্যন্ত অমায়িক, সংস্কৃতির ছাপ গৃহে-প্রাঙ্গণে সর্বত্র যেন একটি পরিশীলনের ছাপ এঁকে রেখেছে, এবং ভদ্র, মিষ্ট ভাষী।" সরলাদের বাড়ি থেকে ফিরে অতনুর মা-বাবাও বলেছিলেন, "শিক্ষিত রুচিশীল এবং নিরহংকারী পরিবার।—ছোট এবং সুখী পরিবার। যত্ন আর অনুশীলনই যে জীবনের প্রধান মূল্য তা যেন স্বতঃপ্রকাশ। এবং ভদ্র, মিষ্টভাষী।" তাই প্রজাপতি আঁকা ছাপানো কার্ড আর সানাই-এর দীর্ঘমেয়াদী সুরলহরী দূরে থাকতে পারে নি।

অতনু মাতৃঅন্ত প্রাণ। মা ততোধিক পুত্র-অন্তপ্রাণ। মা কনে দেখে এসে ছেলেকে বর্ণনা আর বিবরণ দিয়ে বলেন, "পছন্দ হয়েছে?" ছেলে বলে, "তোমার পছন্দই শেষ কথা।" ছেলে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান। গৃহের বর্তমান ভবিষ্যৎ এই ছেলের উপর নির্ভর করে। বাবা অবসর নিয়েছেন। ছোট ছেলে সদ্য চাকরিতে যোগ দিল। পুত্রবধূ পছন্দ বিষয়ে মায়ের মনে শত আশঙ্কা, সহস্র উৎকণ্ঠা। ছেলের বিয়ের কথা তিনিই তাঁর স্বামীর কাছে

তুলেছিলেন। "ছেলে বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে, এখন একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়া দরকার।" স্বামী খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলেছিলেন, "তা, দিলেই হয়।" স্বামীর দায়সারা গোছের উত্তর শুনে স্ত্রী বলেছিলেন, "গত রবিবারের কাগজ থেকে ক'একটা বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়ে রেখেছি। দেখে দেখে চিঠি লিখে দিও।" এবারে কাগজ থেকে মুখ তুলতেই হল। বিবাহের পর থেকে সর্বব্যাপারেই স্ত্রী পথের রেখাচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন, তিনি হেঁটে গন্তব্যে পেঁাছেছেন। এখনও তার ব্যতিক্রমের কোন কারণ ঘটে নি। স্ত্রীর বক্তব্য যে শেষ হয় নি তা বুঝেই তিনি মুখ তুলেছিলেন। রেখা চিহ্ন দেখে এবং বুঝে নেবার জন্যে! "সুন্দরী মেয়ে কিন্তু আমি ঘরে আনব না। আমি চাই আটপৌরে, গৃহকাজে নিপুণ, শান্তশিষ্ট কিন্তু শিক্ষিত মেয়ে।"—এখনও যে শ্রোতা হিসেবে সহযোগিতা করার কথা তা স্বামীর জানা। তাই তিনি চোখ দিয়ে স্ত্রীর কথাগুলো ক্রমে ক্রমে দেখে নিতে চাইছিলেন। "ছেলে আমার শিক্ষিত, তাই মেয়ে matching হওয়া চাই। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের বা'র-টান হয়, বাইরে থেকেও টান আসে; তোমাকে বলে লাভ নেই, তুমি সব বুঝবে না। যা বুঝবে তাই বলি। আমাদের এই প্রথম কাজ, ছেলের আলাদা ঘর হলে তার জন্যে উপযুক্ত আসবাবপত্র চাই তো না কি? তাছাড়া ওকে মানুষ করতে কি কম খরচা করতে হয়েছে? রেখা চিহ্নগুলো পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল এতোক্ষণে। স্ত্রীকে অবশ্য অপরিষ্কার কথা বলার দায়ে অভিযুক্ত করার কারণ কোনও দিনই তিনি খুঁজে পান নি। ভেবেছিলেন সব পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। তাই বলেছিলেন, "সব ঠিকই মনে থাকবে। ভয় কি?" স্ত্রী এবারে একটু ঝংকার দিয়ে যোগ করেছিলেন।" দোষ আমার কপালের। অন্য কোনও স্ত্রী হলে এতোদিনে তোমার ভরাডুবি হত। ছেলের বিয়ের আগে যে এই বাড়িটার মেরামত দরকার একটা ঘর অন্তত বাড়ানো দরকার তা বলে না দিলে তুমি বুঝতে পারতে?" সত্যিই তিনি বুঝতে পারতেন না। তা স্বীকারও কবলেন। বললেন, "বোঝার সুযোগ পেলে লোকের বোঝার অভ্যাসটা জন্মায়। তুমি যে আমার সব বোঝার ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছো গিন্নী। আমার ভাবনা কি?" তীক্ষ্ন চোখে স্বামীর চোখে চোখ রেখে পড়ে নিলেন কোনও খোঁচা আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে 'সব মনে থাকে যেন'—বলে নিজের কাজে চলে গেলেন।

মনে যে ছিল তা সরলার বাবা পাকা কথার সময়ে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন! নীতিগত চেতনা আহত হয়েছিল কিন্তু ভাবী বৈবাহিকা ব্যাপরটা আঁচ করতে পেরেই পরিবেশনে নিজেই কোমর বেঁধেছিলেন। এবং পরিবেশনের কুশলতায় কষ্টের কাঁটাগুলো আর তেমন করে বিঁধতে পারে নি সরলার বাবাকে। তিনি মেনে নিয়েছিলেন। সব শেষে বৈবাহিকা মহাশয়া যখন আসবাবপত্র বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিলেন তখন অভিভূত হওয়া ছাড়া আর কোনও পথ্যছিল না পাত্রীপক্ষের। বলেছিলেন, "কলকাতায় কেনা, পাঠানো, হাঙ্গামা এমনকি ক্ষতির কথা ভেবে যদি ছেলে নিজে পছন্দ মতো বিহারেই কোন স্থানীয় দোকানে order দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয় তাহলে তো আপনার ঝামেলাও থাকে না পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারও মিটে যায়!" "উত্তম প্রস্তাব" বলে পাত্রী পক্ষ একবাক্যে একরাশ টাকা হস্তান্তরের ঘোষণা করেছিলেন।

মেয়েরা বড় হলে মায়েদের বিবেক-রক্ষক—Conscience Keeper—হয়ে যায় বলে শুনেছি। অতনুর বোন তার মাকে প্রশ্ন করেছিল, "সবই ঠিকঠাক হল, কিন্তু বৌদির গায়ের রঙ একটু উজ্জ্বল হলে ভাল হত।" মা মুখ টিপে একটু হেসে বলেছিলেন, "বোকা মেয়ে! সুন্দরী বউ এনে ছেলেকে হাতছাড়া করি আর কি?" মেয়ে মায়ের বৈষয়িক বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়েছিল।

সরলা অষ্টমঙ্গলায় মায়ের কাছে ফিরে এলো। আনন্দোজ্জ্বল জীবনের বিবরণ দিল। "শ্বশুর মশাই অমায়িক এবং স্নেহপরায়ণ, দেবর ননদরা অত্যন্ত মিশুকে আমুদে আর সরল, শাশুড়ীতো একেবারে মায়ের মতো মমতাময়ী।" সরলার সরল দৃষ্টিতে বিবাহোত্তর আলপনাময় জীবন চকচকে ঝকঝকে glitter নিয়ে ধরা পড়েছিল। তার কতোটা gold তা তার সারল্যের নিকষে ধরা পড়ার কথা কি?

চাকরিতে প্রয়োজন মতো ছুটি সম্ভব হয় নি বলে 'হনিমুন' ভবিষ্যতের জন্যে স্থগিত রেখে অতনু চলে গেল কর্মক্ষেত্রে। তিনমাসের মধ্যে Posting নিল দিল্লীতে, ডাক পড়ল বিলম্বিত Honeymoon এবং দিল্লী দেখার। মা বললেন "মেয়েদেরও তো দিল্লী বেড়ানো হয় নি, ওরাও যাক।" ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পারে না, সরলা বিস্ময়কে রোধ করতে পারে না, আর ননদ মায়ের দূরদর্শিতায় আর একবার অভিভূত হয়ে পড়ে।

দু'চারদিনের ছুটি নিয়ে অতনু ঘরে এলে পাহারা আরও কড়া হয়ে ওঠে। ছেলের সংগে বহু কথার প্রয়োজন ঘন ঘন দেখা দেয়, অনেক পরামর্শ তখন অনিবার্য হয়ে হাজির হয়। তাই মা সে সব কাজ নিজেই ছেলের ঘরে গিয়ে সেরে আসেন। তার বাইরে বড় মেয়ে এটা-ওটার দরকার মেটাতে দাদার কাছে যায়। সরলা যতক্ষণ রান্নঘরে থাকে ততক্ষণ কাজের এই সব শত-শত অঙ্কুর লতা-গুল্ম তেমন করে উদ্ভিন্ন হবার সুযোগ পায় না!

তাল কাটে, ছন্দ পতন ঘটে। উৎসব দিনের আলপনা-দিনগুলো হাড় জিরজিরে ফ্যাকাশে চেহারা নিতে থাকে। বৈবাহিকার নির্দেশে নালিশ আসে সরলার বাবার কাছে, "কিছুই শেখান নি মেয়েকে। একমাত্র স্বার্থপরের মতো স্বামী-সেবা ছাড়া!" বজ্রপাত ঘটে এ-দিকে। সর্বনাশের সংকেত দিনের স্বস্তি আর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

অতনু on promotion বদলী হয় মেঘালয়ে। তপ্ত কটাহ থেকে মুক্তি পেতে সরলা স্বামীর স্মরণাপন্ন হয়। মা বলেন "সংসার গুছিয়ে দেওয়া তোমার মতো আনাড়ির কাজ নয়। আমি যাব।" মেয়ে বোঝে মায়ের গোপন ভাষা তাই সে মাকে সমর্থন করে। কিন্তু অতনু সরলাকেই সংগে নিয়ে মেঘালয়ে চলে যায়। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য।

একবছর না ঘুরতেই সরলা মা হতে চলল। এবারে মমতাময়ী জননী তাকে গর্ভধারিনী জননীর কাছে চালান করে দিলেন। এক ঢিলে দুই পাখি বধের এমন অপূর্ব সুযোগ সেনাপতিরা কখনই হাতছাড়া করেন না। নিজের ছেলেকে একা পাওয়া গেল, অপরের মেয়েকে দূরে সরিয়ে দেওয়া গেল। বললেন, "নিজের মা যেমন করে করবেন তেমন কি অন্যের পক্ষে সম্ভব?" ছেলে বলল, "সে তো ঠিকই"। মা বললেন "দূরে গিয়ে তুই একেবারে শুকিয়ে গেছিস, দেখাশুনা হয় নি তো! এবারে তোকে আমি একটু আদর যত্ন করতে সুযোগ পাব।" ছেলে মনে মনে ভাবল, "মা ছাড়া এমন মমতাময় কথা আর কে বলতে পারে?"

সরলা ঝিনুকবাটি নিয়ে সন্তান লালন পালনে দিন কাটায়। দিন তার কাটে কি? ভবিষ্যতের দিনগুলো?

।। অতনুর সঙ্কট ।।

অতনু মনে মনে ছটফট করছে। সকালগুলো তার কেটে যায় নানান ব্যস্ততায়। বাজার করা, শিশুকন্যাকে মাঝে মাঝে কোলে নেওয়া এবং তার পরেই দৌড়ঝাঁপ করে অফিসের জন্য তৈরি হওয়া। সামান্য আয়ের স্বাস্থ্যহীন চেহারার কথা ভেবে সর্বক্ষণের কোনও সন্তান-সহায়ক সংগ্রহের কথা সে ভাবতে পারে না। তাই স্ত্রীকে এবং সদ্যোজাত কন্যাকে একা রেখেই সে সকালে অফিস চলে যায়। নানান কারণে স্ত্রীর মনের অবস্থা ভাল নয়, প্রসবের পরে তার স্বাস্থ্যও আর আগের মতো ফিরে আসে নি। শিশু সন্তানের এটা-ওটা তো লেগেই আছে। তার মধ্যে একটা বড় রকমের ধাক্কায় সেই ছোট্ট প্রাণটুকুও ধুকপুক করে টিকে আছে। এ-সব নিয়ে অতনুর মনে চিন্তা দুশ্চিন্তা তো আছেই। কিন্তু একটা ভাবনা তার সব ভাবনা চিন্তাকে ছাড়িয়ে সদা-সর্বদা যন্ত্রণা দেয়। কাঁটার মতো বেঁধে। বার বারই তার মনে হয় সব যেন কেমন নষ্ট হয়ে গেল, নষ্ট হতে বসেছে। মা-বাবা ভাই-বোন নিয়ে অতনুর জীবনে আনন্দের হাট বসেছিল। সকলেই কেমন আপন আপন অনুভবে সমৃদ্ধ ছিল। পড়াশুনো শেষ করে নিজে একটা চাকরি পেয়ে গেল। যোগ্যতা অনুযায়ী এবং চাকরির বাজার দেখেশুনে তার এবং তাদের সকলেরই তো মনে হয়েছিল বেশ ভালই হল। একটাই যা দোষ, বদলীর চাকরি। তা তাকেও তো সবাই খুশি মনে মেনে নিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বদলী হবে। সবাই কেমন বেড়াতে পাবে! ছোট ভাইটিও পড়াশুনোয় খারাপ নয়। দু'চার বছরের মধ্যে তারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বাবা অবসর নিয়েছেন! বরাবর বাংলাদেশের বাইরে থেকে থেকে প্রবাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই বাড়িও করে ফেললেন বিহারের সেই শহরে যেখানে সারাজীবন কেটেছে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাই লখনৌবাসী। আছে আরও একটি অবিবাহিতা। গ্রাজুয়েট হয়ে গেছে। দেখে শুনে দিলেই হয়। অনাবিল সুখের সংসারে মায়ের মনে একটু অভাব বোধ যেন তির তির করে বয়ে চলে। অতনু বুঝতে পারে। মা ঘরে

বৌ আনতে চান। অতনু মত দিয়ে দেয়। স্বখাত সলিল ?

আজ কাল সন্ধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে রাতের নির্জনতায় প্রবেশ করে। অতনুর চোখে ঘুম আসে না। অন্ধকারে নিরুদ্দেশ দৃষ্টিকে অতীতমুখী করে তোলে। কেন এমন হল ? এমনটি তো হবার কথা ছিল না ! সে কি মা-বাবা ভাই-বোন থেকে বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ? তাঁদের চোখে-মুখে কথায়-বার্তায় সব হারানোর অসহায়তা কেন নীরব-সরব ভাষা পায় ? কেন তার স্ত্রী সরলা অসহায় বোধ করে, মনের সামঞ্জস্য হারায়, অসহায়তার জ্বালায় মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ? কেনই বা তার সদাশয় শ্বশুর মশাই তাঁর মেয়ের জন্যে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ দমন করতে পারেন না ? কেন সে নিজে জীবনে, সংসারে এবং পরিবারে স্বস্তি খুঁজে পায় না ?

এমতো হাজারো 'কেন কেন'-র দংশন অতনুকে আজকাল কেন শয়নে-জাগরণে ঘিরে রাখে তা সে নিজেই বুঝে ওঠে না। বার বার সে অতীত ঘেঁটে ঘেঁটে সূত্র খুঁজতে অনুসন্ধান করেছে। সঠিক কোন কারণ সে খুঁজেও পায় নি। অথচ কারণ বা যন্ত্রণার উৎসটি খুঁজে না পেলে সে স্বস্তিও যে পাচ্ছে না। একটা সুখী জীবন যাপন করার জন্যে মধ্যবিত্ত সংসারে যা যা থাকার কথা তা সবই তো তার আছে। তবে ?

আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে পর্বে পর্বে আনন্দের হাটে মালা-চন্দনে শোভিত হয়ে সকলের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছার ধারাবর্ষণে স্নাত হয়েই তো তারা দু'জনে যাত্রা শুরু করেছিল। অতনু আর সরলা, তাদের দ্বৈত জীবনের অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু-তে যাত্রা শুরু করেছিল। অতনু স্ত্রী চেয়েছিল, জীবনসঙ্গিনী চেয়েছিল। আর কি কি চেয়েছিল ? অতনুর নিজের কাছেই বোধহয় সেই চাওয়ার তালিকা বেশ পরিষ্কার ছিল না। পরিবারের সকলে সরলাকে ভালবাসবে, স্নেহ করবে, কাছে টেনে নেবে। বোধহয় এ-সবই সে মনে মনে চেয়ে ছিল। চেয়েছিল, যে অপরিচিতা মেয়েটি তাদের ঘরে আসবে তাকে ঘরের সকলেও তেমনি ভালবাসা দিয়ে, আদরে-যত্নে আপন করে নেবে। হয়তো সরলাও এমনি অনেক কিছুই চেয়েছিল, আশা করেছিল, কল্পনার জাল বুনে বুনে তার ভবিষ্যতের জীবনের শত-শত ছবি এঁকে ছিল। তার মা ? তার ভাই-বোনেরা ? তার বাবা ? সকলেই তো নিজ-নিজ অন্তরের চাওয়া

গুলোকে একাগ্র করে পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা করে ছিল? আর এ'তো একটি মাত্র পরিবারের ব্যাপার নয়। সরলার ফেলে আসা জীবন তো একটা পরিবার থেকেই ছিন্ন হয়ে আসা জীবন? তাঁদেরও তো আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা থাকার কথা নয়! এই এতো সব ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা-অভিলাষের জটিল সুতোর টানাপোড়েনে কোথায় যে ছন্দপতন ঘটেছে, কখন যে কোন্ সূত্রে টান্ পড়েছে বা ছিঁড়ে গেছে তা অতনুর জানার উপায় নেই। যখনই ঘটুক, যেখানেই ঘটুক আর যেভাবেই ঘটে থাকুক, অতনুকে অন্তরের অপরিমেয় বেদনায় তা অনুভব করতে হচ্ছে। তাই অতনু এখন ছটফট করছে।

অতনু নিজের পছন্দ-অপছন্দকে মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় নি; বরং মা-বাবার পছন্দকেই স্বীকার করে নিয়েছে। স্ত্রীর গাত্র বর্ণ বিষয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে ছেলেদের যে সাধারণ প্রত্যাশা তাকেও তো অতনু কোনও মূল্য দেয়নি। ছেলের উপর মায়ের যে দাবি সেই দাবি তো পুত্র-বধূর বিষয়েও মায়ের বৈধ দাবি। পুত্রের হাত ধরেই স্ত্রী আসে সংসারে। কিন্তু অতনুর বিশ্বাস মায়ের জন্যেই, পরিবারের জন্যেই, স্ত্রীরা নির্বাচিত-মনোনিত হয়ে থাকে। অনেকবারই সে ভেবেছে ছিন্নসূত্রের উৎসটি কি মায়ের প্রত্যাশা আর স্ত্রীর বিশ্বাসের সংঘাতে ঘটে থাকতে পারে?

শহরের উপকণ্ঠে লালিত পালিত শান্তশ্রী রুচিশীলা সরলাকে পেয়ে অতনুর কোনও ক্ষোভ ছিল না। স্বল্পবাক মৃদুভাষী আত্মমগ্না সরলাকে ঘিরে কোনও সমস্যা যে দানা বেঁধে উঠতে পারে তা অতনু কল্পনাই করে নি। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই অতনু প্রথম টের পেল যে তাদের সংসারের ছন্দে পতন ঘটে গেছে, বেদনার কাঁটা একটা দুটো করে মাথা উঁচু করছে। বিয়ের সময়ে প্রয়োজনীয় ছুটি পায় নি বলে পরে সে সরলাকে নিয়ে বিলম্বিত Honey moon করেছে। বিদেশবিভুঁই-এ ছেলে একা একা কষ্টে পড়তে পারে ভাই-বোনেদের সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন গৃহকর্ত্রী, অতনুর মা। সেই প্রথম অতনু টের পেল সরলার অসন্তোষের মনোকষ্ট। অতনু ভেবে পেল না কি এমন দোষের হয় যদি সমবয়সী বোনেরা সরলাকে বেড়ানোর সময়ে সঙ্গ দিয়ে থাকে? তাছাড়া মায়ের ইচ্ছার একটা মূল্য দেওয়া তো সন্তানদের পক্ষে কোন অন্যায় নয়। মেনে নিলেই তো কষ্টের

আর কারণ থাকে না।

তার পরে যতোবার অতনু বাড়ি এসেছে ততোবারই দেখেছে তার মায়ের আর বোনেদের ভুরি ভুরি নালিশ জমা হয়ে আছে। সরলাকে সে বোঝাতে চেয়েছে, মেনে নিতে বলেছে এবং একদিন ছুটি শেষ করে কাজে চলে গেছে। অনুযোগ অভিযোগ পত্র বেয়ে বেয়ে সেই দূরদেশে পৌঁছেছে। অতনু ক্রমশই সরলার প্রতি বিরূপ হয়েছে। নোতুন সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে না? ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করতে জানলে কি সিদ্ধিলাভ সম্ভব?

অতনুর বদলী হল ভারতের একেবারে পূর্বপ্রান্তে। সেখানে বাসা ঠিক করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেল। মনে মনে বিশ্বাস ছিল একান্তে পেয়ে সরলাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মনোমালিন্যের সব ময়লা ধুয়ে দেবে। মায়ের মনে অনেক ক্ষোভ জমা আছে। এবারে সরলাকে প্রস্তুত করে তবে মায়ের কাছে পাঠাবে তাহলে আর কোনও সমস্যা থাববে না।

ইত্যবসরে সরলা সন্তান সম্ভবা হল। মায়ের পরামর্শে এবং বাবার সম্মতিতে সরলাকে তার পিতৃগৃহে রাখার ব্যবস্থা হল। মা চলে গেলেন পুত্রের 'সংসার' সামলাতে দেশের পূর্বপ্রান্তে অতনুর বাসায়। অতনু জানল তার স্ত্রী কাজের নয়, রান্না-বান্নায় অপটু, গৃহকর্মে রুচিহীন এবং বোনেদের সঙ্গে ব্যবহারে অবিনয়ী। মাকে সে মা বলেই মনে করে না। শ্রদ্ধা-ভক্তির ছিঁটে ফোঁটাও নাকি সরলার মনে-শরীরে নেই। সকাল-বিকেল তথ্যে ঠাসা অতনু বুঝতে পারল সরলা কোনও কর্মেরই নয়।

সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে সরলা পতিগৃহে গেল শাশুড়ীর ভরসায়। সেখানে মর-মর সন্তান কোলে ছুটে এলো আবার পিতৃগৃহে। অতনুকে জানাল যে সে আর বিহারে তাদের বাড়িতে একা একা যাবেনা। অতনুর সঙ্গে অতনুর কাছেই থাকবে। বাধ্য হয়ে অতনু কলকাতার উপকণ্ঠে বাসা ভাড়া নিল। এখন সে কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছে।

অতনু মাকে বোঝে না, চেনেনা তাঁর বেদনার হেতুগুলোকে। অতনু সরলাকে চেনে না, বোঝে না তার বেদনার উৎসগুলো। যখন যার কাছে থাকে তখন তার কথাই তার সত্যি মনে হয়। সে তার বাবার সঙ্গে কথা বলেছে, বোনেদের সঙ্গে কথা বলেছে, আবার জানতে চেয়েছে সরলার কাছে, কেন এমন হচ্ছে? এক এক জনের সত্য অন্য জনের সত্য থেকে আলাদা। এই সত্যের জঙ্গলে অতনু তার সত্যকে খুঁজে পাচ্ছে না। অতনু ছটফট করছে।

॥ সমরদা ॥

সমরদার সঙ্গে কথা বলে বেশ কষ্ট হল। শুনলে সকলেরই কষ্ট হবার কথা। কারণ সমরদার কষ্ট তাঁর একার কাছেই সত্য নয়, সকলের কাছেই তা সত্য। তাঁর কষ্ট তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে, নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে অপরের মূল্যবোধের সংঘাত নিয়ে, আত্মীয় বলে যাদের তিনি নিকট বলে এতোদিন মনে করে এসেছেন তাদের সকলেই নিজ নিজ আত্মার তাগিদে সমরদার আত্মাকে আঘাত দিতে, দ'লে যেতে এখন আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। সমরদা তাই এখন একেবারেই একা একা বোধ দ্বারা বিক্ষত। একাকিত্ব কারো একার বোঝা নয়, সে সকলের জীবনেই এক এক সময়ে অত্যন্ত ভারি হয়ে পাহাড় হয়ে ওঠে। ছ' মাস বাদে সমরদা দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে অবসর নেবেন। তাই জমে ওঠা বোঝার গায়ে এখন গভীর দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাস সমরদাকে মাঝে মাঝেই উদাস করে তোলে।

পেনশন পেপারস্ তৈরি করতে সমরদা আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। দীর্ঘসময় একা একা আমরা দু'জনে একঘরে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক সুখ দুঃখের কথা বলার অলস অবকাশ পেলাম। স্ত্রীর সঙ্গে এখন সমরদার মেরুপ্রভেদ আর লুকোনো কোনও ব্যাপার নয়। চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-অনুভব, চাওয়া-পাওয়া, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য—সব ব্যাপারেই এখন অসীম, অ-প্রতিযোজন-যোগ্য, ফারাক্ দূরপনেয় ব্যবধান তৈরি করেই চলেছে, করেই রেখেছে। অথচ এমন তো ছিল না, এমনটি হবারও কথা ছিল না। প্রথম প্রথম জীবনের উষ্ণতা ওঁদের যথেষ্ট কাছাকাছি রেখেছিল। তার পরে কখন কাছাকাছি থেকে পাশাপাশি হয়েছেন, পাশাপাশি থেকে প্রতিবেশী, প্রতিবেশী থেকে একে অপরের কাছে প্রবাসী হয়ে গেছেন তা পঞ্জিকা ক্যালেন্ডার-এর নির্দেশ মেনে তো আর ঘটে নি। তাই অজান্তেই দু'জনের জীবন দু'দিকে বেঁকে গেছে, এবং একসময়ে বুঝেছেন যে হারিয়ে গিয়েই হারানোর উপলব্ধিকে টের পেয়েছেন। তখন আর পিছন-ফিরে দ্বৈত চলন সম্ভব নয়, বর্তমানগুলো দৈত্যের চেহারা নিয়ে ভয় দেখিয়েছে, ভবিষ্যৎ দানবের মতো অট্টহাসিতে বিব্রত

করে তুলেছে।

"পঞ্চাশোর্ধ্ব অপরাহ্ন জীবনে স্ত্রী বন্ধুও বটে শত্রুও বটে"। সমরদার কথা শুনে হকচকিয়ে গেলাম। যৌবনে স্ত্রী নর্মসহচরী, প্রৌঢ়কালে সংগী-সখী এবং বার্ধক্যে ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড বলেই তো জেনে এসেছি। সমরদার এই বিপরীত উপলব্ধির গভীরে যে বেদনার উৎসটি দেখতে পেলাম তা আমার চিন্তাকে ঝাঁকুনি দিল, অনুভবকে টালমাটাল করে দিল! "সঙ্গী-বন্ধু না থাকাটা একটা অভাব সৃষ্টি করে ঠিকই," সমরদা বললেন, "কিন্তু সেই অভাব শ্রেয় এই জন্যে যে অতীতের সুখ-স্মৃতি স্মরণে আর কল্পনার বুনোটে বিগত জনকে আমরা সৃষ্টি করে নিতে পারি। আনন্দের দিনে সেই অনুপস্থিত জনকে কাছে ডেকে নিয়ে মনে মনে আনন্দের ভাগ দিয়ে তৃপ্তি খুঁজে নিতে পারি, ব্যথা-বেদনার অনুভব মুহূর্তে সেই তাঁকেই পাশে ডেকে এনে, মনোমতো করে, উত্তপ্ত কপালে শীতল করস্পর্শের অনুভবকে জাগ্রত করতে পারি, তাঁর কাল্পনিক নৈকট্যকে সস্নেহ সান্ত্বনার সন্নত উৎস করে বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে শান্তির কাম্য প্রলেপ দিতে পারি। অভাবের মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া আপনজন সকল রুষ্টতা সমস্ত বৈপরীত্যকেও হারিয়ে ফেলেন, যা থাকে, যা থেকে যায়, তা সুখের স্মৃতি, স্নেহের পরশ, প্রাপ্ত নৈকট্যের উষ্ণতা।"

সমরদাকে বাধা দিতে মন চাইল না। সমরদাতো চিন্তার যৌক্তিক পথে সিদ্ধান্তের সন্ধানে এ-সব কথা বলছেন না, অনুভবের হৃদয় নিঙড়ানো বেদনাগুলোকে প্রত্যক্ষ করছিলেন মাত্র। কমল তুলতে গেলে কাঁটা দেখে ক্ষান্ত না হয়ে ফুলকেই বরেণ্য করে তুলতে হয়—এটা বাস্তবের নির্দেশ। কোনও কিছুই তো শুধুই ভাল বা শুধুই খারাপ নয়, সকলের মধ্যে যে রিডিমিং ফিচার আছে—এ বোধও যে সমবদার নেই তা তো নয়। ভাল বা খারাপ তো মানুষের স্ব-ধর্ম নয়, নিজ-নিজ মনের আরোপে আমরা অপরকে পেন্ট করে নেই ভাল-মন্দ বলে। সেই ভালত্ব-মন্দত্বে পেন্টেড ব্যক্তির যতটা দায়, পেইন্টার-এর দায় কি তা থেকে কম?

সমরদার দীর্ঘশ্বাসে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল, "নিজের কথা তো অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা। পরাজয়ের কথা, অক্ষমতার কথা। কিন্তু মনের মতো মানুষ পেলে মনের কথা বলতে ইচ্ছা করে।" চুপ করে তাকিয়ে

রইলাম সমরদার দিকে। বললেন, "মাঝে মাঝে মনে হয় সবই অর্থহীন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এমনকি টাকা পয়সা বাড়ি-ঘর সুনাম-দুর্নাম—সব, সবই। বেঁচে থাকাটাও মাঝে মাঝে কেমন যেন মূল্যহীন-উদ্দেশ্যহীন-বোবা বলে মনে হয়। মনে হয় যা কিছু করেছি জীবনে সবই বোকামি করেছি, ভুল করেছি, বোঝা বাড়িয়েছি।" সমরদা নিজের মধ্যে ডুব দিলেন।

নিস্তব্ধতা ভেঙে বললাম, "দৃষ্টিকে নেতিবাচক অন্ধকারের চশমা দিলে সব কিছুকেই নঞর্থক দেখাবে। আবার ইতিবাচক করে তাকিয়ে দেখুন দেখবেন সবকিছুই স্বাভাবিক ঠেকবে। সমস্যাকে তার জটিলতা থেকে ছাড়িয়ে ইস্যু ভিত্তিক করে আলাদা করুন, দেখবেন সমাধানের সূত্র দেখা দেবে। কোন ব্যক্তিরই অনুভূত কষ্ট যন্ত্রণা মিথ্যা নয়। তার মানে তো এ-নয় যে সেই কষ্ট-যন্ত্রণা তার প্রাপ্য। ইস্যু-কে স্বতন্ত্র করে, তার কেন্দ্র-পরিধি নিশ্চয় করে, দায়-দায়িত্ব-অধিকার-কর্তব্যের বিচার করে, দেখতে হবে সেই সমস্যার সমাধান কার হাতে কতোখানি। প্রকৃতিগতভাবেই আমরা কেউই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের যোগ্যতা-ক্ষমতা নিয়ে জন্মাই নি। তাই যার বা যে সমস্যার সমাধান আমার হাতে নেই, ক্ষমতার মধ্যেও পড়ে না তাকে ইনেভিটেবল, অনিবার্য, বলে মেনে নিতেই হবে। আমাদের নিজ নিজ ক্ষমতার দৈন্য যদি প্রকৃতিজই হয় তাহলে তার জন্যে কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ কোথায়?"

সমরদার চোখ দেখেই বুঝলাম সেই পুরোনো গালটি তিনি অচিরেই আমার প্রতি ছুঁড়ে দেবেন। ফিলজফিক্যাল ইনটেলেকচুয়াল! তাই ওঁকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে ফেললাম!

আমার অনুমান ভুল। বললেন "না তা নয়। ভাবছি, যাঁদের জন্যে সারাজীবন একাগ্র ছিলাম, যাদের সুখ সুবিধার কথা সর্বাগ্রে ভেবেছি এবং যাদের কাছে আমার যাবতীয় মূল্যবোধ, সংগ্রাম আর পরাভবকে সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে তুলে ধরেছি তারা এখন কেমন অনায়াসেই অপরিচিত জনের মতো আমাকে অবজ্ঞা করতে পারে, মূল্যহীন অতীত বলে মনে করতে পারে। স্ত্রী আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন না, ছেলেমেয়েদের আবেগ অনুভবের স্রোতে ভেসে যেতে ভালবাসেন তাঁর নিজের একটা স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করে নিয়ে, আমার প্রবেশ সেখানে অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করে

রেখেছেন। পুত্রের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল তাকে প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নের রাণীর টানে বিপথগামী, স্বল্পে তুষ্ট সে আপাত-সিদ্ধির তোড়ে ভেসে চলেছে। ভবিষ্যতের মূল্যে বর্তমানকে অঞ্জলিবদ্ধ করতে চলেছে। কন্যা ভালমন্দ বোধের বাইরে দ্রুত ছুটে চলেছে আপাত সুন্দরের হাতছানিতে। আমার শুভ-বোধ তাদের মিষ্ট বোধ হয় না, মূল্যবোধের উপদেশ তাদের মনে অশান্তির কারণ হয়। তাৎক্ষণিক যে সর্বদা কাম্য নয়, উদ্দেশ্যের সঙ্গে পথকেও যে সুন্দর হতে হয়, ভোগকে আত্মিক করতে যে ত্যাগের প্রয়োজন তা ওদের মনে আছে বলে মনেই হয় না। প্রতিনিয়ত অধিকার বোধ মার খেতে থাকলে জীবনের অস্তিত্বই মার খায় না কি ?"

সহজেই বুঝলাম সমরদার "আমি'টা আত্মজনেদের হাতে বড় বেশি মার খাচ্ছে। তাই বললাম, "ছেলেমেয়েদের বড় করে দেবার দায় আমাদের। বড় হয়ে গেলে নিজের নিজের জীবন যাপন করার দায়িত্ব ওদের নিজেদের। ওদের স্বাধিকারে বাধা দেওয়া আমাদের অধিকারে পড়ে কি ? ভুল করার অধিকার প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা করেছি ওরা করবে, ওদের সন্তানরাও করবে। এ্যাডভাইসেস্ ফ্রম ওল্ড মেন টু ইয়ং মেন, অ্যাজ টু অল মেন, আর সেল্ডম্ ভ্যালিড, অনাহূত উপদেশ বিরতই করে মাত্র। সন্তানরা বড় হলে মনে মনে অধিকারের এলাকা স্থির করে ফেলে ; ওদের অধিকারের এলাকায় আমাদের প্রবেশ যদি কাঙ্ক্ষিত না হয় তাহলে অভিশাপ দেবার বা অভিশপ্ত মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ থাকে কি ?"

আমার কথায় সমরদা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পারেন নি যে তা তার ঘন ঘন মাথা দোলানোতেই বুঝে গেলাম। এবং তাই থেমেও গেলাম। বললেন, "ক্লাসে পাঠ দিতে বুদ্ধি লাগে, মাথাকে ব্যবহার করাটা সেখানে স্বাভাবিক এবং উচিত। পারিবারিক জীবনে মনের স্থান অনেক বেশি, অন্তরের অনুভবগুলো সদাজাগ্রত উপস্থিত থাকে আর একটু এদিক ওদিক হলেই বেদনা-যন্ত্রণার তন্ত্রীগুলো টন্‌টন্ করে ওঠে। সংসার জীবন রসহীন সিলজিজম নয় সিম্‌বলিজম ও নয় ; সম্পর্কের মনোভূমিতে আশা-প্রত্যাশার সূত্র-বয়নে সংসার জীবন সদাই টেন্স। তাই সেখানে মূল্যহীনতার বোধ একাকিত্বের জন্ম দেয়, একাকিত্ব সেখানে বেদনাবোধের জন্ম দেয় এবং

বেদনাবোধ নেতিবাচক চশমা এঁটে দেয় চোখে। কোনও বিচার-বিবেচনা, বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্ত সেই মানসিকতা থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে কি ?"

সমরদার গভীর বেদনাবোধকে অনুভব করলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম বেদনাবোধ কি সমরদার একার ? সংসারের দৈনন্দিন ঝড়-ঝাপটায় আমরা ক'জনে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ধ'রে রাখতে পারি ? ক'জনে পারি মনের উত্তাল-উদ্বেগকে প্রশমিত করে ধৈর্যে স্থিত হতে ?

———

।। নিনির সমস্যা ।।

নিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, "আমি এখন কি করব বলে দিন !" নিনি অনেকক্ষণই আমাকে তার সমস্যার কথা, কষ্টের কথা বলে চলেছিল। খুবই মন দিয়ে তার সব কথা শুনছিলাম। বেদনাবোধে আমার মনটাও টনটন করছিল। ওকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলাম, "সমস্যার সামনে ভেঙে প'ড় না। মনে জোর রাখ। সন্তানের মুখ চেয়েও তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। চোখের জল ফেলতে হবে বৈকি, তবে নিজের মনের বোঝা হালকা করা ছাড়া চোখের জলের আর কোনও দাম আছে কি ?" নিনি সন্তানকে কোলে রেখে মমতাময়ী হাতে চুল বিলি দিতে দিতে বলেছিল, "আমি যে দুই কুলই হারিয়ে বসে আছি জ্যেঠু ! এখন এই দুধের শিশু নিয়ে আর আমার নিজেকে নিয়ে আমি যে জগৎ অন্ধকার দেখছি ? আমার যে কেউ নেই !" ওকে অন্তরের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখে শুধু সান্ত্বনা নয় কিছুটা শক্তির যোগান দিতেই বলেছিলাম, "তোমার কেউ নেই এটা সত্যি নয়। তোমার তুমি আছ, তোমার শিশুসন্তান আছে এবং সব থেকে বড় কথা তোমাদের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ আছে। শক্তিকে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে নিনি, বাইরের শক্তি যত শক্তিশালীই হোক না কেন ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সমাধানে সেই শক্তি বেশি কাজ দেয় না। অন্তরের জোরটাই আসল। নিজের মধ্যে বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরাটাই সমস্যা সমাধানের পথ।" অসহায়ের মতো বলেছিল, "সে শক্তি যে আমার নেই জ্যেঠু !" বলেছিলাম, 'আছে নিশ্চয়ই আছে। তুমি শুধু তাকে খুঁজে পাচ্ছ না। আবাহন করলেই সে তোমার অন্তরের মধ্যে জেগে উঠবে।" নীরবে সে তার শিশু সন্তানের গায়ে মাথায় স্নেহের করস্পর্শ দিতে দিতে আপন মনের গভীরে যেন হারিয়ে গেল। এক বোঝা উঠতি প্রাণের সমস্যা নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে সেদিন নিনির কাছে বিদায় নিয়েছিলাম একটা বিষাদ যেন ধুপের ধোঁয়ার মতো আমার চেতনাকে আবিষ্ট করে ফেলল।

নিনি আমার মেয়ের বন্ধু। দীর্ঘদিনের আসা যাওয়ায় ওকে অনেকবারই

দেখেছি। চোখেমুখে একটা প্রাণের চঞ্চলতা, চলনে বলনে একটা মিষ্টি পারিবারিক ছাপ। ওকে গড়ে তুলতে প্রকৃতির যা কিছু অমনোযোগ তা যেন ওর গালের তিলটি বসিয়ে সৃষ্টিকর্তা ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন। গভীর দ্যোতনা ভরা বড় বড় দু'টি চোখের তারায় শব্দহীন বার্তা যেন স্থির। প্রথম পরিচয়ের দিন ঝুঁকে প'ড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, "আজ থেকে আপনার দুই মেয়ে হল, সানুর সঙ্গে কখনই আমাকে আলাদা ভাবতে পারবেন না।" আশীর্বাদ করে বলেছিলাম, "ভাবব না, যদি তুমি অর্জনে তোমার পাওনাকে অধিকার করে নিতে পার।"একটু যেন থমকে গেল, ক্ষণমাত্র; তার পর দ্রুত পাশে দাড়ানো সানুর দিকে চোখ বুলিয়েই মিনি তার চোখের তারা দুটি আমার দিকে ফেরালো, আবার নিচু হয়ে প্রণাম করে বলল, "অর্জনে আমি সানুকেই দ্বিতীয় করে দেবো, ব্রত নিলাম!"

পাড়ার ছোট্ট frame থেকে ওরা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ওদের বন্ধুত্বকে ধরে রেখেছিল। বড় ক্যানভাসেও ওরা দু'জনে দু'জনের খুবই কাছে ছিল। সমাজের, বয়সের, মনের এবং চারপাশের শতসহস্র পরিবর্তনকে ওরা যেন বহমান নদীর মতো নিজেদের জীবনস্রোতে সামিল করে চলেছিল: নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ওরা মাঝে মধ্যে আমার ঘরে এসে আমাকে সঙ্গ দিয়ে যায়, প্রকৃতি থেকে বহমান বর্তমানের বাতাসে অবগাহন করায়, আবার মাঝে মধ্যে অকারণ ঝগড়ায় আমার সালিসি চেয়ে বসে।

সরকারী চাকরির দাক্ষিণ্যে চার-পাঁচ বছর বাইরে কাটাতে হল। সেই দূরের শহরে বসেই জেনেছিলাম মিনি প্রেম করে স্বরূপকে বিয়ে করেছে। কলেজ জীবনের প্রথম বর্ষায় ওদের পরিচয়। সেই পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝরাপাতা দিনে পরিচয়ের যৌথবন্ধনে পাড় খুঁজে পেয়েছিল। শুনে ভাল লেগেছিল। সহস্রপদী চলন শেষে যখন সপ্তপদী পরিক্রমণ সামাজিক স্বীকৃতি পায় তখন তা অত্যন্ত আনন্দের হয়েই দেখা দেয়। মিনির প্রতি আমার একটা টান বরাবরই ছিল, সানুর ঘনিষ্ঠতমা বন্ধু বলেও বটে আবার অত্যন্ত ঘরোয়া একটা মধুর মনের অধিকারী বলেও বটে। তাই জ্যেষ্ঠসুলভ আগ্রহে সানুকে প্রশ্ন করেছিলাম, "স্বরূপ ছেলেটি কেমন রে? বিশ্বাসে, মূল্যবোধে, সংবেদনে?"— সানু বলেছিল, "যা যা থাকলে আজকের সমাজ একটি ছেলেকে পাত্র হিসেবে

উত্তম বলে রায় দেবে তার সবই স্বরূপের আছে এবং প্রভূত পরিমাণেই আছে। সুদেহী সুঠাম স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, উজ্জ্বলতর আর্থিক সম্পন্নতা, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি-গাড়ী-ব্যবসায় এবং অত্যন্ত চঞ্চল।" বক্তব্য পেশ করার কায়দায় আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল। ওর উত্তর আমার প্রশ্নের কাছ ঘেঁষেও এলো না। কেন? তাই আবার প্রশ্ন করেছিলাম, "স্বরূপকে তোমার পছন্দ নয়?" সানু আমার প্রশ্নকে এবার পাল্টা প্রশ্নে এড়িয়ে গেল, "আমার পছন্দ-অপছন্দের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?" আর আগে বাড়া সমীচীন নয়, বিশেষ করে আমার কন্যাটি ছেলেদের পুরুষ হিসেবেই ভাবতে চায় পাত্র হিসেবে নয়। নিজের জন্যে তো নয়ই। ওর কেমন যেন একটা বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেছে যে অনেক পুরুষই মানুষ হিসেবে সফল হতে পারে, কিন্তু কোনও পুরুষই বর হিসেবে 'মানুষ' হতে পারে না, 'মালিক' হয়ে ওঠে। সামনেই সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র টের পেয়ে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' নীতিতে নিজের শান্ত কাজে মন দিলাম।

নিজের নানাবিধ ভাবনা-চিন্তা কাজ-কর্ম ঝঞ্ঝাট-সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। নিনির খবর নেওয়ার মতো কোনও ফাঁক-ফোঁকর পাইনি আমার আঁটো সাঁটো প্রবাসী জীবনে। মেয়েটিও দূরে চলে গেছে একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। কিছুদিন হল স্বগৃহে ফিরে এসেছি। অবসর জীবনের পরিকল্পনায় সকাল বিকেল পদচারণাকে সামিল করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। এমনি এক বিকেলে হঠাৎ নিনি আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল। এবং সটান টেনে নিয়ে গেল তার জীবনের মাঝখানে।

এতোদিন পরে এই হঠাৎ দেখার সংবাদে আনন্দের বদলে অনেকখানি কষ্টের অনুভব নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। নিনির সেই অসহায় কান্না, তার অতীত উদ্ঘাটন, স্বরূপের বিশ্বাসঘাতকতা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাবোধের যন্ত্রণা আমার মনটাকে বড়ই অবসন্ন করে দিয়েছিল, নিনি বলেছিল, "চার বছর আমরা একে অপরকে জেনেছি। ক্যাম্পাসে বাগানে গঙ্গার ধারে, সিনেমা হলে। আমরা কল্পনা করেছি, পরিকল্পনা এঁটেছি; রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছি। মা-বাবার অসম্মতিকে সম্মতিতে ঘুরিয়ে দিয়েছি। দু'বছর আমরা স্বচ্ছন্দ থেকেছি। তার পরেই আমার কপাল পুড়ল।" বলেই মিনি চোখের চোয়ানো জল মুছতে আঁচল তুলে নিয়েছিল। ক্ষণকাল সময়ে নিজেকে

সামলে নিয়ে বলেছিল, "একটা সংস্থা ছেড়ে স্বরূপ চাকরি পেল অন্য একটা বেসরকারী নামডাকওয়ালা সংস্থায়। উঁচু পদে যোগ দিল। সন্তান সম্ভবা আমি তখন ক্রমশই নিস্তেজ নিরুপদ্রব জীবন পছন্দ করতে শুরু করেছি। এমনিতেই সন্ধ্যে করে ফিরত স্বরূপ। এখন তা রাতের গভীরতায় ঘটতে লাগল; দেরি করে ফেরাটা স্বরূপের অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেল। এখন আর সে আগের মতো কাছে বসে না, আপন করে ডাক দেয় না। ক্লান্তিতে যেন নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফেরে, আমার নৈকট্য ওর ভাল লাগে না। মনের নৈকট্য যখন আমার সব থেকে বেশি দরকার তখনই দূরত্বটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো।" অনেক কথা এক সঙ্গে বলে একটু থামল নিনি। আমার মনে হল ও যা বলতে চায় তা বলতে ওর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বললাম, "স্বরূপের সঙ্গে তুমি তার এই পরিবর্তন নিয়ে কোন কথা বল নি কেন?" সঙ্গে সঙ্গে নিনি জানাল, "বলেছিলাম। স্বরূপ অফিসের দায়দায়িত্ব আর ঝামেলার কথা বলে এড়িয়ে গেছিল।" একটা দীর্ঘশ্বাস অনেক কষ্টে চেপে নিনি কঠিনতম কথাটি তখন আমাকে জানাল, "স্বরূপ ততদিনে তার অফিসের একটি মেয়েতে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যাগুলো সে তার সঙ্গেই কাটায়। আমি যখন ওকে পরিষ্কার করে ওর ব্যবহারের নির্দয়তার কারণ জানতে চেয়েছিলাম তখনই ও আমাকে আমার ফাঁসির হুকুমটি দিয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার অর্থের কোনও অভাব হবে না, স্থানের অভাব হবে না। তোমার সন্তানের সকল আর্থিক দায় আমি বহন করব। একমাত্র শর্ত তুমি আমার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমি অতীতের জমিতে বন্ধ থাকব না। ভবিষ্যতের জন্যে অন্য কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধব।' স্বরূপের কথা শুনে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার আত্মসম্মান ভীষণ আহত হল। কিন্তু আরও অসম্মান এড়াতে প্রতিবাদ স্পৃহাকে গলা টিপে দমন করলাম।" এবারে আর নিনি তার চোখের জলটুকু মোছার চেষ্টাও করল না।

কিছুক্ষণ, সময় যেন নিথর থেমে রইল আমাদের দু'জনের সামনে। বললাম, "এতোদিনের পরিচয়, প্রেম, একত্র জীবন তোমাদের, তুমি তাকে একটু অন্ততঃ বলে দেখতে পারতে, বোঝানোর চেষ্টা করতে পারতে।" আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিনি বলেছিল, "না জ্যেঠু, সে যদি হবার হ'ত তাহলে আমি তা করতাম। তিল তিল করে যে পরিবর্তন, যে বিপথগামিতার আমি সাক্ষী তার কথা

ভেবেই আমি আমার অপমানের বোঝাকে বাড়াতে চাই নি। প্রেম যদি অপ্রেমের কাছে মার খেতে থাকে তাহলে সেই প্রেমের অবশিষ্টটুকু বাঁচাতেই আমার মন সায় দেয়, অ-প্রেমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সত্য মার খায়, অন্তরাত্মারও ভরাডুবি ঘটে। অন্যকোনও চপল চঞ্চল নারীর প্রতি যদি স্বরূপ আকর্ষণ বোধ করে থাকে, সে যদি দেহস্রোতের টানে ভোগের নদীতে গা ভাসিয়ে দিয়েই থাকে তাহলে আমি তাকে উদ্ধারের কোন্ পথ খুঁজে পাব? আমি তাকে বাধা দিতে গেলে সে আমার মধ্যে সত্যের, প্রেমের, নৈকট্যেব বদলে স্বার্থের সন্ধান পেত, ঈর্ষাকাতর ক্ষুদ্রতাকে খুঁজে পেত। আর তখনই তার সরে যাওয়াটা মনের দিক থেকে সহজতর হত না কি?"

মনে মনে নিনির অনুভবকে সম্মান জানালাম। খট্‌কা লাগল অন্য বিষয়ে। বললামও সে কথা, "স্বরূপের দেওয়া বাসস্থান আর অর্থ সাহায্য কি তোমার আত্মাকে পীড়ন করবে না? প্রেমহীন ভালবাসাহীন এই দান কি অবমাননার মনে হবে না?"

"এখানেই তো আমি প্রতিনিয়ত নিজের কাছে নিজে মার খাচ্ছি। আমার বোধ-বুদ্ধি আমার অন্তরের অনুভবকে কষাঘাত করে চলেছে। আমি আমার স্বাধীন, স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে স্বরূপকে ত্যাগ করে মা-বাবার কাছে চলে যেতে পারি, অথবা নিজে আর্থিক যোগ্যতা খুঁজে ছেলেকে নিয়ে একা বাস করতে পারি। আইনের সাহায্যে ডিভোর্স আদায় করে নির্বিরোধ হতে পারি। এর যে কোনও পথই আমার আমিটাকে সসম্মানে বাঁচার অধিকার দেবে বলে মনে করতে পারি। কিন্তু জ্যেঠু, আমাদের সমাজের সংস্কার আর বিশ্বাসকে তো আমি টলাতে পারব না! মা-বাবার কাছে ফিরে গিয়ে মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসাকে হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি কি? একা-একা বাস করতে গিয়ে তো আমি নিজেকে সমাজের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ আর আকাশচারী শ্যেনদৃষ্টি ভালচার্স-দের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারি না। আর আইনের জটিল পথে সন্তান হারানোর সম্ভাবনাকে সমূহ করে তুলতে পারি না।"

নিনির প্রশ্নগুলো যেন প্রতিটি এক একটি চোখের জলের ফোঁটা হয়ে আমার অন্তরের মাঝখানে ঝরে পড়ছিল। ওর শেষ কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিনি প্রশ্ন করল, "আমি কি করব জ্যেঠু? কি আমার পথ?"

নিনিকে আমি কোনও পথের হদিস দিতে পারি নি।

———

॥ পানকৌড়ি ॥

বয়সের এখন আর কিছু দেবার আছে বলে মনে হয় না। আমাকে নিয়ে সে বোধহয় অনেকদিনই ক্লান্ত বোধ করছে। বিকেলের অনেক অলস সময় তাই টেবিলের বাইরে গিয়ে ছাদের প্রশস্ত দিগন্তে চোখ রাখে। কাছে দূরের সবুজের রেখা ঘন থেকে পাতলা হয়ে হয়ে আকাশের কাছাকাছি ফিস্‌-ফিস্‌ মিলিয়ে যায়। উত্তর দিকের রাস্তাটা এখন সারাদিনই কমবেশি লোকজনের যাতায়াতে জেগে থাকে। আমাদের বাড়ির মধ্যে ছিল একটা পুকুর। কর্মব্যস্ত জীবনে সেই পুকুর অনেকখানিই জায়গা জুড়েছিল। ওকে পরিচ্ছন্ন রাখা, মাছেদের ছোট থেকে বড় করা এবং প্রয়োজনে তাদের টেবিলে আনার ব্যবস্থা। সবই তখন কাজের মধ্যে ছিল। পুকুরের পশ্চিমপ্রান্তে যে ছোট্ট আমগাছটা ছিল সেটিও আমার মতোই এখন বয়সের ভারে ঝুঁকে গেছে। উত্তর পূর্ব কোণে ছিল বাঁশ ঝাড়। অংশ বিশেষ এখনও আছে। বর্ষায় সেই ঝাড়ের ছাতা ফুঁড়ে তরুণ প্রজন্ম সঙ্গিন উঁচিয়ে আকাশে তাদের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে। ভাল লাগে ওদের সেই তরুণ প্রাণের নিষ্পত্র ঋজুতাকে।

সেই পুকুর আর নেই। ভরাট করে বাস্তব প্রয়োজনের জন্যে ব্যবহার্য করে তোলা হয়েছে। তখন অনেক কিছুই ভেবেচিন্তে পুকুর ভরাট করার সিদ্ধান্তটি করা হয়েছিল। তার কোনওটাই ব্যর্থ চিন্তা ছিল না। কিন্তু সেই পরিবর্তনে যে কারও সংসার ভেঙে যাবে, কেউ একাকিত্বের আঘাতে অবশিষ্ট জীবন মর্মদহনে কষ্ট পাবে তা আমাদের ভাবনার বাইরে ছিল।

তাকে দেখেছি অনেকদিন, অনেকবার। কখনও তাকে নিয়ে ভাবি নি। পুকুর ভরাট হবার পরেই, বর্ষার সময়ে, প্রথম যখন সেই পানকৌড়িটাকে প্রথমবার দেখি তখন হাসিই পেয়েছিল। পুকুর নেই, কিন্তু সে ঠিকই হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে তার অতীতের বিচরণ ক্ষেত্রটিকে পরিক্রমা করছে। বর্ষায় জল কোথায়ও দু'ফোঁটা জমে আছে তো সেখানে সে পা ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমরা তখন বলতাম, 'অতীতকে বেচারি ভুলতে পারছে না!' জলের প্রাণীকে জমির উপর চলতে একধরনের কষ্ট নিশ্চয়ই অনুভব করতে হত। তাই বোধহয় ও ঢেউ তুলে তুলে পা ফেলত। আমরা হেসে ফেলতাম।

বলতাম, 'কেন বাবা। জলে চলে গেলেই তো হয়? কঠিন জমির আঘাতে নিজেকে কষ্ট দেওয়া কেন?' এতটুকুই, এর বেশি মনোযোগ ও তখন, সেই আমাদের সমৃদ্ধ সময়ে আশা করতেই পারত না।

এখন মনে হয় ওই পানকৌড়িটা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ও এখনও আসে, সেই দুলে দুলে শক্ত মাটির উপর দিয়ে হাঁটে আর জলের তরল নৈকট্য পেলে বুকটা ভিজিয়ে নেয়, অতীতের স্মরণে বোধহয় নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলে। ওর দৃষ্টিতে এখন যেন একটা অসহায় অভিযোগ দেখতে পাই; কেন আমাকে গৃহহীন করলে? ঝোপের পাশে নিজের শরীরটা আংশিক লুকিয়ে রেখে ও যেন একদৃষ্টে ওর গভীর কালো চোখদুটি আমার জন্যে খুলে রাখে। সেখানে জ্বলজ্বল করে একটাই প্রশ্ন: অতীত কি ভোলা যায়?

সত্যিই তো। অতীত কি ভোলা যায়? সেদিন, যেদিনের কথা বলছি, সেদিন আবার সেই পানকৌড়িকে দেখলাম অতীতের মাটি-ভরাট বর্তমানে। ইতি-উতি দুলে দুলে অর্থহীন চরে বেড়াচ্ছে। ও কি কল্পনায় সাঁতার কাটছে? জল না পেয়ে স্মৃতির পুকুরে ডুব দিচ্ছে? আমার পদচারণা বন্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের আবেগে। একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে রইলাম। রাস্তার চলাচল, গাছের সবুজ আর আকাশের উপস্থিতিতে ভাসা ভাসা মেঘ —সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। দু'পা এগিয়ে এসে সদ্য বৃষ্টিজলে ভরে থাকা একটুকরো গর্তের গভীরে বুক ডুবিয়ে দিয়ে আমাকেই যেন লক্ষ্য করল। যেন বলতে চাইল 'এতোদিনে তোমার সময় হল আমাকে দেখার, আমাকে বোঝার, আমাকে নিয়ে ভাবার?'

আমার মন চলে গেল আমার অতীতে। ভুলতে পারি নি সেই বর্ষার আদিগন্ত জলরাশি, সবুজ ধানের বৃষ্টিস্নান, আকাশের সীমাহীন নীল প্রসার আর দূরে দূরে বলয়ে বলয়ে ছড়িয়ে থাকা ডুবু ডুবু গ্রামগুলো। বাড়ির পুকুরে আর প্রান্তরের সাগরে একাকার হয়ে যাওয়া সেই মহাসাগর যেন এখন স্মৃতির দ্বারে ঢেউ হয়ে হয়ে ওঠানামা করে। কল্লোলিত জল-কণ্ঠে ধ্বনিত করে, অস্তিত্বের একেবারে গভীরে, শৈশবের কলকণ্ঠ, তারুণ্যের উদ্দাম প্রাণবন্ততা। এমন তো এখন প্রায়ই ঘটে; অতীতের দৃশ্যপটে অবগাহন। আবার বিরস বর্তমান সরস, অর্থবহ মনে হয়। মনে হয় ফিরে যাই সেই অতীতে, সেই গ্রামের সজল-সরস আদিগন্ত শান্তিতে। এখন তো কোনও কাজ

নেই, পাওয়ার মতো কোনও লক্ষ্য নেই, এগিয়ে যাবার মতো কোনও উদ্দেশ্য নেই। অলস অপরাহ্ণে তাই চঞ্চল ঊষার টান যেন বাঁশির সুরের মতো মিষ্টি মনে হয়। পানকৌড়ির কি মন আছে? চঞ্চল-তরুণ সকালের ডাক আছে? বর্তমানের আলস্যের চাইতেও কি ওর অতীতের ডুব-ডুব জল-জীবনের আকাঙ্ক্ষা ওকে বেশি করে টানছে?

ওর কথা যেন আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম ঃ আর সকলে যা খুশি বলুক, তুমি অন্তত আমার বর্তমান নিয়ে আমাকে আঘাত ক'র না। তখন তোমাদের পুকুরে কচুরিপানারা বাঁশঝাড়ের ছায়া ঘেরা পাড়ের ধার থেকে গাঢ় সবুজ কার্পেটের মতো এগিয়ে যেতো সূর্যের সঙ্গে মিতালি করতে মাঝ পুকুরে। গভীর জলের প্রাণস্পর্শে আর তপন তাপের উষ্ণ ছোঁয়ায় সেই পানারা যৌবনের বন্দনায় হৃষ্ট-চিত্ত আমাদের হাতছানি দিত। সেই তখন তুমি কচুরিপানাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে এসে আমাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে যেতে। মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই সব দিনের লুকোচুরি খেলা? পানা ছেড়ে তুমি আমাদের নিয়ে পড়তে। আমি লুকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পানার আড়ালে লুকিয়ে পড়তাম' তুমি জলের তলায় ডুব দিয়ে আমাকে ধরার জন্যে ডুবসাঁতারে এগিয়ে আসতে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে তোমার গতিপথ বলে দিত। তখনও তুমি জলের তলায়, আর আমি টুক্ করে আমার পাখায় ভর করে আকাশের উজ্জ্বলতায় ভেসে পুকুরের মাঝখানে সরে যেতাম। তুমি আমাকে ধরতে পারতে না। তোমার জেদ বেড়ে যেতো। তুমি তখন আমার মতোই জল তোলপাড় করে আমার পিছনে ছুটতে। মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা?'

বললাম, 'কেন মনে পড়বে না? বেশ মনে পড়ে। মা আমাকে বকতেন, অসুখ করবে বলে উঠে পড়তে বলতেন। ভাইরা পাড়ে দাঁড়িয়ে পানা পরিষ্কার করতে করতে হাসতো প্রাণভরে আর হাততালি দিত। তুমি যাতে পানার মধ্যে লুকিয়ে না পড়তে পার তার জন্যে ওরা ধারে ধারে ছুটে বেড়াতো। আমার পানা তোলা মাথায় উঠে যেতো; তোমাকে নিয়ে তোলপাড় করে ফেলতাম পুকুরের জল। মনে নেই আবার?'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পায়ে-পাখায় ছোট্ট একটা ঝটকা দিয়ে সে আম গাছটার ওদিকে সরে গেল। খানিকটা জল সেখানে জমে আছে।

তারই মধ্যে পা দুটো ডুবিয়ে দিল। শরীরটাকে ধীরে ধীরে জলের স্পর্শে এনে বলল, 'তোমার অতীতকে তুমি কল্পনায় পাও, স্মৃতির সুতো ধরে সেই গ্রাম্য-পরিবেশে তুমি অবগাহন করে মনের শীতলতা খুঁজে পাও। সেখানে যাবার জন্যে তোমার মন-কেমন-করা অনুভবকে তুমি বিষন্ন একাকিত্বে অত্যন্ত সংগোপনে নাড়াচাড়া কর। পাসপোর্টের ঝামেলা আছে, ট্রেন-স্টিমারের ধকল আছে, অর্থব্যয়ের দুশ্চিন্তা আছে। আর এই আমাকে দেখ। আমি শুধু কল্পনায় নয়, বাস্তবেই আমার অতীতের স্থানটিতে আসতে পারি, এসে থাকি। তোমরা সবাই মিলে আমার অতীতকে মুছে দিয়েছো। সে তোমাদের স্বার্থে ; বাস্তববুদ্ধির চাপে। আমার কাছে আমার অতীত কাছের, আমার অতীত মাত্র ক'এক ফুট নিচে, মাটির তলায়। হারিয়ে গিয়েও সে আমার চেতনায় সদাই জাগ্রত আছে। তাই আমার ঝামেলা নেই, ধকল নেই, দুশ্চিন্তা নেই। আমার জন্যে স্মৃতি সহায়ক সেই বাঁশঝাড়টি রয়েছে। সবটা না হলেও কিছুটা যে আছে সেই তো আমার অনেকটা। সে আমাকে চেনে, আগের মতোই ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়, ভালবাসে। আছে সেই তরুণ আমগাছ। যদিও এখন সে বয়সের ভারে তোমার মতোই ঝড়ে ঝাঁপটায় অসহায়। সে আমাকে তার শান্ত সবুজ দৃষ্টিপাতে আবাহন করে, সঙ্গ দেয়, তৃপ্ত করে।

পানকৌড়ির কথা শুনতে শুনতে আমার যেন কেন বেশ কণ্ঠ হতে লাগল। তাইতো ? যদি সত্যি সত্যিই সেই আমার অতীত গ্রামের বহু মেলামেশার স্থানটিতে কখনও কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবে উপস্থিত হতে পারি তাহলে কি ওর মতো সেই মাটির রাস্তাটি আমাকে চিনবে ? সেই নদী কি আমাকে তার কল হাস্যে অভ্যর্থনা জানাবে ? সেই মাঠ, ঘাট, প্রান্তর কি আমার মনে অতীতের মধুর-নৈকট্য প্রস্রবণের মতো ছড়িয়ে দেবে ? সেই সব অতিপরিচিত স্মৃতি-বিজড়িত, মন-তোলপাড়-করা টুকরো টুকরো অতীত কি এখনও তেমনিই অপেক্ষা করে থাকবে আমার জন্যে ? স্বার্থের তাড়নায়, বাস্তবের প্রয়োজনে যদি তারা হারিয়ে গিয়ে থাকে ? যদি তাদের সজল শ্যামল প্রকৃতিকে আধুনিকতার অত্যাচারে দলিত-পেষিত-পরিবর্তিত করে দিয়ে থাকে ? একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে পানকৌড়ির দিকে প্রীতির আর ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকালাম। ও বেশ ভাল আছে ! মনে মনে শতবার এ-কথাটা আউড়ে গেলাম।

'কি ? আমার কথায় ব্যথা পেলে ?' বিক্ষিপ্ত মনকে আবার গুছিয়ে নিয়ে

ওর দিকে তাকালাম। 'তোমাকে ব্যথা দেবার জন্যে বলি নি। বলতে চেয়েছিলাম তোমরা আর আমরা কতো আলাদা। তোমরা সভ্যতার অগ্রগতি আর জীবনের মান ও পরিমাণ বাড়াতে নিজেদের 'অতীতকে ইতিহাস করে ফেল, যাদুঘরের অন্দরে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে ফেল, 'আরকাইভ্সে' বন্দী করে রাখ। তার পরে দীর্ঘশ্বাস ফেল। আর আমরা অতীতকে প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করি, তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বর্তমানকে সত্য করে তুলি। তাই আমাকে দেখে দেখে তুমি যখন মনে মনে মজা পেয়েছো তখন আমি মনে মনে হেসেছি। তখন তুমি সামনের দিকে চোখ রেখে জীবন-সংগ্রামের ধাপগুলো পার হচ্ছিলে অতীত তোমাকে টানেনি তখনও। তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ পরিচয়, জল-জীবন, খেলা-খেলা লুকোচুরি খেলা, আর চোখে-চোখে বন্ধুত্বকে তুমি মনে রাখনি, তোমার মনে রাখার প্রয়োজনই হয় নি। কিন্তু আমি ভুলি নি; আর ভুলিনি বলেই জীবনের আঁচলে গিঁট দিয়ে বার বার এসেছি আর অপেক্ষা করেছি তোমার মনোযোগের, ভালবাসার আর প্রীতিপূর্ণ মমত্ব বোধের। আজ তা আমি এতোদিনে পেলাম। আমার অন্তর আজ পূর্ণ।'

মনে মনে হাত বাড়িয়ে পানকৌড়িকে কাছে পাবার চেষ্টা করলাম। বার বার বললাম, 'তুমি আসবে, তুমি আসবে, তুমি আসবে। আর তোমাকে অবহেলা করব না, তোমাকে নিয়ে হাসবো না। প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো।'

———

॥ দীপালীর নীল সবুজ ॥

শিশু-তরুণ-যুবক-বৃদ্ধদের একটা জনপ্রবাহ ছাড়া আর বিশেষ কিছু দীপালী দেখার সময় পায় নি। ১৯৭১ সালের গৃহছাড়া গ্রাম ছাড়া সেই জনপ্রবাহ ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। সকলেই ভীত-ত্রস্ত-ঊর্ধ্বশ্বাস। পিছনটায় এমন কিছু আছে যা তাড়া করছে, সামনেটায় এমন কিছু আছে যা ভরসা আর আস্থা বয়ে আনবে। দীপালীর দশ বছরের চোখে জীবনের যেটুকু ছাপ পড়েছে তা যেন সব কোথায় মুছে যাচ্ছে, আবছা আবছা বিপন্নবোধের ছোপে আর সম্ভাব্য সংঘর্ষের ছায়ায় সেই চোখে এখন যেন কোন সর্বনাশের অন্ধকার নড়ে-চড়ে বেড়ায়। পরিচিত জনের সংখ্যা তো সেই জনপ্রবাহে বেশি নয়, অপরিচিতের সংখ্যা অবশ করে দেয় দীপালীর কচি মনটিকে। সকলের চোখে-মুখে একটা আতংক, একটা যেন যন্ত্রণা নীরব চিৎকারের মতো বিস্ফারিত হয়ে ফুটে আছে। গ্রামের পটভূমিতে সে শ্মশানের আগুনে পুড়তে থাকা আপনজনের চারপাশে ঘিরে থাকা স্বজনদের দেখেছে। বোঝে নি বিশেষ কিছুই কিন্তু তাদের সকলের চোখে মুখে যে সর্বহারা দৃষ্টি দেখেছে তা যেন এখন, এই জনপ্রবাহ দেখেদেখে, তার মনে বার বারই ভেসে উঠছিল। যার যা সম্বল—বাক্স-প্যাটরা মাদুর-বিছানা কাচ্চা-বাচ্চা—সব নিয়ে সকলেই যেন পালাতে ব্যস্ত। আদুড়-গা ছেলেপুলে, খাটো ধুতি বাক্স মাথায় যুবক, স্বল্পাচ্ছাদিত-দেহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, লাঠি-নির্ভর গামছা-কাঁধে গাঁও-বুড়ো—সকলেই যেন তাড়া খাওয়া প্রাণীর মতো ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটে চলেছে কোন্ এক নিশ্চয়তার আলোয়। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং ক্ষতবিক্ষত।

দীপালী তার মা-বাবা দাদা এবং এক বোনের সঙ্গে দশ বছরের পরিচিত অতীত ছেড়ে, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে, মাঠের সবুজ আকাশের নীল আর জলের অন্তরঙ্গতা ছেড়ে চলে এসেছিল, চিরদিনের জন্যেই ছেড়ে চলে এসেছিল, এমনি এক জনপ্রবাহে ঢেউ-এর মতো। কখনও কোন গাছের নিচে, কখনও বা কোন শূন্য চালার স্বল্প আচ্ছাদনের আড়ালে রাত কাটিয়ে যখন ওরা প্রায় এক বছরের যাযাবর জীবন শেষ করেছে তখনই মাত্র অনেক হচ্ছে-হবের শেষে একটি আস্তানা পেল এক রিফিউজি কলোনিতে। রাজচন্দ্রপুরে। উদ্বর

উঁচু নিচু জমি, আগাছায় কণ্টকাকীর্ণ। যারা ঐ জমিতে ভাগ পেল তাদের দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত হয়ে উঠল বাতাস আর চোখের জলে ধরণী। এই এক বছরে ওদের জীবনে বেড়েছে শূন্যতা, হাহাকার ক্ষুধা আর অসহায়তা, প্রত্যেকেরই, সকলেরই। কিন্তু ওরা হারিয়েছে ওদের বিশ্বাসকে। স্বাস্থ্যকে, ভবিষ্যৎ-কে এবং সম্ভবত ওদের ঈশ্বরকেও। ওদের সর্বহারা পরিবার এই এক বছরে পিতৃহারা নিঃস্বতায় একমাত্র এক অবসন্ন রিক্ততাকেই সম্বল করে নিতে শিখেছে।

পায়ের নিচে একটুকরো মাটি পেয়েই এই তিনটি নারী ও একটি পুরুষ হাতে হাত দিয়ে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে, বাঁচার সংগ্রামে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অপরের কাছে অনুকম্পা-অনুগ্রহ আশা করা, অপরের কৃপা-করুণার অপেক্ষা করা ওদের কাছে অত্যন্ত পীড়ার, বেদনার বলে মনে হয়েছে। তাই ওরা শ্রমের পথকেই বেছে নিয়েছে। অতীত জীবনের ছাপ-ছোপ মুছে দিয়ে কঠিন বর্তমানের ডাকে ওরা সকলেই কোনও না কোনও কাজে লেগে গেল। শ্রমজীবী শ্রমিক। দাদা জনমজুর, মা এবাড়ি-ওবাড়ি বাসনমাজা কাপড়কাচায় ব্যাপৃত, আর দীপালী তার ছোট বোন নীপাকে নিয়ে ঠোঙা বানাতে লেগে গেল। পেটের খাদ্য অঙ্গের আচ্ছাদন আর মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই যেন ওদের দিনরাতের ধ্যান জ্ঞান চেতনা হয়ে ওদের শক্তি যুগিয়ে গেল। সরকারের কৃপণ সাহায্যকেই ওরা ওদের অকৃপণ চেষ্টায় একটা গৃহের চেহারা দিতে পেরেছিল। দু'চার মাসের মধ্যেই ওদের মনে হল যেন ওরা সফল হবে, পেরে যাবে, আর কাউকেই আহুতি দিতে হবে না রাজনীতির আগুনে।

একাদশী কিশোরী দীপালী এখন ভয় থেকে মুক্ত। কাজ করতে করতে এখন মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে যায় তার ফেলে আসা জীবনের প্রশস্ত এলাকায়। গাছপালা আর জলে জঙ্গলে ঘেরা ওর গ্রাম যেন তখন ওকে হাতছানি দেয়, ওদের খড়ের ছাউনির নিচে মাটির দাওয়াটি যেন ওর সঙ্গে কথা চলতে চায়, সামনের একফালি উঠোন, সেই উঠোনের পাশে লাউ-কুমড়োর পুষ্ট-সতেজ গোড়া আর চালার উপর চতুর্দিকে লকলকে হাত বাড়িয়ে যেন ডগাগুলো দীপালীকে আকাশের নীল আর বাতাসের আলাপনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়।

'এই দিদি! হা করে কি ভাবছিস? হাত চালা!' ছোটবোন নীপা

তাড়া দেয়। 'সন্ধ্যের মধ্যেই এক গ্রোস ঠোঙ্গা দোকানীকে দিতে হবে যে! চুপ করে বসে ভাবলে হবে?' দীপালীর ধ্যান ভেঙ্গে যায়। হাত চালায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। কাগজের ভাঁজে আঠা লাগায় আর তার পরেই গোল গোল করে খোল বানিয়ে নীপাকে দিতে থাকে। দীপালী ভাবে কেন এমন হল? কেন মাঠের সবুজ আর প্রশান্ত আকাশের নীলকে ছেড়ে তাদের গৃহছাড়া হতে হল? গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, মাঠে মাঠে ধানের শিষের সঙ্গে বাতাসের গলায় গলায় ভাব, হেলেদুলে খিলখিল হাসি, জঙ্গলের উঁচু জমিতে আর পতিত জমির মাঝমধ্যিখানে গোরু-বাছুরের মচ্ মচ্ করে ঘাস খাওয়া, ল্যাজ নাড়া আর ছোট্ট ছোট্ট বাছুরগুলোর অনাবশ্যক ছুটোছুটি—সব কেন হারিয়ে গেল?

'আর এই এক গোছা কাগজ কেটে দিলাম, এগুলোও আঠা লাগিয়ে গোল করে দে!' নীপা বেশ কড়া মালিক! মাত্র তো দু' বছরের ছোট। কিন্তু কতো সহজেই ও এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে মানিয়ে নিতে চলেছে। দীপালী ভাবে কেন সে তার অতীতকে খুঁজে খুঁজে কষ্ট পায়? কেন সে তার পাঠশালার দিনগুলো ভুলতে পারে না? দুই বিনুনি নাচিয়ে নাচিয়ে পাঠশালার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রজাপতি আর ফড়িং এর পিছু পিছু ছোটা আর শ্লেট বগলে ঘরে ফেরার দিনান্ত ছন্দ কেন তার বার বার মনে হাজিরা দেয়? চোখ দিয়ে একফোঁটা জল গড়াতেই দীপালী সচেতন হয়ে দ্রুত হাত চালাতে থাকে—নীপার চোখে পড়লে রক্ষে নেই। সাত কথা বলবে, শত-কাহন করে লাগাবে। নিজে নিজে শত কষ্ট বয়ে বেড়াতে পারে দীপালী, অন্য কেউ কিছু বললে ওর যেন প্রাণান্ত কষ্ট হয়। সকলেই কাজে তুষ্ট হয়। বেশি ঠোঙার কাজ করতে পারলে নীপা হাসিখুশি থাকে, রান্নাবান্নার কাজটুকু সময় মতো করে রাখলে মা তুষ্ট হয়, আর দাদা তো কাছে গিয়ে দুটো ভাল কথা বললেই তুষ্ট! তাই দীপালী সকলকে তুষ্ট করতে সদাই তৎপর। ওর একমাত্র চাহিদা একটু একা সময়। নিজের মনের মধ্যে ডুব দিতে পারলে ওর আর কোন কষ্টই থাকে না।

দীপালী ডুব দিয়ে দিয়ে অতীতের গ্রামের দিনগুলোকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনে, মাঠে যায় ঘাটে যায়, চালে উঠে লাউ পাড়ে, শ্লেট নিয়ে জমির আল পার হয়ে হালটের ভিতর দিয়ে পাঠশালায় যায়, দল বেঁধে ঝুম দিয়ে নামতা

পড়ে। এই খুঁজে খুঁজে বেড়ানোতে দীপালীর অসীম আনন্দ! হঠাৎ হঠাৎ ও যাকে এড়িয়ে যেতে চায় সেই সব দিনগুলোও হাজির হয়, সেই জনস্রোত, ওর বাবা, বাবার সেই বোবা অসহায় মৃত্যু! দীপালী ডুকরে কেঁদে ওঠে, দম বন্ধ করে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হতে আকাশ খোঁজে, বাতাস খোঁজে। আর সব কিছুর ওপর কেন যেন এক তীব্র অভিমানে মনে মনে আঘাত হানতে চায়। কিন্তু কাকে ও আঘাত দেবে? সেই শক্তিই বা ওর কোথায়? দীপালী হতাশায় যেন মুষড়ে পড়ে।

এই দীপালী ওপাড় থেকে আসা শতশত দীপালীর একজন। একে তাই আমরা সহজেই চিনতে পারি, বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি। কিন্তু যে দীপালী তার জীবনের এ-পাড়ের কুড়িটি বছর আকাশহীন সংগ্রামে আর সবুজহীন প্রান্তরে কাটিয়ে ত্রিশোর্ধ্ব মধ্য পর্বে পৌঁছেছে তাকে জানা এবং বোঝা কি তত সহজ?

দীপালীকে খুঁজে পাই এক আত্মীয়ার মাধ্যমে। আমার সন্তান সম্ভবা কন্যা যখন শ্বশুর বাড়ি থেকে মাতৃহীন পিতৃগৃহে সন্তানের আবাহন পর্বটিকে একান্ত করে পাবার জন্যে এলো তখন একজন সাহায্যকারিনীর প্রয়োজন অনিবার্য হয়েই দেখা দিল। একজন সংবেদনশীলা মহিলার দরকার বলেই আমার সেই আত্মীয়া দীপালীকে সঙ্গে নিয়ে এলো। দীপালী সেদিন একটি কথাও বলেনি, আমরাও তাকে দিয়ে কোনও কথা বলাতে পারিনি। আমার কন্যা এবং আত্মীয়া মিলে যাবতীয় কাজের কথা, দায়-দায়িত্বের কথা, আসা-যাওয়ার সময় নির্ঘণ্টের কথা এবং পছন্দ অপছন্দের কথা সবিস্তারে বলেছিল। দীপালী নির্বাক মেঝে-দৃষ্টি হয়ে সব শুনেছিল। মাইনে-পত্রের কথাও সে কিছুই বলল না। আমি উপস্থিত ছিলাম এবং জানতাম যে দীপালী অন্য এক বাড়ির কাজ ছেড়ে আমার এখানে কাজে লাগবে, যদি লাগে। টাকা-পয়সার বিষয়ে আত্মীয়াটি কোনও কথা বলতে রাজি নয়। তাই আমিই বললাম। এবং যা যা বললাম তা সবই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়ে দীপালী চলে গেল। একটু অবাক হয়েছিলাম। দীপালী কাজে লেগে গেল।

এই আত্মীয়াটির কাছেই পরে আমি দীপালীর কথা শুনেছি। কাছাকাছিই

থাকে আর বয়সেও প্রায় কাছাকাছি। নানাভাবে উপকৃত বলেই নয়, দীপালীর মধ্যে যে একটা অভিমানী মন আছে, একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রাণ আছে তার হদিস একমাত্র এই আত্মীয়াই জানে-বোঝে বলে দীপালী তার খুবই কাছের হয়ে গেছে।

পিতৃহীন অভাবের সংসারে মেয়ে বড় হলে মায়েদের গলায় ভাত আটকায়। তাই প্রথম সুযোগেই দীপালীকে সব না-দেখে-না-শুনেই ওর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। দাদা এবং মা ভাবলো দীপালী পত্রাস্থ হল। দীপালীর ভবিতব্য অলক্ষ্যে হাসল কুটিল হাসি। স্বামীর অন্য এক স্ত্রী ছিলই এবং তার একটি সন্তানও ছিল। মায়ের কথা ভেবে দীপালী নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন-যৌবন এবং প্রেম-ভালবাসার পক্ষতাড়নাকে নির্দয় প্রহারে-পীড়নে অবরুদ্ধ করে রাখল। সে এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজে নিল যে তার ভাগ্য তার কাছ থেকে তার বাল্যের আকাশ ছিঁড়ে নিয়েছে, বিপদের সম্বল বাবাকে কেড়ে নিয়েছে এবং এখন যদি তার বয়সের সবুজকেও ছিনিয়ে নেয় তাতে তার বাধা দেবার কোনও কারণ নেই। দীপালী তাই স্বামীর কাছে শুধু থাকার আর শিশু সন্তানটিকে কাছে পাবার মিনতি করেছিল। দু'বছরের বেশি সে সুযোগ দীপালীর ভাগ্যে জোটে নি কারণ তার সতিন সেই সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিল। দীপালী ফিরে এসেছিল তার মার কাছে। অন্য কারণও ছিল।

দীপালীর বিয়ের এক-বৎসরের মধ্যে দাদা বিয়ে করেছিল। আর তার ছ'মাসের মধ্যে গৃহত্যাগ করে আলাদা হয়ে গেছিল। দাদার চাকরির আশ্রয় থেকে তার মা বঞ্চিত হয়ে এবং বয়সের ভারে আর অতিশ্রমের ফলে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিল। একমাত্র আয় ছোটবোনের ঠোঙা বানানো। অবাঞ্ছিত স্বামীগৃহ ছেড়ে তাই দীপালী মায়ের পাশে এসে দাঁড়ানোই ঠিক করে নিল।

আমার আত্মীয়া দীপালীকে অনেক ঘনিষ্ঠ করে জানে। বলেছিল—'ও কোথায়ও বেশি দিন কাজ করতে পারে না ; কেন তা এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। দীপালীকে জিজ্ঞাসা করেও কোন কারণ জানতে পারি নি। ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকে। বেশি চাপাচাপি করে জানতে চাইলে এমন সব কারণ দেখায় যা ওর মতো অভাবী মেয়ের পক্ষে কাজ ছাড়ার জন্যে

জোরালো বলে মনে হয় না। ওকে বোঝা ভার।' মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম কারণ দীপালী ততদিনে আমাদের ঘরের সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। রান্না উত্তম, কাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোনও কাজই বলে বলে করাতে হয় না। এমন কি ওর যেসব কাজ করার তালিকায় আদৌ পড়ে না সে সব কাজও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে করে। আর মেয়ের পিছনে ওর সদা জাগ্রত দৃষ্টি এবং অ্যাডভানস্ স্টেজ-এর বহু সেবা আর বহুতর খিদমত ও হাসি মুখেই করে চলেছিল। কিন্তু যদি হঠাৎ চলে যায়?

কিন্তু দীপালী যায় নি। সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে দীপালীর কাজ অনেক বেড়ে গেল। আমার মেয়ের অনভিজ্ঞ সন্তান-লালনকে পাশে-থেকে, দিনান্ত সঙ্গ দিয়ে আর রাত জেগে জেগে সহজ করে দিল। বেশি কাজের জন্যে ওর মাইনে বাড়িয়ে দিলাম। ভাল-মন্দ এবারেও কিছু বলল না। মেয়ে জানাল—'অত্যন্ত কাজের লোক, খুবই ভাল।' এবং যোগ করল,—'অন্তগুলো টাকা বেশি পাচ্ছে তো, অভাবের সংসারে সে তো কম নয়!'

আমার মনে খটকা লাগল। টাকায় কি এমন সেবা পাওয়া যায়? এমন অন্তর ঢালা কাজ তো অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্য নয়! তাহলে? আমার মনে হল দীপালীর মনের মধ্যে কোথায়ও একটা বিরাট অভাব-বোধ আছে। মনে হল যতদিন সেই অভাববোধ আঘাত না পায়, সেই শূন্যতার সংবেদনশীল তন্ত্রীতে বিরূপতার ছোঁয়া না লাগে ততদিন দীপালী স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু সেটা কি? ভালবাসা? স্নেহসিক্ত স্বীকৃতি? আপন বলে মনে করলে কি দীপালি তার ফেলে আসা আকাশের নীল আর সবুজের ছোঁয়া পায়? দীপালী কি তার সত্যকে জানে?

———

॥ পাবকে কুসুম ॥

প্রথম প্রথম ওকে দেখতাম দাওয়ার উপর কাপড়ের ছাউনি দেওয়া ইজি চেয়ারে অলস গা-ছেড়ে দিয়ে বই মুখে বসে থাকত। কোন দিকে তাকাত না। বুঝতাম উপন্যাস বা ডিটেক্‌টিভ কাহিনী। তখনও নাম জানি না। সবে এসেছে আমাদের পাড়ায়। মাটির দাওয়া, মুলি-বাঁশের বেড়া-ঢাকা বাসস্থান, একটি বেলগাছ, বেশ ঝাঁকড়া এবং উর্বরা, ওদের উঠোনটাকে ছায়া দেয়। ওর মা আছেন, আর আছেন, চেহারার সাদৃশ্যে, তাঁর মেয়ে। দুটি কচি কাঁচা ঘরে-বারান্দায়-উঠোনে সকাল-বিকেল নড়াচড়া করে, দৌড়ঝাঁপ করে। যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে ঐ দুটিই যা ব্যতিক্রমের মতো চঞ্চল ছোঁয়া এনেছে সেই বেলতলার সদ্য পাতা সংসারে।

পরে পরিচয় হয়েছে, এবং সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠও হয়েছে। মৃদুভাষী মহিলা সহজেই স্নেহময়ী। স্বপন তাঁর একমাত্র ছেলে। কোনক্রমে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছে। প্রথিতযশা মামার সৌজন্যে একটি বিশ্বমানের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে গেছে। সমগোত্রীয়দের তুলনায় আগাম প্রতিষ্ঠাও বটে, দ্বিগুণাধিক অর্থকৌলিন্যও সহজপ্রাপ্তির পথ ধরে ঘরে আসছে। বাল্যেই পিতৃহীন স্বপন মায়ের অফুরন্ত স্নেহই শুধু পায় নি, সেই সঙ্গে পেয়েছে সীমাহীন স্বাধীনতা। আর দুই জন দিদির সদাজাগ্রত ভালবাসা। সব মিলিয়ে স্বপন যথেচ্ছ হয়েছে, অনর্জিত প্রাপ্তিকে স্বোপার্জিত অহংকারের আবরণে মুড়ে রেখে ব্যক্তিত্ব প্রকাশে দড় হয়েছে এবং, এখন, ঘরের সকলেই ওকে সমীহ করে বলে, বাইরের সকলের প্রতি একটা চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য দেখাতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্বপন দাম্ভিক।

স্বপনের এই মহিলা-সর্বস্ব সংসারে ওর জেদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দম্ভ সদা সর্বদা ওর মায়ের স্নেহ-সেচনে আর দিদিদের সভয় ভালবাসার স্রোতে অবগাহন করে করে দৃঢ় হয়েছে, যুক্তিহীন অন্ধত্ব পেয়েছে এবং কখনও না-পাওয়ার-যন্ত্রণা না-পেয়ে-পেয়ে উদগ্র হয়ে উঠেছে। বড়রা যখন ভয়ে ভয়ে ছোটদের সব মার সহ্য ক'রে যায় তখন ছোটরাই বড়র মতো মারের হাত পেয়ে যায়। ছোট-বড় ভেদাভেদ, উচিত-অনুচিত বোধ এবং শোভন-শালীনের

সীমারেখা অপ্রাসঙ্গিক বলে স্থির হয়ে যায়। কেন এবং কিভাবে এই অবক্ষয় কাজ করে তাই বলি।

মায়ের ইচ্ছা ঘরে লক্ষ্মীর মতো একটি সুন্দরী পুত্রবধূ আনবেন ; পুত্রের ইচ্ছা তার সামাজিক যোগ্যতা এবং আর্থিক অবস্থান অনুযায়ী একটি শিক্ষিতা, কৃষ্টিসম্পন্না, উজ্জ্বল-উপস্থিতি-সম্ভবা smart স্ত্রী হবে। সে এখন অফিসার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, অর্থের ও সম্মানের উচ্চধাপে অবস্থান করছে। তার party আছে, club আছে, সমপর্যায়ের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে সান্ধ্য যাতায়াত আছে। এবং স্বপন স্থির করেছে যে তার স্ত্রী অবশ্যই চাকুরিজীবী হবে। কেন ? সে কথার সঠিক উত্তর একা-স্বপনই জানে। আমরা অনুমান করতে পারি যে স্বপন অর্থকেই মোক্ষ বলে মনে করে, একার আর্থিক সামর্থে তার চাহিদা মিটবে বলে সে মনে করে না এবং সে চূড়ান্ত ভোগবাদে নাক ঠেকিয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

স্বপন একদিন অতীতের বেড়াকে সরিয়ে দিয়ে অট্টালিকায় আশ্বস্ত হল। এবং বিয়ে করবে বলে মনস্থ করল।

আত্মীয়-স্বজন-পরিচিত জনের সকল খোঁজ খবর একের পর বাতিল হয়ে যেতে লাগল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বহু সম্ভাবনার উৎস খুলে দিল। ছবির পর ছবি নাকচ হয়ে গেল। সব ঝাড়াই বাছাই পর্বের শেষে স্বপনের হাতে চূড়ান্ত সমাধি ঘটতে ঘটতে মাত্র দু'খানা টিকে রইল। তসরের শাড়ী পড়ে মা, আর বেনারসী পরিহিতা দিদি তুলনামূলক যথাবিহিত বিবরণ দিলে স্যুটেড-বুটেড স্বপন গেল নির্বাচনকে মনোনয়নে পাকা করে আসতে।

আমরা বলি অনেক ধুম-ধাম করে বিয়ে হয় ; বিয়ের পরে যে কতো শতো ধুম-ধাম ধুপ-ধাপ অনেক স্ত্রীর পিঠ-ভাগ্যে জমা হতে থাকে তা সানাই-দিনে জানা যায় কি ? যদি জানা যেতো তাহলে অনেকের মতোই স্বপনের বিদূষী স্ত্রীও তার ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে পারত।

স্বপনের তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে তার স্ত্রী সবকিছুরই যোগান দিতে পেরেছিল—সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠিত ছেনি-ছাঁটা দেহ-গঠন, গোলাপবর্ণনিন্দিত গাত্রবর্ণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত ছাপ এবং সর্বজনবিদিত প্রতিষ্ঠানের সুপুষ্ট মাসমাইনের নিশ্চিত প্রাপ্তিযোগ। স্বপনের মা দিদিরা যা চেয়েছিলেন তাও সফল হল—লক্ষ্মীশ্রী, ধীর গতি চলন, বিনীত শান্ত বাচনভঙ্গি। এঁদের

সকলের তালিকায় যা যা ছিল তা এঁরা মিলিয়ে নিলেন ; কোনও তালিকায় যা ছিল না তা এসে গেল কিনা তা দেখে নিলেন কি ? দায়িত্ব বোধ, সচেতনতা মূল্যবোধ ?

মেয়েটির (তখন যে স্বপনের স্ত্রী), জীবনে শনি প্রবেশ করল সেই সব অনাকাঙ্ক্ষিত গুণ-পথেই। সব পুরুষই বোধহয় স্ত্রীতে মস্তিষ্ক-উপস্থিতি বেশ পছন্দ করে না, কেউ কেউ ডিকার্টিকেটেড স্ত্রীই পছন্দ করে। স্বপন এই বিশিষ্ট দলের মধ্যে পড়ে। স্ত্রীদের সব দায়িত্ব বোধ, সকল সচেতনতা, সমস্ত মূল্যবোধই স্বামী কেন্দ্রিক হবার কথা, একেবারে নিঃশেষেই। পিতৃহীন সংসারে জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে মেয়েটি কিন্তু সব বোধবুদ্ধি গোত্রান্তরিত হবার সময়ে স্থানান্তরিত করতে পারল না। মায়ের সংসারের কথা, ছোট-ছোট ভাইবোনেদের লেখাপড়াব কথা তাকে পীড়া দিতে লাগল। স্বামীর সহৃদয় সমর্থন না পেলেও নিমরাজি গোছের 'আচ্ছা, ঠিক আছে'—টুকুকেই পাথেয় করে নিল।

স্বামী-স্ত্রী একই সময়ে অফিসে যায় এবং প্রায় একই সময়ে ফেরে। কিন্তু দু'জনের বাকি দিন এবং জীবন আর কোন মতেই একভাবে কাটে না। স্ত্রীর দিন শুরু হয় স্বামীর যখন 'মধ্যরাত্রি' ; স্বামীর দিন শেষ হয় গল্প উপন্যাস টিভির সামনে বসে-বসে গড়িয়ে-গড়িয়ে, অথবা বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে। স্ত্রীর শেষ হতেই চায় না, সংসারের হাজার-একটা বাঁধনে-টানে। বেসরকারী সংস্থার দায় আর কর্তব্য মেটাতে মাঝে মধ্যে ফিরতে দেরি হয়, দেরি হয় কখনও কখনও কলকাতার যান জটের কারণে, ট্রেনের বিশৃঙ্খলায়। তাছাড়াও আছে আশা প্রত্যাশার সংঘাত সংঘর্ষ। জীবনে মিল এবং স্থিতি আসার আগেই একটি পুত্রসন্তান এসে গেল সংসারে। এবং তার পরে আর একটি। সেটি কন্যাসন্তান।

বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই স্বপন বুঝে গেল সে যা চেয়েছিল সে তা পায় নি। তার মধ্যে দু'বার সন্তান-ধারণ-সময়ের বঞ্চনা বোধে স্বপন কুপিত ক্রুদ্ধ। তার ক্রোধ মাত্রাহীন হয়ে উঠল যখন স্ত্রীর সরু, তীক্ষ্ণ, স্মার্ট তনুশ্রীটি 'মা'-এর বেঢপ দেহে রূপান্তরিত হল। এ-সবই স্বপনের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দোষেই ঘটে থাকবে। দৃষ্টি যত ঘোলা হয় দৃশ্য ততই আবছা হয়ে ওঠে।

স্বামী-স্ত্রী থেকে নারী-পুরুষ, এবং শেষকালে স্বপনের গৃহে সকল অশান্তির প্রতীক হয়ে উঠলো এই নারী।

মতান্তর থেকে মনান্তর, তর্ক থেকে ঝগড়া। ক্রমশই ঘরের চার দেয়াল ছাড়িয়ে স্বপনের অধিকার-ধ্বনি পাশের বাড়ি পৌঁছল, তার পরে যখন চুলের ঝুঁটির নিঃশব্দ প্রক্রিয়া, পৃষ্ঠদেশের সরব কিল ঘুষি লাঠিপেটায় পৌঁছল তখন তা পাড়ার সর্বজনের কর্ণপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সর্বত্রই কানাঘুষা চলে, কারণের অনুসন্ধান চলে, স্ক্যাউডাল ছড়ায়, অতি কথনের জিহ্বা লকলক বাড়ে, যে কোনও গুজবই hot cake এর মতো উৎকর্ণ সমাদর পায়। খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো সত্যকে খুঁজে পাওয়া পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়। কখনও ছেলে মাকে পৃথক করে দেয়, কখনও বা বোনকে ঘর থেকে তাড়াতে চায়। জোয়ারভাঁটার উত্থানপতনে ঘটি বাটি থালা গেলাসের ঝঞ্ঝনার পাশাপাশিই রেডিও টিভির পরিশীলিত সংগীত নাটক বাদ্য ছোট্ট এলাকাটুকুকে তাজা প্রাণবন্ত করে রাখে। এ-রকম এক জোয়ারের সময়ে পাড়ার ছেলেরা মিলে স্বপনকে আক্রমণ করে, সাদা বাংলায়, ধোলাই দেয়। স্ত্রী তখন পিঠের ব্যথায়, মারের চোটে, অর্ধচেতন। তবুও সেই আলুথালু বসন নারীচরিত্র সকলের সামনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বামীকে বাঁচাল। বিবৃত তথ্যের সঙ্গে প্রকৃত সত্যের অমিল বিষয়ে স্বপনকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে যে যার চলে গেল বটে, তবে শাসিয়ে গেল দ্বিতীয়বার ঘটলে মিথ্যার কম্বল স্বপনকে বাঁচাতে পারবে না।

স্বপন তাই শরীরের পথ ছেড়ে দিয়ে মনের রাস্তায় সমাধান খুঁজতে লেগে গেল। ডাক্তার থেকে ডাক্তার করে স্ত্রীকে পাগল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগল। কাজ যা এগুলো অকাজ বাড়ল তার চাইতে বেশি। সমাধানের পথে পা না বাড়িয়ে বিতাড়নের পথ নিল বলে স্বভাব নিন্দুকেরা রটিয়ে দিল যে স্বপনের অন্য কোনও 'সিংহী' আছে, 'বুড়িকে' ত্যাগ করে 'গুড়ির' সন্ধানে সে নাকি লক্ষ্য-স্থির করেছে।

মধ্যবিত্ত ঘরের দুটি সন্তানের জননী এই মহিলা এখন কি করবেন? গৃহে তাঁর স্থান নেই; এটি এখন তাঁর রাত্রির শয়নকক্ষ মাত্র। সন্তানদের প্রতি অসীম মমতা বোধে সিক্ত কিন্তু অধিকারের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। পান থেকে চুন খসলেই গলি বিশেষের অধিবাসিনী বলে সর্বসমক্ষেই ধিকৃত,

এমন কি তরুন বয়স সন্তানদের সামনেই! পাড়াপ্রতিবেশীরা কানে আঙ্গুল দিয়ে সভয়ে দূরে সরে যান, ড্রেনের পাঁকে জড়াতে চান না। যুবকেরা ছি-ছি করে দায় সারে। তাহলে? ধরিত্রীর মতো সনহশীল হলে, নিঃশেষে নিজের ব্যক্তিত্বকে মুছে দিলে কি আলো দেখা দেয়? আলো দেখা দেয় কিনা তা জানি না, তবে পুলিশ যে দেখা দেয় তা সেদিন জানলাম। স্বপন এবং স্বপনের মা এখন পুলিশ থানায়। সমাধানকে অন্বেষণ করতে বাধ্য হয়েই কি? কে বলে দেবে?

———

।। ভগ্ন স্বপ্নে শীলা ।।

শীলা আর সহ্য করতে পারছে না। শীলা পালাতে চায়। নিজের কাছ থেকে, শিবাজীর কাছ থেকে, নিজের ছোট্ট জগৎটুকু থেকে পালাতে চায়। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা দ্বিধা তার পথ রোধ করে চোখ পাকিয়ে তাকে যেন বিদ্ধ করে রেখেছে। শীলা একবার ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে শিবাজীর সঙ্গে, মা-বাবাকে ছেড়ে এসেছে অসীম উত্তেজনায়, ভাই বোনের মুখ চেয়েও নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টায় নি। শীলা নিজের সমাজ থেকেও পালিয়ে এসেছে, তিল তিল করে গড়ে তোলা তার ভবিষ্যৎকেও ত্যাগ করে চলে এসেছে। তাই তার দ্বিধা। পালানোতে তার সন্দেহ, শীলা তাই মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, আর বেশি করে পালানোর কথা ভাবছে। পালানোর কথা ভাবছে বলেই তার অতীত তার পথরোধ করে দাঁড়াতে চাইছে। সমস্যা থেকে একবার পালিয়ে সে সমাধান খুঁজেছিল, সমস্যা তাকে পালাতে দেয় নি, পিছু নিয়েছে। অন্যভাবে অন্যপথে সমস্যা বেড়েই গেছে, গাঢ় হয়ে উঠেছে। সমাধান বলে যাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল তা সমাধান নয়, সমাধান ছিলও না। তাই এখন দ্বিতীয়বার পালানোর কথা ভাবতেই তার ভয় হচ্ছে, দ্বিধা আসছে মনে। সমাধান যদি এ'বারেও তাকে নিরাশ করে ?

একা ঘরের অপরিচ্ছন্ন একটা কোণে অতিক্ষুদ্র একটা জানালার পাশে বসে শীলা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাস মনে দৃষ্টিকে গবাক্ষ-পথে একফালি বাইরের খোঁজে যেন চাতক করে রেখেছিল। স্বল্পালোকে বাইরের ধূসর গলিপথটাকে চোখের যন্ত্রণা মনে করে অতীতের সবুজে পাঠানোর চেষ্টা করল। ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস হয়ে সদানন্দ পিতা, মমতাময়ী জননীর সদাজাগ্রত-স্নেহ-ভালবাসা, দাদার প্রীতিপূর্ণ নৈকট্য আর ছোটবোনের বন্ধু-মিত্র-সখার মতো সদা-সর্বদার মেলামেশা এখনও শীলার স্মরণে এতো বেশি জাগরূক যে তার বর্তমান যেন তাকে কাঁটার খোঁচায় সর্বক্ষণই বেদনাবিধুর করে রাখছে। দাদা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, গৃহমুখী। শীলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিল্পসাধনায় আগ্রহী। দাদার একটু আধটু খেলাধুলায় ঝোঁক আছে, শীলার অতিশয় ঝোঁক সূচী শিল্পে, নৃত্য-গীতে আর গৃহসজ্জায়।

মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা, হলেই বা চার-পাঁচ বছর আগের। দুর্গাপূজার স্থানীয় অনুষ্ঠানে প্রথম ওর stage-এ নামা। সকলের প্রশংসা আর হাততালি যেন এখনও সজীব-স্মৃতি। সকলের অনুরোধে একটা solo দ্বিতীয় দিনেও প্রদর্শনে ও বাধ্য হয়েছিল। পরিচিত জনের অনেকের দৃষ্টিতেই ও পরিবর্তন দেখেছিল। বয়স্করা বাহবা দিয়েছিলেন খোলামনে, সমবয়সীরা কেউ জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কেউ হাত দুটি ধরে। ছোটদের চোখে-মুখে 'শীলাদি-শীলাদি' যেন মধু বর্ষণ করেছিল। নিজের ওর মনে হয়েছিল দুটো পাখনা থাকলে মনের আনন্দকে হয়তো সঠিক এবং সবিস্তারে প্রকাশ করা যেতো। নিজের মনের মধ্যে ময়ূর ময়ূর একটা অনুভব যেন দিনরাত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতো।

শীলার মা বাবা ওকে stage-এ ওঠার অনুমতি দিতে চান নি। বিশেষ করে মায়ের আপত্তিই ছিল প্রবল। পাড়ার আর পাঁচটি মেয়ে ও তাদের ক'একজনের মায়েদের সনির্বন্ধে অনুমতি মিলেছিল। শীলার পক্ষে সে ছিল— এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। শীলার ইচ্ছা বেড়ে গেল, সম্ভাবনায় পালের হাওয়া লাগল। ছড়িয়ে যাওয়া মনকে আবার একাগ্র করে নিতে তার বেশ কিছু সময় চলে গেল।

এমনি এক ময়ূর মন বিকেলে নাচের স্কুল থেকে ফেরার পথে পাড়া প্রবেশের গলি মুখে দুটি হাত করজোড়ে বুকের কাছে তুলে ধরে সে শীলার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। আপনমনে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। শুনতে পেল, "অভিনন্দন শিল্পীর প্রাপ্য। তাই একটি নমস্কার নিবেদন করতে চাই।" এক মুহূর্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেটিকে শীলা বহুবারই দেখেছে কিন্তু স্বতন্ত্র করে চেনে নি। ওর নামও তখন শীলার জানা নেই, জানার কারণও ছিল না। Stage এর কল্যাণে শীলার পরিচিতি যে বেশ দূরত্ব পেয়ে গেছে তা ওর বুঝতে দেরি হয় নি। কিন্তু তা যে পথিমধ্যে কারো করজোড় নমস্কার পর্যন্ত প্রসার পেতে পারে তা সে ভাবে নি।

প্রথম দিন তাকে এড়িয়ে যেতে পারলেও শিবাজীর অধ্যবসায় দীর্ঘদিন শীলাকে এড়িয়ে যেতে দেয় নি। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, "মা বাবার দেওয়া নামেই ব্যক্তির পরিচয় শুরু। সেখানে আমি শিবাজী। বন্ধু-বান্ধবের ডাকে অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া মেলে, সেখানে আমি 'শিবা'। তুমি শিল্পী।

তোমার দৃষ্টিতে আমার পরিচয় হবে তোমার নিজস্ব সৃষ্টি। আগে-ভাগেই জানিয়ে রাখি যে সেখানে আমার কোনও প্রতিবাদ থাকবে না।" সাহস দেখে শীলা অবাক হয়ে গেছিল। দীর্ঘ চাবুকের মতো দেহ, মুখের দিকে তাকালে নাকটাই প্রথম ছবি তোলে চোখে, তার পরই গাত্রবর্ণের পটভূমিতে দাড়ি-গোঁফের সমগ্রতা অধিকতর কালো বলে মনে হয়। সিনেমার হিরোর মত করে অনুকৃত-কেশছাঁট, shampoo পরিচর্যায় যেন উৎফুল্ল।

স্থান, কাল ও aggressiveness বাদ দিতে পারলে শিবাজীকে আর পাঁচটা ছেলে থেকে স্বতন্ত্র করে ভাল লাগার কথা। কিন্তু শীলার গৃহ-লালিত সযত্নে পালিত কুমারী-মন বিদ্রোহে তপ্ত হয়ে ওঠে, "এটা অত্যন্ত অন্যায়। পথে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে বাধা দিতে পারেন না, আমি অসম্মানিত বোধ করছি।" শিবাজী মাথা নত করে অনেকটা যেন stage এর মতো করে বলেছিল, "অপরাধ কবুল করছি। শাস্তি যা দেবে মাথা পেতেই গ্রহণ করব।" শীলার তাতে আরও বেশি খারাপ লেগেছিল। একটি কথাও আর না বলে হন হন করে চলে এসেছিল শিবাজীকে পিছনে ফেলে রেখে।

তারপর দুটি বছর ধরে ধীর লয়ে শুরু করে শিবাজী শীলার নিকটে পৌঁছোনোর সব চেষ্টাই করে চলেছে। স্কুল যাবার পথে, ফেরার সময়ে, নৃত্য অনুশীলনের দিনে অথবা সূচীশিল্পের কারুবিদ্যালয়ে, শিবাজী কখনও আগে আগে, কখনও পিছনে পিছনে কখন দীর্ঘ অপেক্ষাকে একাগ্র করে কাছে থাকার চেষ্টা করেছে। কখনও দুটি চারটি কথা বলেছে কখনও বলেই নি। শীলার ক্রম উদ্ভিন্ন মনে ভয়ের পাশে অপেক্ষা, অস্বস্তির পাশাপাশি একটা ঝিরঝিরে অনুভব শীলাকে যেন বিব্রত করত, উচ্চকিত করত, উদ্বেলিত করে তুলত। শীলা মাকে বলতে ভয় পায়, বাবাকে বলা অসম্ভব। কার কাছে পরামর্শ নেবে? কি করবে শীলা? সব ছেড়ে দেবে? স্কুল, শিল্পনিকেতন, কায়ন্:বন, সব?

শিবাজীকে বুঝিয়ে বললে কেমন হয়? কদিন ভেবে শীলা তাই ঠিক করল। শিবাজী সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তাই এক কথায় 'বুঝতে' রাজি হয়ে শিবাজী বলেছিল, "আমাকে বোঝাতে পারলে তুমি যা চাও আমি তাই করতে প্রস্তুত।" সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল স্থির করে শিবাজী মনের গভীর থেকে একটা শিসকে ঠোঁটে মুখে ধ্বনিময় করে আনন্দকে উপভোগ

করেছিল, প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে তীক্ষ্ন করে অনুভব করতে চেয়েছিল।

সেই যে বোঝা-বুঝির যাত্রা শুরু হল তা পর্বে পর্যায়ে বিভক্ত অসমাপ্ত থেকে থেকে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' উপন্যাসে পৌঁছে গেল। শীলা যখন নিজেকে বুঝতে পারল তখন অনেক রেস্টুরেন্ট, কেবিন, সিনেমাহল পার হয়ে গেছে। শিবাজী যা বোঝাতে-বুঝতে চেয়েছিল তা সফল হয়েছে, শীলা যা বোঝাতে চেয়েছিল তা আর পূর্বস্থানে স্থির ছিল না। অজ্ঞাত-অনিবার্যকে ওরা যেন পায়ের শব্দে আবছা আবছা বুঝতে পারছিল।

শীলার মা বাবার তৎপরতায় শীলার শিক্ষা আর অনুশীলনের জীবনে ছেদ পড়ল, এবং পরে গৃহে বন্দীদশা অনিবার্য হল। ততদিনে শীলার পার্শ্বপরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, কুল পরিবর্তনের পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়ে গোপন চিন্তা চলছে। প্রাণিজগতে pheromone দিক চিহ্ন আঁকে,—মাঠে বৎসকে দুধ দেবার প্রবাদ-সত্য সর্বজনবিদিত। তাই পার্থিব সকল বাধা পার করে এক সন্ধ্যায় শীলা একবস্ত্রে শিবাজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করল। মা-বাবা বিলম্বে করাঘাত হানলেন স্ব স্ব কপালে, অভিভূত ভাই বোন বোবা হয়ে গেল, স্বজন পরিজন চার দিকে ছুটাছুটি করে থেমে গেল !

মার্জার শ্রেণীর মধ্যে সদ্য জাত সন্তানকে নাকি সাতবার পক্ষান্তরে নয়টি প্রাণবিশিষ্ট বলে নয়বার লালন স্থান পরিবর্তন করতে হয়। অন্যথা পিতা মার্জার তাকে খাদ্যহিসেবে হত্যা করে। প্রাণিকুলে শ্রেষ্ঠ এই কুল পরিবর্তনকারীনীকে কতবার পালনস্থান পরিবর্তন করাতে হয়েছিল তা জানা নেই। তবে শীলা প্রতিবাদ করে বলেছিল, "আর না, ঢের হয়েছে !" লুকনোর জন্যে শেষকালে এই বস্তিতে ঘেরাটোপ খুঁজে নিয়েছে শিবাজী। সেও প্রায় বছর ঘুরে গেল।

শরীরের কষ্টকে শীলা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু তার অন্তরাত্মার হনন পর্বকে সে আর কতদিন সহ্য করবে। অতীতকে সে হারিয়ে ফেলেছে, ভবিষ্যতকে সে খুঁজে পায়নি। শিবাজীকে সে চিনেছে একটা চাহিদার নাম বলে, তার মা-বাবাকে সে জেনেছে প্রত্যাখ্যানের নিরেট পাহাড় বলে। শিবাজীর মধ্যে কোনও আলো জ্বলে নি যা তাকে পথ দেখাতে পারে, অতীতের সব আলো সে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে এসেছে। নিজের সম্ভাবনার অপমৃত্যু সে নিজে ডেকে এনেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে ; শীলার জীবন আকাশে আর সকাল এলো না। শীলা তাই পালাতে চায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি ভুল করে ? শীলা কি ভুলের ভয়েই বেঁচে থাকতে পারবে ? সত্যের আকর্ষণ ছাড়া জীবন কি বাঁচা সম্ভব ?

॥ তৃপ্তি বাবু ॥

তৃপ্তিবাবু অবসর নিলেন। বেশ হাসিখুশিই দেখাল। বললেন 'হাড় জুড়োলো'। বলেছিলাম, 'আটান্নোতে তো আপনাকে পঞ্চাশ দেখাচ্ছে। যৌবনাবস্থায় অবসর নিলেন, এখন কি করবেন ?' হেসে বলেছিলেন, 'অনেক কাজ তো করলাম, অনেক টাকা জমালাম, অনেক বন্ধু বান্ধব সংগ্রহ করলাম। এবারে বিশ্রামকে প্রাণ ভরে উপভোগ করব, টাকা-পয়সা হিসেব করে খরচা করব আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর তাস খেলতে বসে ঘড়ির দিকে তাকাব না।' তৃপ্তি বাবু আরও একটা পান মুখে পুরে দিয়ে এমন করে তাকালেন যেন ভোগের শুরুই অবসর জীবনে, যেন বলতে চাইলেন, অনাবিল আনন্দের জন্যে যে অবিচ্ছিন্ন সময় দরকার তা এখন তার হস্তগত। পানের সঙ্গে জরদা না হলে তৃপ্তিবাবুর তৃপ্তি হয় না। কৌটো থেকে এক খাবলা জরদা বাঁ হাতের তেলোয় তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন মুখের পান-জবজবে স্বল্প খোলা হাঁ-এর মধ্যে। তার পরই চোখদুটি একটু কুঞ্চিত করে প্রলম্বিত নিম্ন অধরকে সিক্ত রসের উছলে পড়া থেকে নিরুদ্ধ করে বুড়-বুড়ি কেটে যা বললেন তাকে তরজমা করলে দাঁড়াল, 'তেজী উপভোগ তো তেজী শরীর মনেই সম্ভব।'

তৃপ্তি বাবু রেলে চাকরি করতেন। সারা জীবনই রসস্থ posting পেয়ে এসেছেন। যে চাকরি উনি করতেন তাতে নাকি মরু posting সম্ভবই নয়। তাই প্রথম প্রথম পারিবারিক উচিত-অনুচিত বোধ আর কলেজ জীবনের তীক্ষ্ণ আদর্শউন্মাদনা তৃপ্তিবাবুর জীবনকে অশেষ কষ্ট আর সীমাহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে। কিন্তু দ্রুত প্রতিযোজন ক্ষমতায় তিনি সম্ভাব্য দ্বিখণ্ডিত অস্তিত্বের হাত থেকে মুক্ত হয়ে একলব্য হতে পেরেছিলেন। তৃপ্তি বাবু বলতেন 'যত্র দেশে যদাচার, Rome-এ গিয়ে Roman দের মতো ব্যবহার করাই শ্রেয়।' একটা অত্যন্ত কঠিন মানসিক সমস্যাকে তৃপ্তি বাবু কতো সহজেই সমাধানের পাড় খুঁজে দিয়েছিলেন। প্রবাদবাক্য যদি মানুষের জীবনে কাজেই না লাগে তাহলে সে আর প্রবাদ কেন, প্রসাদ বাক্য হলেই হত ? আর একবার দীক্ষাটুকু গ্রহণ করতে পারলে, গুরু-প্রেমে

ভক্তিতে নিজের সকল ভাসিয়ে দিতে পারলে আর বাধা থাকে না, বিবেকের দংশন থাকে না। যত দিন যায় তত পথ খুলে খুলে যায়। নোতুন নোতুন পথ, নব নব উদ্দীপনা, অনাস্বাদিত পূর্ব তৃপ্তি।

তৃপ্তিবাবু সেই যে মালী হলেন আর কোনও দিনই ফিরে তাকালেন না। রেলের উর্বর ক্ষেত্রে কণ্টকের জ্বালা নেই, তৃপ্তিবাবুর জীবন-জমিতেও নেই বিবেকের দংশন। তাই নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই অর্থ-বহ জীবন পেলেন তৃপ্তিবাবু। অর্থকে বহন করতে ক্লান্তি বোধ করেন নি কখনও, মালা গেঁথে নিজের গলায়, পরিবারের সকলের গলায়-বাহুতে-খোঁপায় গুঁজে দিয়েও তৃপ্তিবাবুর কখনই ফুলের অভাব বোধ হয় নি। দুহাতে খরচা করেও তিনি যা জমিয়ে ফেললেন তা পাহাড় প্রমাণ, স্তূপাকার চেহারা পেয়ে গেল।

গোমুখ থেকে গঙ্গার অবতরণকে ভগীরথ সহস্র সন্তানের জন্যে প্রাণ-দায়িনী করে তুলেছিলেন। রেলের শতমুখ অর্থস্রোতকে তৃপ্তিবাবুরা নিজ নিজ সন্তানের জন্যে প্রাণঘাতিনী করে তুলেছিলেন কিনা তার তথ্য এবং পরিসংখ্যান আমার জানা নেই। তবে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ তিনি জমা করেছিলেন তাতে অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের অধোগতি বিষয়ে না জানলেও এক-পুরুষের জীবনে যে অভিশাপ নেমে এলো তা সকলেরই জানা হয়ে গেল।

ভোগের তাড়নায় আকণ্ঠনিমজ্জিত তৃপ্তিবাবু বিবাহের দুর্ভোগ বিলম্বিত করেছিলেন। স্ত্রী কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে সন্তানধারণকে আদৌ বিলম্বিত করলেন না। একাধিক সন্তান নিয়ে তৃপ্তিবাবুর সংসার দুধেভাতেই নয়, ঝাড়লণ্ঠনের ঝলমলে আর ট্যুইড্ টেরিলিনের আবরণে জর্জেট তসর আর মুর্শিদাবাদীর মোড়কে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে উপভোগকে ভোগের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন। তর তর করে বয়ে যাওয়া সংসার তরীর নিচে তৃপ্তিবাবুর পুত্র সন্তানটিও বয়ে যেতে লাগল। তৃপ্তিবাবু টেরও পেলেন না। অঢেল পুষ্টির কারণে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা মেদবহুল শরীরের মধ্যে তৃপ্তিবাবু সন্তানদের অর্জন-দৈন্যের প্রতি ক্রমশই একটা অধীর-নিষ্ঠুর মনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন। মোটা অর্থের যোগানে একাধিক গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থাও যখন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের স্বাস্থ্য ফেরাতে পারছিল না তখন অতৃপ্তির রোষানলে তৃপ্তিবাবু সন্তানদের কেশাকর্ষণ কর্ণপীড়ন পৃষ্ঠ ধর্ষণকেই সমূহ করে তুলতেন। এই সকল রুদ্র প্রক্রিয়া বুদ্ধির কর্ষণের

পক্ষে কতোটা প্রকৃষ্ট তার বিচার তৃপ্তিবাবুর শত-অর্থ-উৎস-পুষ্ট গোমুখ কর্মজীবন থেকে তিনি জানতে পারেননি। টাকাকেই তিনি অর্জুনের মতো লক্ষ্যবস্তু করেছেন, অর্থোপার্জনই তাঁর মোক্ষ। আর তৃপ্তিবাবু বিশ্বাস করতেন যে টাকার জোর থাকলে সব কিছুকেই সহজলভ্য করে তোলা যায়। অর্থের বৈভব তাঁর আছে বলেই পরাভব তাঁর একেবারেই সয় না।

সন্তানদের শৈশব কৈশোর কেটেছে প্রাচুর্যের মধ্যে। না চাইতেই সব কিছু তাদের মুঠোর মধ্যে এসে যাওয়াটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তরুণ বয়সে আদর্শের বীজ আর মূল্যবোধের অনুভব সরস-সেচন পায়নি, অঢেল সম্পন্নতার বন্যায় তারা ভেসে গেল মাতা-পিতার কল্পতরু উৎসবে। ভোগ ছোঁয়াচে রোগ, সাধনা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভষ্মবিভূতিকায় তপস্যা। তপস্যার ক্ষেত্র উষর পড়ে রইল, ভোগের ব্যাধি মনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অনিরুদ্ধ তারুণ্য তাই যৌবনের জোয়ারে গা ভাসাতে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এবং তখনই তৃপ্তিবাবু অবসর নিলেন। ভোগের সর্ব আয়োজন সম্পূর্ণ করে তিনি আসন পিঁড়ি হয়ে ভোগাসনে বসবেন বলে স্থির করলেন। একতলা ছেলের জন্যে ছেড়ে দিয়ে তিনি গৃহকে দোতলা করলেন নির্বিরোধ উপভোগকে তান্ত্রিকের নিবিষ্টতায় উপলব্ধি করতে। তৃপ্তিবাবু অর্থকে কাজে লাগালেন; তাঁর পুত্রের মতে অর্থের অপচয় হল।

এই পুত্রটি পাঠ্যর চাইতে আড্ডা, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের চাইতে বটতলার চত্বর আর গৃহের নৈকট্যের চাইতে পথপ্রান্তের বন্ধুবর্গের ঘনসান্নিধ্যকে বেশি পছন্দ করে। ফলে পুত্রটির জ্ঞান যতটা পেকেছে বুদ্ধি ততটা ধার পায় নি। syllabus এর প্রশস্ত এলাকা ওর মনে কোনও তথ্যের সংগ্রহ আর তত্ত্বের অবধারণ যোগাতে পারে নি কারণ জীবন শিক্ষকদের মহাজনী প্রথায় ওর মনের store-room-এ সে সবের স্থান সংকুলান হয় নি, পূর্বাহ্নেই ভরভরাট পূর্ণ হয়ে গেছে। দাদা-ism এর সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছেলেটি অতি সহজেই দাদাগিরিতে অভ্যস্ত হয়ে গোঁফ ওঠার আগেই শার্টের 'কলার' ওঠাতে অধিক তৎপরতা দেখিয়েছে। ওর মতে স্কুল কলেজের শিক্ষা কেবল মাত্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে, ট্রামে-বাসে-ট্রেনে অক্ষম কলম পেষা অফিসযাত্রী তৈরি করে আর সংসারে অনটনকে বাড়িয়ে তোলে। অর্থের ওর প্রয়োজন নেই, কারণ

ওর বাবা সে-দিকটা যোগ্যভাবেই সামলে দিয়েছেন ; এবং তাই অনটনের ওর ভয়ই নেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস কলম পেষা দশটা-পাঁচটার জীবন ওর জন্যে ঠিক মানানসই নয় তাই ও স্কুল-কলেজে মার্ক-টাইম করতে রাজি নয়। ওর ক্ষেত্র বিরাট—ভোগের আর দাদাগিরির।

এই দাদাগিরির প্রথম পাঠের practical class তাই ও ঘরের মধ্যেই করে নিল। 'ভোগই মোক্ষ'-ভেবে তৃপ্তিবাবু যে জীবন ফেলে এলেন এবং 'ভোগই জীবন' ভেবে যে অবসর জীবনে পদার্পণ করলেন, দুর্ভোগ এসে প্রথম আঘাত হানল পুত্রের রূপ ধরে। পুত্রের ষোড়ষবর্ষে মিত্র বৎ আচরণের নির্দেশ যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের দুর্ভেদ্য অদূরদর্শিতা প্রমাণ করার জন্যেই বোধহয় পুত্রটি পিতার প্রতি ভৃত্য-বৎ আচরণ করতে উদ্যত হল! অবসর কালে পিতা গৃহে থাকলেও যে বানপ্রস্থ-মন নিয়েই থাকবে এটা ঘোষণা আকারে শুনিয়ে দেওয়া হল তৃপ্তিবাবুকে। অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে কারণ বৃদ্ধের সংগৃহীত অর্থে পুত্রের অধিকার সার্বিক। বয়স হলে পুত্রই সংসারের কর্তা কারণ তার একটা ভবিষ্যৎ থাকে, পিতা বৈতরণী-যাত্রী হিসেবে cheque বই-এ সই করার মালিক মাত্র, কারণ তার কোনও ভবিষ্যৎ থাকে না, থাকার কথাও নয়।

তৃপ্তিবাবুর একটি কন্যাও আছে। সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। বোধহয় সেই জন্যেই, সৌন্দর্যকে ভোগের বিষয় ভেবেই অথবা অন্য কোনও কারণে, সেই মূর্তিতে জ্ঞানের বা শিক্ষার দীপটি জ্বালার ব্যবস্থা তৃপ্তিবাবু করেন নি। সংরক্ষিত অর্থ-সামর্থ্য কন্যার কূল প্রাপ্তিকে নির্বাধ করে দেবে এমন একটা প্রত্যয় হয়তো মনের মধ্যে ছিল। সময় চলে গেলে দেখা গেল মেয়েটির বয়স তাকে দ্যুতিহীন করে পিতৃস্কন্ধ নির্ভর করে রেখেছে।

এখন তৃপ্তিবাবুকে দেখলে দেখা দেই না! তাঁর ভোগ তত্ত্বের উল্টাপুরাণ তাঁকে কষ্টই দেবে মাত্র। আপনি কি দেখা হলে প্রশ্ন করবেন, 'কেমন আছেন ?'—

॥ শ্রাবণীর চাওয়া পাওয়া ॥

শ্রাবণী সারাজীবন ধরে একটা মানুষ খুঁজে পেল না। সারা জীবন বলতে সে অবশ্য তার মধ্য-উত্তীর্ণ ত্রিশোর্ধ্ব জীবনকে বোঝে। অবশিষ্ট যা সামনে পড়ে আছে তাকে আর সে অন্বেষণের জীবন বলে মনে করতে পারে না। মনে করে যে বাকি জীবনটা স্মরণের পথে পদচারণা মাত্র। ভবিষ্যৎটা আর প্রাণের পরশ-পাথর খোঁজার জন্যে তেমন যোগ্য নয়, মনের হাতে কালি-কলম তুলে দিয়ে হিসেবের খাতার অডিট-অ্যাকাউনটিং করার, ডেবিট-ক্রেডিট মেলানোর, প্রশস্ত এলাকা মাত্র। তাই শ্রাবণী এখন মানুষ খোঁজা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে খুঁজতে বসেছে।

স্কুলজীবনে তারুণ্যের ছল-ছলাৎ অনুভব যখন সদ্য প্রবাহী জীবন-নদীর দুই প্রান্তে অভিঘাত সৃষ্টি করে চলেছে তখন সমবয়সী-সহপাঠিনীদের পরনের দুকূলে আর পরাণের দ্বিকূলে সমান ধ্বনি-সুর-ঝংকার তুলেছে। অনেকেই সেই ঊষালগ্নের দ্যুতিময় ধ্বনিময় অনুভবকে দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বলতা বলে মনে করেছে, সময় নেই মনে করে চঞ্চল মনের ছড়ানো-ছিটানো প্রসারকে একাগ্র করে কোথায়ও না কোথায়ও সেই উদগ্র বাসনার আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি-বিন্দু করে স্থির ধরে রেখেছে। শ্রাবণী ঊষাকে তরুণ আলোর প্রথম প্রকাশ বলেই চিনে নিয়েছে। জেনেছে যে আলো চোখ ধাঁধানোর জন্যে নয়, দৃষ্টিকে সাহায্য করার জন্যেই প্রকৃতির দান। অন্য সকলে যখন আলোর বন্যায় নিজেদের সমর্পণ করতে ব্যগ্র হয়ে দিক্-বিদিক্ ভাসমান গতিমান, শ্রাবণী তখন নিজের প্রাণের জমিতে দু'টি পা স্থির রেখে আলোর বন্যাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। সে স্নান করেছে কিন্তু নিজেকে ভেসে যেতে দেয় নি।

ইলা-শীলা-নীলারা চোখে তির্যক দৃষ্টি হেনে বলেছে,—'তুই কী বুড়ী রে!' বলেছে আর পথ-যেতে-যেতে কলকল্লোলে আকাশ-বাতাসকে আলুথালু করে তুলেছে। অকারণ পুলকের হাতছানিতে অমল-বিমল এবং ইন্দ্রজিতেরা আলোর আকর্ষণ অনুভব করে মনে মনে হর্ষ বোধ করেছে। আর আলোর অনুভব তো পতঙ্গের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য!

শ্রাবণী ক্রমশই দূরে সরে এসেছে। নিজেকে সে বুড়ি বলে মনে করে নি, তারুণ্যের কাঁচা বয়সে দাঁড়িয়ে তরতাজা থাকতে চেয়েছে মাত্র। কেমন করে যেন সে নিজের প্রাণের গতি-প্রবাহকে পথের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে শিখেছে। ঊষা যে দিনের শেষ নয়, শুরু মাত্র, নদীর উৎস যে তটিনীর শেষ নয় যাত্রারম্ভ মাত্র তা কেমন একরকম করে শ্রাবণীর মনের গভীরে প্রত্যয়ের মতো স্থির হয়ে গেছে। অনেক পথ, অনেক পথই পার হতে হয় দিনের সূর্য, উৎসের নদী আর মানব সন্তানকে।

স্কুলের শেষ ক'টি বছরে অন্যরা দলবদ্ধ গৃহ-স্কুল যাতায়াতের পথে, অনুষ্ঠানে-প্রাঙ্গণে, সান্ধ্য বিচরণের এলাকা-অনুধ্যানে যখন মানসিক লাটাই-সুতো-ঘুড়ি খেলার তন্ময়তায়—তৎ-ময়তায়—পালক-পালক ভাসমান, তখন শ্রাবণী বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথে মগ্ন। অন্যরা যখন চপল-চরণে অনুভবের কাব্যময়তাকে একান্ত-মুখী (এক-অন্তঃমুখী) হয়ে প্রকাশে-সঞ্চারণে আপ্লুত, শ্রাবণী তখন ভ্রমরের যন্ত্রণা, রাজলক্ষ্মীর বিবশতা আর চারুলতার দ্বন্দ্ব নিয়ে নিবিষ্ট-চিত্ত।

সহ-শিক্ষা কলেজের বাতাবরণে প্রাণে এলো নোতুন প্রসার, নবতর আকাশ। দূর হল নিকট, অনেক নিকট সরে গেল দূরে। হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের দীর্ঘ-ইতিহাস তৈরি হতে হতে আর পার হতে হতে ইলা-শীলা নীলারা কেউ হারিয়ে গেল সুতো কেটে, কেউ ভেসে গেল নিরুদ্দেশের দেশে, আবার কেউ বা থেকে গেল সম্পন্নতর হয়ে। একই জীবন কাহিনীর অনুবৃত্তি ঘটল অমল-বিমল এবং ইন্দ্রজিতদের পথপরিক্রমায়।

চার দেয়ালের মধ্যে পঠন-পাঠন চলে, আলোচনা-বিশ্লেষণ চলে, চলে কাব্য সাহিত্যের, দর্শন-বিজ্ঞানের, অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সমাজনীতির। সকলেই নোট নেয়, অনেকে প্রশ্নতোলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। শ্রাবণী বিষয়কে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, তথ্যের সম্ভার নিয়ে ভাবতে বসে আর তত্ত্বকে প্রত্যক্ষের আলোয় যাচাই করতে থাকে। চার দেয়ালেব বাইরে এই প্রথম শ্রাবণী তার দৃষ্টিকে মুক্ত করে দিতে চায়। ক্লাসজীবনের সঙ্গে কলেজ জীবনের বেশি মিল খুঁজে পায় না। শ্রেণীকক্ষে বাইরের জীবন্ত-জগৎ প্রবেশের পথ পায় না, বাইরের ক্যামপাস জীবনে অধীত জ্ঞানের প্রভাব পড়ে না। একদিকে গুরুগম্ভীর বিদ্যার্থী জীবন

অন্যদিকে হালকা-পলকা কপোত-কপোতী অনুধ্যান। বৈপরীত্য শ্রাবণীকে পীড়া দেয়, সপ্রশ্ন উন্মুখ করে।

অনেক বন্ধু-বান্ধব-বান্ধবী জুটেছে শ্রাবণীর। জুটেছে এবং কেউ কেউ বেশ ঘনিষ্ঠও হয়েছে, সকলের মধ্যেই ও ব্যক্তিটিকে খুঁজতে চেষ্টা করেছে, তারা কি ভাবে, কেন ভাবে। সকলের ভাবনা একরকম নয়, ধারণা একরকম নয়, দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। প্রত্যেকের চাওয়ার ধরন আলাদা, জগৎ আলাদা, প্রত্যাশা আলাদা। কাউকে শ্রাবণী প্রশ্ন করেছে, "তোরা সকলেই সমূহকে নিয়েই মত্ত কেন? দূর তোদের মনে কোনও ছায়া ফেলে না কেন?" অবাক হয়ে তারা শ্রাবণীর প্রশ্নবে প্রতিপ্রশ্নে চেপে ধরেছে, "সমূহই তো বর্তমান, তাকে বাদ দিয়ে কোন্ ভবিষ্যৎ সম্ভব?" কেউ বলেছে, "ছায়ার পেছনে ছোটা আমার ধাতে নেই, বাস্তবেই আমার আগ্রহ!"

কলেজ জীবনে প্রবেশের মুখে মায়ের সাবধানবাণী মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "সহ-শিক্ষা কলেজের মেলামেশায় নিজের সম্বন্ধে যেমন অপরের সম্পর্কেও তেমন সচেতন থাকবে। ভাললাগা আর ভালবাসা এক নয় জীবনে।" মায়ের কাছে শ্রাবণী ব্যাখ্যা চায় নি, চাওয়াটা উচিত হবে না বলেই। অনেক বিচার বিশ্লেষণ করেও সে ঐ ভালবাসা ব্যাপারটা ভালমতো বুঝে উঠতে পারে নি। আপাতত মেনে নিয়েছে যে ভালবাসার অঙ্কুর প্রাণের গভীরে উদ্গম না হলে, আর মনের সেচনে তার পত্র-পল্লব দেখা না দিলে তাকে চেনা যাবে না। ভাললাগাকে সে সহজেই বুঝতে পারে কারণ তা প্রধানতই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। বাবা বলেছিলেন, "প্রত্যেক জীবনেরই একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য যত উচ্চে স্থির রাখা যায়, যত দূরে নিশ্চয় করা হয় ততই উত্তম। কারণ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য আরব্ধ না হলেও অনেক খানিই পাওয়া সম্ভব, অনেকটা দূরত্বই পার হওয়া সম্ভব। সুখ আছে ভূমাতে, সমূহে নয়। প্রাণী জগতে নির্দেশ আলাদা। সমূহই সেখানে মোক্ষের পথ।" বাবার কথা মন দিয়ে শুনেছিল শ্রাবণী। সব বুঝেছিল যে তা জোর করে বলতে পারেনা তবে বাবার উপদেশের গভীর তাৎপর্য তার মনে ধরা পড়েছিল।

মায়ের সাবধানবাণী স্মরণ রেখে সে সকল সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিষয়ে সব সময়েই সচেতন থাকার চেষ্টা করেছে কলেজ জীবনে। বাবার উপদেশ মনে করে সমূহকে ত্যাগ করে ভূমা-র প্রতি নিজের দৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। লক্ষ্যকে

সে অনেক উঁচুতেই স্থির করে নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেও সে তাই অনায়াসেই একটা নির্ঝঞ্ঝাট অতীত নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পেরেছিল। বান্ধবীদের মধ্যে অনেকেই মাধ্যাকর্ষণের টানের মতো অতীতের টানে কক্ষভ্রষ্ট হবার মতো অবস্থায় ছিল। বিয়েয় ব্যাপারে মায়ের আগ্রহ আর অপ্রকাশ থাকে নি। শ্রাবণী তাই তার ঠাকুমার স্মরণ নিয়েছিল। সব শুনে তিনি বলেছিলেন, "একটা আস্ত মানুষ পেলেই বিয়ের কথা ভাববে। তোমরা তো আর আমাদের সময়ে জন্মাও নি যে লাল কাপড়ের পুটুলি করে বিদায় দিলেই হয়ে গেল! আমাদের বেলায় অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতের কোলে ভাসিয়ে দেওয়াটাই ছিল প্রথা। কোনটা মানুষের কোলে জেগে উঠতো, বেশির ভাগই অমানুষের সংসারে।" ঠাকুমার কথা শুনে শ্রাবণী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভেবে ছিল, "এতো পুরোনো লোক হয়েও কেমন অনায়াসে বর্তমান প্রজন্মের কথা বললেন!" ঠাকুমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। সেই থেকে মনে মনে শ্রাবণী মানুষ খুঁজতে লাগল।

পিছন তাকিয়ে শ্রাবণী মনোজের কথা ভাবল। দূর থেকে মনোজকে দু'চার দিন দেখে তার মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। একমুখ দাড়িগোঁফের আড়ালে একটা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কণ্ঠটি তার গভীর এবং দ্যোতনা সমৃদ্ধ। চোখের তারায় অসীমের খেলা। মনোজকে শ্রাবণীর ভাল লেগেছিল তার কারণ মনোজ কবিতা লেখে কিন্তু ললিত-লবঙ্গ-লতা একেবারেই নয়। সুঠাম কাঠামোর উপর হাড়সর্বস্ব তপস্বী চেহারা, যেন দীর্ঘ অনশনে বিভূতিময়। আরও ভাল লেগেছিল নিজের সম্পর্কে অকৃপণ সত্য প্রকাশের সাহসের জন্যে। বলেছিল, "সাধারণ জনের দৃষ্টিতে যত সব আচরণ এবং অভ্যাস দোষের তালিকায় পড়ে, এমন কি জঘন্য চরিত্রগত পদস্খলন বলে চিহ্নিত, তার অনেকগুলিই আমার স্বভাবে ঘর বেঁধে নিশ্চিন্ত বসে গেছে," বলেছিল বেশ দৃঢ় উচ্চারণে এবং বিশেষ-বিশেষ শব্দে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে। শ্রাবণীর বিশ্বাস হয় নি কারণ সে বিশ্বাস করতে চায় নি। নিজের ভিতর থেকে মনোজের প্রতি একটা অপ্রতিরোধ্য টান শ্রাবণী টের পেয়েছিল। মনোজের জীবন-বৃত্তে ঢুকে পড়ে সে প্রথম উপলব্ধি করতে পারল যে ঐ টানটা একটা অন্ধ আবেগ থেকে শক্তির যোগান পাচ্ছে। দূর থেকে, লং

শট-এ নিজেকে এবং মনোজকে দেখতে গিয়ে চেতনার আলোতে জান্তব সত্যটি ধরা পড়ে গেল।

শ্রাবণী তার চোখ কান খোলা রেখেছে। মানুষের সন্ধানে সে সদাসর্বদাই সচেতন থেকেছে নিজে। পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন জীবনে ঈর্ষা-দষ্ট লোক দেখেছে, প্রতিবেশীদের মধ্যে এটা-ওটা নিয়ে স্বার্থের নগ্ন হানাহানি প্রত্যক্ষ করেছে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে লাটাই-ঘুড়ি-সুতো টানা-ছাড়ার মধ্যে ছকবাজির চূড়ান্ত হতে দেখেছে তাই শ্রাবণীর মানুষ চোখে পড়ে নি। স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপকদের মধ্যে ট্যুইশন-এর আর্থিক স্বার্থ আর স্টাফ মিটিং এ হাটে বাজারের ব্যক্তি স্বার্থ নখদন্ত শ্বাপদহিংস্রতা দেখেছে, মানুষ দেখেনি। রাজনীতির ঘোলাজলে নেতারূপ মৎসশিকারীরা দিবারাত্র কোলে ঝোলটানার পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় মশগুল, সমাজের সর্বস্তরে আনআর্নড্ উপস্বত্ব ভোগের জন্যে কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি চলছে, মঠ-মন্দির-মসজিদে পীত-পিঙ্গল-শ্বেত বস্ত্রাবৃত বকেরা 'পরমার্থ-দৃষ্টি' হয়ে চেলা-ভক্ত চামচে খুঁজছে। প্রত্যেকটি লোকই হয় এইরকম না হয় ঐরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-কার্য-লক্ষ্য নির্ভর গজিয়ে উঠছে। একটা গোটা মানুষ কোথায়ও আর বেঁচে-বর্তে থাকছে কি? পুরাকাল হলে বনে-বাদাড়ে অন্বেষণ করলে একআধজন মানুষ মিলতে পারত, কারণ তখন বনবাসের বিধান ছিল। এখন বন উচ্ছেদ হয়ে লোকালয় হয়ে যাচ্ছে, অরণ্য বলতে জনারণ্যই সহজ বোধ্য। জনারণ্যে জন থাকতে পারে, মানুষের থাকা কি আদৌ সম্ভব?

মানুষ খুঁজে না পেয়ে শ্রাবণী নিজেকে খুঁজতে বসেছে। "অন্যসকলে কেউ সঙ্গী খুঁজেছে এবং পেয়েছে, কেউ সঙ্গিনী।" মনে মনে ভাবে শ্রাবণী, "তারা বোধহয় কেউ তার মতো মরীচিকার পিছনে ছোটে নি, কেউ মানুষ খুঁজতে যায় নি।" আজ তার ঠাকুমা আর বেঁচে নেই। শ্রাবণীর পক্ষে তাই আজ আর দ্বিতীয়বার ঠাকুমার পরামর্শের জন্যে, পরামর্শের মূল্যায়নের জন্যে তাঁর কাছে যাবার উপায় নেই।

শ্রাবণী এখন একটা ভাল চাকরি করে, একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। সব থেকেও তার মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই একটা মানুষের আকৃতি শূন্য অন্তরের কক্ষে-প্রকোষ্ঠে যেন ঘুরেঘুরে ওকে উতলা করে তোলে। সকালের একা গৃহস্থালির মধ্যে মধ্যে, দ্বিপ্রহরের কাজের জগতে অবকাশের ফাঁকে

ফোকরে আর বিকেল সন্ধ্যের নিঃসঙ্গ একাকিত্বে অন্তর্মুখীতায় যেন দূর, অতি দূর, থেকে শিশিরবিন্দুর মতো নিঃশব্দে একটাই অভাব শ্রাবণীকে উন্মনা-বিমনা করে তোলে। একটা আস্ত মানুষ খুঁজতে গিয়ে কি সে আদর্শ মানুষেরই খোঁজে এতোটা বেলা পার করে দিল? 'আস্ত মানুষ' বলেছিলেন ঠাকুমা; হঠাৎই যেন শ্রাবণীর মনে একটা বেদনাবোধ অস্তিত্বের গভীর থেকে হৃদয়ের শূন্যতার দিকে এগিয়ে আসতে চাইল: "আমি কি অনির্বচনীয়, অপ্রাপ্যকে অন্বেষণ করতে গিয়ে অভাবকেই আমার আপন করে বসেছি? সবাই যখন কিছু পেয়ে আর অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েও জীবনকে শত দুঃখকষ্টে জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও আঁকড়ে ধরে সাধারণ ভাবে যাপন করতে পারছে, তখন আমি কি শুধু একাই মানুষ খুঁজতে গিয়ে সেই মানুষকেই হারিয়ে বসে আছি?" শ্রাবণীর এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে শ্রাবণীকে?

———

।। প্রলয় রায় ।।

প্রলয় রায় পঁচিশ বছরেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেল। স্বনামধন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। মাইনে ভাল, পরিচ্ছন্ন কাজ। বাড়ির খেয়ে অফিস। বেশ কাছেই। যৌথ নয় কিন্তু বেশ বড় পরিবার। সম্পন্নও। আনন্দের ঢেউ আর উত্তেজনার প্লাবন, সকলকেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। মাস পার হয়ে বছর ঘুরে এলো। প্রলয় নিজেকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিশনস্কুলের কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে স্কুল জীবন পার হয়েছে। শৃঙ্খলা একদিকে প্রলয়ের মধ্যে একটা সফল ছাত্র তৈরি করে দিয়েছে, অন্যদিকে বহু দুর্দমনীয় বাসনা-কামনাকে অবচেতনে স্থানান্তরিত করে ফেলেছে। প্রলয় স্বভাবভীরু। বাসনার স্ফুরণ আছে কিন্তু তাকে প্রকাশ করার শক্তিতে ওর টান্ পড়ে যায়। তাই দ্বন্দ্ব ওর প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে ওকে পীড়া দেয়। প্রলয় জানে কিন্তু উদ্ধারের পথ জানে না। যাকে ও সমাধানের পথ বলে মনে করে তাকে ও অনুসরণ করতে চায়। অনুসরণ অনেকখানি এগিয়ে গেলে ও যেন বুঝতে পারে প্রাপ্তির মধ্যে ওর দ্বন্দ্বের সমাধি ঘটবে না। তাই ও ভয় পায়। ভয় পায় অতীত দ্বন্দ্ব-প্রান্ত বোধহয় ওকে মুক্তি দেবে না। তাই প্রলয় যখন কিছু চায় তখন সেই-কিছুকেই চাই বলে চায় না, অন্যকিছু থেকে পালানোর জন্যে চায়। চাওয়ার মধ্যে ও নিজেকে প্রায়ই খুঁজে পায় না। তাই মাঝপথে ও হারিয়ে যায়।

দু'বছর যেতে না যেতেই ওর মা ওর বিয়ের কথা তুললেন। নিজেকে সঠিক বুঝে উঠতে পারে নি বলে প্রলয় সময় নিল। "এখন বিয়ে নয়, অফিসার হবার জন্য পরীক্ষা দেব। তার পরে।" প্রলয় তৈরি হল, পরীক্ষা দিল এবং অফিসার হ'ল। মা বললেন, "এবারে তাহলে মেয়ে দেখি?" বিয়েটা একটা সমস্যা কিনা তা বোঝার আগেই তিরিশের কোঠায় পা দিয়ে প্রলয় বিয়ে করে নিল।

বিয়ের পরে অপরিচিত এই দুটি প্রাণের মধ্যে মন-দেওয়া-নেওয়া পর্যায়ে প্রলয়ের ভাগে যা সময় ধার্য হ'ত, বড় পরিবার বলে, সংসারের অন্যান্য জনেদের ভাগে স্বভাবতই তার চাইতে বেশি ধার্য হয়ে থাকত। এই অনটনের

সপ্তপদী জীবনে প্রলয়ের প্রাণ মার খেয়ে মার হজম করে চলেছিল। তাই যখন গৃহ-সংসার থেকে দূরে, অনেক দূরে, এক নিভৃত পোস্টিং পেল তখন প্রলয় দ্বিরুক্তি না করে সেই দূরস্থানে পাড়ি দিল। সময়ের কৃপণতাকে সমাধান করতে গিয়ে প্রলয় প্রায় হারিয়েই বসল সময়কে! দ্বৈত জীবনকে একান্ত করে পাবার বাসনায় যে কল্পজগতে ঝাঁপ দিল সেই জগতে সে একাকিত্বকেই নিরেট করে পেয়ে গেল। বিদেশ-বিভূঁই-এ পুত্রবধূকে একা যেতে দিতে মা রাজি নয়। সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে প্রলয় সমস্যাকে বাড়িয়ে নিল। কুণ্ঠিত প্রাপ্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে অকুণ্ঠ অপ্রাপ্তির মরুতে ঘর বাঁধল প্রলয়!

স্বগৃহ থেকে বনবাস, সহবাস থেকে নির্জন বাস প্রলয়ের মনের উপর দাবানলের দাহ ছড়িয়ে দিল। সমাধানের সমূহ সম্ভাবনাটুকুও লোপ পেয়ে গেল যখন প্রলয় জানল যে সে পিতা হতে চলেছে। অনিবার্য বৎসরান্ত বিরহকে সামনে করে প্রলয়ের একাকিত্ব প্রলয়-নাচন শুরু করে দিল। নির্জনতার হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে প্রলয় নির্জনতাকেই সম্পূর্ণ করে পেয়ে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরিতে এমনিই ছুটি-ছাটা কম, তায় অফিসারের দায়-দায়িত্ব। কাজের বোঝা ঘাড়ে করে দিনের বিরাট একটা অংশ কেটে গেলেও অবকাশের বোঝা সারা দিনমান একা-ফাঁকা সময়কে পাহাড়-প্রমাণ ভারি করে তুলতে লাগল! গৃহ-দূরত্ব একদিনের পথ তাই সেই দূরত্বই রবিবারকে শনির দৃষ্টি দিল। চিঠি পত্রে যে বিরহ লাঘব সম্ভব তা প্রলয়ের অভিজ্ঞতায় নেই। আর বিরহই যে প্রলয়ের একমাত্র পীড়া সে বিষয়েও প্রলয় ততটা নিশ্চিত নয়!

এই অনিশ্চয়তার ফাঁক দিয়েই প্রকৃতি প্রলয় ঘটাতে অনুপ্রবেশ করল। কাজের প্রয়োজনে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়, কারো কারো বাড়িতে প্রতিষ্ঠানে যেতেও হয় scheme loan viability-র পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নিকেশ করতে। সেখানে আপ্যায়নের ত্রুটি তো দূরের কথা আধিক্যই তো নিয়ম। এমনি এক অফিশিয়াল কাজের মধ্যেই আপ্যায়ন প্রলয়কে আকৃষ্ট করে তুলল। আপ্যায়ন নৈকট্য-আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হল, নৈকট্য তন্ময়তার জন্ম দিল তন্ময়তা আত্মবিস্মরণের কারণ হয়ে দেখা দিল। শ্যামল প্রলয়ের customer ; বীণা তার একমাত্র বোন। প্রলয়ের দিন-মাসের একা-ফাঁকা সময়ে

এই 'বীণাধ্বনি' তাকে জোয়ারের টানে উন্মনা করে তুলল। দ্বন্দ্ব তাকে বিক্ষত করে চলল।

স্ত্রীকে সে আপন করে পেয়েছে কিন্তু কাছের করে পায় নি। বীণাকে সে কাছের করে পেতে পারে, আপন করে পাওয়ার পথ নেই। স্ত্রীর সঙ্গে তার দুস্তর বিরহ-দূরত্ব পাওয়াটাকেই প্রায় আবছা করে দিয়েছে। বীণার সঙ্গে তার দৈনন্দিন-সম্ভব নৈকট্য মোহময় সম্ভাবনায় সজীব, প্রাণবন্ত। প্রলয় বীণার দিকে ছুটে যেতে চায় কিন্তু অতীত তাকে বাধা দিতে নীরবে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রলয় প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণ কাটানোর মতো দৃঢ়তার যোগান পায় না তার নিজের প্রকৃতির মধ্যে। বিরহের নদীতে ইচ্ছার স্রোত প্রলয়ের জীবনের পাড়কে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে চলেছে। ধ্বংস কি অনিবার্য? ব্যবসায়-সচেতন শ্যামল বীণার তন্ত্রীকে capital করে প্রলয়ের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এখন তিনজনের কারোই আর ফেরার পথ নেই। ধ্বংস অনিবার্য।

সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে একটু ডাঁট করে স্ত্রী যখন গৃহিনী হয়ে প্রলয়ের কাছে এলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রলয় অতীতকে ফিরে পেল কিন্তু ভবিষ্যতকে হারিয়ে ফেলল না কি? যা স্বাভাবিক এবং প্রার্থিত তার জন্যে ধৈর্য এবং অপেক্ষা না থাকলে অস্বাভাবিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়ে যায়। তখন স্বাভাবিকে ফিরে আসাও যেমন কঠিন হয়ে ওঠে, অস্বাভাবিককে ত্যাগ করাও তেমনি অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রলয় এই দ্বন্দ্বময় দ্বি-নারী আকর্ষণের কেন্দ্রে অস্থির।

প্রলয় গৃহের বাতাবরণে শান্ত-সমাহিত সন্তানবৎসল স্ত্রীকে দেখে, তার নিরুদ্বেগ-শীতল মাতৃস্বরূপকে অনুভব করে। স্ত্রীর সব উচ্ছলতা চঞ্চলতা প্রাণপ্রাচুর্য যেন সন্তানের পবিত্র-প্রসারে মোহানার নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে। সেখানে বাৎসল্যের গভীরতা আছে, যৌবনের গতি নেই; স্নেহের শত-তরঙ্গ-ভঙ্গ ঝিকিমিকি আছে, কিন্তু প্রেমের জোয়ার-ভাটার উত্থান-পতন নেই। আর ওদিকে বীণার নৈকট্যে গতি আছে, চলনে-বলনে বৈদ্যুতিক তাপের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, স্পর্শে উষ্ণতার প্রবাহ ঝরনার মতো মুক্তি পায়। প্রলয় তুলনা করে, প্রতিতুলনায় দ্বন্দ্বকে উৎকণ্ঠায় অনুভব করে। দ্বিখণ্ড অস্তিত্বের জ্বলন্ত যন্ত্রণাকে সহনশীল মাত্রা দিতে বিলম্বে গৃহে ফেরে, বীণার

সান্নিধ্যে সমাধান খোঁজে। সমাধানের পথ খুঁজতে প্রলয় সমস্যাকে মনের প্রাঙ্গণ থেকে অন্তরের গভীরে টেনে আনে।

দূরদেশে এক-সন্তান জীবনকে ঘিরে দুটি প্রাণ দু'রকমের স্রোতে ভেসে যায়। প্রলয় বহির্মুখী, প্রকৃতির স্রোতে, আর স্ত্রী অন্তর্মুখী রবীন্দ্রভাবনায় পথ করে নেয়। 'অফিসের কাজে' প্রলয়কে ট্যুরে দু'চার দিনের জন্যে বাইরে কাটাতে হয়; সে ফিরে আসে বিধ্বস্ত-শুষ্ক-নিঃস্ব হ'য়ে। স্ত্রী কাব্য-গান নৃত্যের জগতে আত্মজার সঙ্গে আরও ক'একটি খুদে শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে রবীন্দ্র-ময় জগতের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। এই করে করে যে পথ প্রথম প্রথম দৃশ্যমান দূরত্বের ব্যবধানে ভিন্ন হল, তাই দীর্ঘ অবকাশে অদৃশ্য অনতিক্রমণীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে তুলল।

প্রলয় অনিবার্যকে রোধ করার জোর খুঁজে পেল না। সে হারিয়ে গেল প্রকৃতির টানে রক্তের স্রোতে। হারিয়ে গেল এবং নিজেকে হত্যা করল, হত্যা করল নিজের বিবেককে, নিজের আত্মাকে। গৃহে-পরিবারে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি তার দায়দায়িত্বকে অর্থ দিয়ে পরিমাপ করে নিল, বাকি সব অনায়াস ছেড়ে দিল স্ত্রীর হাতে। নিহত-আত্মা, বিদূরিত-বিবেক দেহ-সর্বস্বতার প্রতীক করে নিজেকে বয়ে বেড়ালো বীণা-বৃত্তে দীর্ঘদিন।

শ্যামল তার ব্যবসায়িক পাওনা বুঝে নিতে চাইল, বীণা জীবনের হিসেব নিকেশ কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে নিতে চাইল। দ্বিখণ্ডিত-সত্তা প্রলয় সামনে অনন্ত অন্ধকার দেখতে পেল। কি করবে সে? সমাধানের পথ না পেয়ে। প্রলয় সমাধানকেই অপ্রয়োজনীয় করে দিল ঃ সে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করল প্রকৃতপক্ষে, সে এই প্রথম দেহ-হত্যা করল, গলায় দড়ি বেঁধে; অনিবার্য ছিল?

———

॥ মাধুরী আর মলি ॥

মাধুরী সংসার পাগল গৃহিনী। কাজ সে অত্যন্ত ভালবাসে, কাজ ছাড়া সময় কাটে না। যেমন তেমন করে সংসার করা তার ধাতে নেই। মাধুরী তাই সব সময়েই ব্যস্ত থাকে। ঘরে শাশুড়ী আছেন, একটি নাবালক সন্তান আছে দুষ্টুমিতে যার জোড়া নেই। আর আছে অত্যন্ত মাতৃবৎসল স্বপুত্রঅন্ত প্রাণ গৃহমুখী সদাশয় স্ত্রী-নির্ভর স্বামী। মাধুরীর সংসারজীবনে তাই দুঃখও নেই, সময়ও নেই। সব কাজ পরিপাটি করে সারতে চায় বলে সব সময়েই মাধুরীর সময়ে টান পড়ে যায়। সকালের জল খাবার সকলের জন্যে গুছিয়ে দিতে গিয়ে নিজের বেলায় বেলা বেড়ে যায়, দুপুরের খাবার খেতেও বেলা গড়িয়ে যায়। মাধুরী শাশুড়ীকে শুধু মা বলে ডাকেই না, অন্তর দিয়ে মা- বলে মনেও করে। মা আর ছেলেকে সকাল সকাল খাইয়ে দিয়ে আপন মনে সংসারের বাকি কাজ সারে। ঠাকুমার ন্যাওটা নাতিটি গল্প শুনতে শুনতে ঠাকুমার কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘণ্টা দু'এক নিশ্চিন্ত। মাধুরী নিজে বিছানায় বিশ্রাম পছন্দ করে না। একটা মোড়া টেনে নিয়ে ওদের বিছানার পাশেই দেয়াল ঠেস দিয়ে কখনও কুরুশে, কখনও উলকাঁটায় কখনও বা সূচীকর্মে মন দেয়। কিছু না কিছু তার হাতে থাকেই। ভিজে চুলের গোছা পিঠের প্রসারে অবিন্যস্ত ছড়িয়ে দিয়ে নিজের তৃপ্ত দৃষ্টিকে একবার একতাল কাদার মতো ঘুমন্ত ছেলের মিষ্টি মুখে বুলিয়ে নেয়, একবার মায়ের গভীর ঘুমের মৃদু মৃদু নাসিকা-ধ্বনিকে মন দিয়ে উপভোগ করে।

আজ মাধুরী একমনে উলকাঁটা নিয়ে একটা জটিল design-এর কূট-কচালে হিসেবের জাল খোলায় ব্যস্ত ছিল। পাশের টেলিফোনটা বেজে উঠতেই হাতে তুলে নিল। "হ্যালো, কে? মলি?" ওপাশ থেকে মলি অবাক হয়ে জানতে চাইল, "কি করে বুঝলি আমিই তোকে phone করেছি?" মাধুরী খুব মজা করে বলল, "phone টা বাজতেই মনে হল তোর কথা, আর তারপর, তোর গলা যে আমার ভীষণ চেনা।" মলি দেরি না করেই বলে ফেলল, "মাধুরী আমার মন খুব খারাপ, তুই একবার আমার এখানে আসতে পারবি?

অনেক কথা আছে তোকে বলার, অনেক অনেক কথা।" মাধুরী অবাক হয়ে গেল মলির কথা শুনে, মনটা একটু যেন ভারিও হল। মলির সঙ্গে ওর জীবন-বোধের কোনও মিল নেই। তবু কেন যেন মলি ওকে কাছে টানে, মলির কণ্ঠ ওকে কণ্ঠ দেয়। ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে প্রায় বড় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি flat এ থাকত। একই স্কুল, একই কলেজ। এবং প্রায় একই সময়ে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। মলি নিজে বিয়ে করে; মাধুরীকে ওর মা-বাবা দেখে শুনে এক অপরিচিত জনের হাতে তুলে দেয়। অনেক কথা এক সঙ্গে ভিড় করে মাধুরীর মনের দরজায় হাজির হতে চায়। এই বিয়ের ব্যাপারে কতো তর্ক, কতো বিতণ্ডা, কতো মত পার্থক্য। "আসবি তো? এখুনি চলে আয় না?" মাধুরীর চিন্তায় বাধা পড়ল। "এখন তো হবে না রে, মা আর ছেলে ঘুমোচ্ছে। ওদের বিকেলের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে যেতে পারি। তা ছাড়া কৃশানু এসে আমাকে না দেখলে অসহায় বোধ করবে না?" মলি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলল, "একদিন বিকেলে স্ত্রীকে না দেখতে পেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, তুই চলে আয়। তোর মা তো থাকবেন?" অগত্যা মাধুরী রাজি হয়ে গেল।

মাধুরী receiver নামিয়ে রাখল। মলি কিন্তু ওর মন থেকে নেমে গেল না। কতো কথা একের পর এক মাধুরীর মনে পড়তে লাগল, কতো বিকেল ভিড় করে এলো, কতো মত-বিভেদ। মলি আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো সাধারণ ছিল না, ছিল না গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী। মলির বাবা C. A. মা আয়কর বিভাগে অফিসার। মলি তাই হিসেবে দড়, বস্তুতান্ত্রিক চেতনায় তীক্ষ্নদৃষ্টি। Schemer—সব ব্যাপারেই, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে মলি পরিকল্পনা ছাড়া একটি পা'ও নিতে রাজি নয়। Love at first sight মলির চোখে আবেগের বিস্ফোরণ থেকে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা। প্রেম? ভালবাসা? মলির মতে স্যাঁতসেঁতে মনের অত্যন্ত জ'লো প্রকাশ। কবি সাহিত্যিকরা প্রেম-কে যে আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন? ভালবাসার দহনের কথা বলেছেন? মলি হাতের উল্টো-পিঠের এক ঝট্‌কায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলত, "কাব্য ব্যাপারটাই আসলে একাকী মনের অবসন্নতা থেকে উদ্গত চোঁয়া ঢেকুর। জীবনের সত্য আর তথ্যকে বাস্তবের কড়াইতে রান্না করতে পারে না বলেই সে সব প্রেম অজীর্ণ রোগের কারণ হয়। কাব্যের জগৎ

আর সাহিত্যের দুনিয়া এই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত স্বাস্থ্যহীনদের দান। আর ঐ আগুনের কথা? সে তো অতীব সাধারণ ব্যাখ্যা! bio-growth ডেকে আনে physio-change, physio-change মনের গভীরে শত শত কামনা বাসনার urge বা শক্তিকে by-product হিসেবে জন্ম দেয়। ইন্দ্রিয় গুলোর মধ্যে রক্তের গতি বাড়ে, neurone synapse সংযোগে বিদ্যুৎ খেলে যায় এবং মস্তিষ্কে আবেগের ফেনিল তরঙ্গাঘাত ঘটে। আগুন-আগুন অনুভব তাই জান্তব: বেহিসেবী মনের উড়নচণ্ডী প্রকাশের নাম প্রেম, ভালবাসা। হিসেবী মানুষ অরণ্যে বাস করে কি? সভ্যসমাজে বাস করতে গেলে অ-সভ্য তাড়নাগুলোকে বাদ দিতেই হয়, কৃষ্টি আর সংস্কৃতির জীবন প্রবাহে যোগ্যতার সঙ্গে সামিল হতে গেলে debit credit এর চুলচেরা বিচার করেই তা সম্ভব।"

কতো কথাই মাধুরীর মনে পড়ছিল। Design-এর জটিল জাল ছিন্ন করে সে এখন যান্ত্রিক বুননে পৌঁছে গেলো। হাত দুটি বেশ ছুটে চলেছে এক কাঁটা থেকে অন্য কাঁটায়। চিন্তার গতি রুদ্ধ হয় নি। মলির কাছাকাছিই ঘুরঘুর করছে। জীবনকে যারা বেলুনের মতো আনন্দের বর্ণে-সৌন্দর্যে ভাসমান দেখে, মলি তাদের দৃষ্টিকে প্রশংসা করতে পারে না। "বাস্তবের খোঁচা খেলেই সেই বেলুন-জীবন চুপসে যায়!" মলি বলত, "জীবন একটাই, যৌবন একবারই আমাদের হাতে আসে। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, হিসেব করে পা মেপে মেপে না চলে আখের নষ্ট করা কোনও কাজের কথা নয়।" মলির সব কথায় মাধুরীর সায় ছিল না, মানতেও পারত না। কিন্তু মলির কথায় একটা জোর ছিল যা মাধুরীর মনকে স্পর্শ করত। বিপরীত কথা মলি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলত বলেই মাধুরী ওকে মন দিয়ে শুনতো, কথাগুলো যদিও তার মনে ধরত না। মাধুরীর অন্তরের গভীর থেকে একটা 'না না, এ সত্য নয়, সত্য হতে পারে না' যেন প্রকাশের জন্য শব্দ খুঁজে বেড়াতো। কিন্তু মলির মতো করে নিজের অনুভবকে ভাবনাকে বিশ্বাসকে মাধুরী ভাষা দিতে পারত না। মাধুরীর তাই নিজের জন্যে কষ্ট হত, মলির জন্যে ভাবনা হত।

কুনালের কথা প্রথম যেদিন মলি ওকে বলেছিল সেদিন মাধুরীর মনে হয়েছিল মলি যেন কোনও অত্যন্ত জটিল একটা জল-চৌবাচ্চা-নলের অঙ্ক

ওকে ধাপে ধাপে বুঝিয়ে বুঝিয়ে উত্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কুনালের background, স্কুলে এবং স্কুল final-এ কুনালের result, প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসেব, JEE / IIT তে কুনালের অবস্থান সূচী, ভবিষ্যৎ আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্র-বৃত্ত, সম্ভাব্য-ভোগ, উপভোগের রেখাচিত্র-খতিয়ান—সব বেশ বিশ্লেষণ করে করে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাধুরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল। "কতোদিন তোদের পরিচয়? আলাপ হল কোথায়?" মলি হেসে ফেলেছিল। "আলাপ হয় নি, হবে ; পরিচয় তখন অনিবার্য অনুসরণ করবে।" অনেকক্ষণই মাধুরীর মুখে কথা যোগায় নি। "আলাপ পরিচয় নেই তো এতো কথা কুনাল সম্পর্কে জানলিই বা কি করে, আর বলছিসই বা কেন?" মলি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, "এটা আমার সুচিন্তিত plan, একটা দীর্ঘ scheme করে তবে কুনালকে net করব ঠিক করেছি। আর দেরি করলে দেরি হয়ে যাবে যে!"

স্কুল-কলেজে একসঙ্গেই কাটিয়েছে বলে ওদের অনেক common-friends ছিল। তাদের অনেকেই friendship-এর বেড়া টপকে partnership-এর বৃত্ত খুঁজেছে। মাধুরীকে বাধাও দিতে হয় নি আবাহনও করতে হয় নি ; ওর নিজের মধ্যেই একটা সীমাবোধ যেন স্বাভাবিক কবচ-কুণ্ডলের মতো ওকে ওর অজান্তেই ঘিরে থাকত। মলির বেলায় ব্যাপার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক দূর এগিয়ে যেতো। মলি জীবন নিয়ে দাবা খেলতে পছন্দ করে, খেলতে খেলতেই ও তথ্য সংগ্রহ করে এবং অঙ্ক না মিললেই চালে মাত্ করে পিছলে সরে আসে।

মলি কুনালকে টিপ ক'রে সুচিন্তিত পরিকল্পনা এঁটেছিল। অনেক পরে মাধুরীকে ওর সাফল্যের কথা বলেছিল। মাধুরীর মা-বাবা তখন মাধুরীর মত নিয়ে পাত্র খুঁজতে ধীরে সুস্থে এক-দুই করে এগুচ্ছেন। ওদিকে মলি ততদিনে কুনালের এক দূর সম্পর্কের বোনের মাধ্যমে ওদের বাড়িতে 'মাসিমা'-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছে, telephone-এ খবরাখবর নিচ্ছে, ছোট ভাইকে অঙ্ক-ইরেজিতে সাহায্য করছে, মায়ের সাহায্যে income tax-এর সমস্যা সমাধান করে দিচ্ছে আর কুনালের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়কে ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে ময়দানে, ময়দান-থেকে গঙ্গার ধারে এবং সেখান থেকে সিনেমা-রেস্টুরেন্টে টেনে নিয়ে গেছে। আলাপকে পরিচয়ে, পরিচয়কে

ঘনিষ্ঠতায় আর ঘনিষ্ঠতাকে অন্তরঙ্গতায় নিয়ে যাওয়া যে একটা art তা মলি জানে। "সফলতাই সব থেকে বড় সাফল্য"—মনে মনে মলি অসীম তৃপ্তি বোধ করেছিল।

বিকেলে ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আর মায়ের অনুমতি নিয়ে মাধুরী মলির বাসায় গেল। মলিকে দেখে মাধুরী যেন আঁতকে উঠেছিল। তিনচার মাস দেখা হয় নি। কি চেহারা হয়েছে মলির? "কি হয়েছে তোর? এ-কি চেহারা করেছিস?" প্রিয়জনের কষ্ট দেখলে মাধুরী বিবশ হয়ে পড়ে। "আয়, বোস। সব তোকে বলব বলেই তো ডেকেছি।" মাধুরীকে সোফায় 'বসিয়ে নিজে পাশে বসে বলল, 'আমি হেরে গেছি। আমার অঙ্ক মেলে নি, নিজেই আজ আমি মাত্ হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে বসেছি।" মলির গলার কান্না যেন টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। মলির ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ঘরের বাতাসকে ভারি করে তুলছিল। "জীবনকে আমি তো একটা ভোগের প্লাটফরম বলেই জেনে এসেছি, লেনদেন বলতে টাকা আনা পাই-এর প্রান্তবদল ভেবেছি। তাই বস্তুজগতের বাইরে মানুষের আর যে কোনও চাওয়ার এলাকা থাকতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করি নি। কুনালকে আমি অনেক করেই তো নিজের করে নিয়েছিলাম। হিসেবে পরিকল্পনায় কোনও ফাঁক ছিল না; তাহলে আমার প্রাপ্তিতে এখন ফাঁকির অংশ বেশি হয়ে যাচ্ছে কেন?" কেন যে হচ্ছে তা মাধুরী অনুভব করতে পারে, প্রকাশ করে বলতে পারার মতো ক্ষমতা তার তো নেই। তবুও সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলল, "কেন, কুনাল তো অত্যন্ত ভাল ছেলে. ঈর্ষাযোগ্য চাকরি করে, তুই যেমন চেয়েছিলি তেমনই তো তোকে সর্ববিষয়েই সমর্থন করে, সঙ্গ দেয়? তাহলে?"

জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরের অসীমে চোখ রেখে মলি তার যন্ত্রণার কথাগুলো বলে গেল। "কুনাল ভালবাসা চায়, অন্তরের স্পর্শ চায় দৈনন্দিন জীবনে; কুনাল কবিতা পড়তে ভালবাসে, ছবি-গান-সাহিত্য কুনালের ফার্স্ট লাভ, কুনাল ট্যালেন্টেড, ভাব জগতে তার অবসরের বিচরণ। আমার কাছে সব ব্যাপারটাই কেমন প্যাঁচপ্যাঁচে রকমের অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাস্তব, তাই আমাদের সহাবস্থান চলেছে, মন চলে নি। আমি কুনালের ভাবালুতাকে ব্যক্তিগত দীনতা বলে মনে করেছি; আর কুনাল আমার মধ্যে যা চেয়েছিল তা বোধহয়.

একেবারেই পায় নি। কি ও চেয়েছিল তা আমার কাছে কোনদিনই পরিষ্কার করে ধরা পড়েনি।" একটু থেমে ভাঙা গলায় মলি বলল, "গত ছ'মাস যাবত কুনাল স্বাভাবিক নয়; রাত করে ফিরত প্রথম প্রথম। অনেক কথাকাটাকাটি, মনোমালিন্য আর কলহবিবাদের পর কুনাল আমাকে নোটিশ দিয়েছে। এখন এখানে, আমার কাছে সে আর আসে না। শুনেছি অফিস-এর এক সহকর্মিনীর জীবনে কুনাল তার অন্তরকে খুঁজে পেয়েছে।

মাধুরী অনিবার্যকে যেন অপ্রতিরোধ্য দেখতে পেল। মলির জীবনবোধ, মূল্যবোধ আর প্রত্যয়ের মধ্যে অনেক ত্রুটি সে অতীতে অনুভব করেছে কিন্তু সে সব মলির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। মলিকে সান্ত্বনা দিতে সে উতলা বোধ করল। কিন্তু কি সে বলবে মলিকে? মলি কেন কুনালকে হারাতে বসেছে?—এ প্রশ্নের উত্তর তো একমাত্র মলিই জানে; আর হয়তো জানে কুনাল। মাধুরী অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

———

॥ মনীষার সত্য ॥

অফিস থেকে ফিরেই মনীষা চলে গেল ড্রেসিং টেবিল-এর সামনে। ড্রাইভারকে দেড় ঘণ্টা বাদে ঠিক সাতটার সময় গাড়ি রেডি রাখতে বলে দিয়ে এসেছে। গীতাকে নির্দেশ দিল গরম জলের ব্যবস্থা করতে। অবশ্যই তার আগে তার যে এক কাপ চা চাই তা বলতে ভুলল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শরীর স্থির সোজা রেখে কাঁধ থেকে একবার ডানদিকে বাঁকিয়ে একবার বাঁদিকে ঘুরিয়ে ক্ষীণকোটি দেহের উদ্ধত স্বাস্থ্যকে স্মিত হাসির প্রলেপ লাগিয়ে বেশ দু'চারবার তৃপ্ত দৃষ্টিতে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, 'নাঃ ঠিক আছে, সব যেমন ছিল তেমনি আছে।' মনীষা জানে শরীর যতদিন তরবারি থাকবে ততদিনই ক্ষুরধার কাটবে। বিরুদ্ধ-বিপরীত সমাজে, প্রতিযোগিতার সর্বব্যাপী বাতাবরণে যা সবকিছুকে ছাড়িয়ে যুদ্ধকে জয়ে, সম্ভাবনাকে প্রাপ্তিতে আর সব সীমাবদ্ধতাকে উন্নতির মার্গে ঠেলে নিয়ে যায় তা এই তরবারি-স্বরূপ দেহ-ধার টুকুই!

একটু আড় হয়ে খাজুরাহো-মুদ্রায় টুলে বসে টেবিল থেকে ব্রাস তুলে নিয়ে আলতো করে দু'বার ডানদিকের চুলে টান-বুলিয়ে নিল, দু'বার ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁদিকে। গ্রীবার নিটোল ভঙ্গিটি চোখ কাত করে দেখে নিল। মনের মধ্যে একটা সির সির তারুণ্য যেন ধ্বনিময় হয়ে খেলা করে গেল। হাতে একটা বঙ্কিম ছন্দ এনে ঘাড়ের চুলে ব্রাস চালাতে গিয়ে মনীষা আঁতকে উঠে থমকে গেল! সিঁথির বাঁদিকে ওটা কি? আলো পড়ে যেন চক্‌চক্ করে উঠলো?—পাকা চুল? মনীষা ভাবল, সময়ের পরোয়ানা? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ভয় পেল, আয়নার আরও কাছে ঝুঁকে এগিয়ে এলো। দুহাতে পাগলের মতো, 'পাথর' খোঁজার মতো চুলের মধ্যে 'বিলি' দিতে লাগল, একটা নয়, দুটো নয় মনীষা বেশ ক'একটার হদিস পেয়ে গেল! একরাশ অন্ধকার যেন মনীষাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করল। পাশের ইজি চেয়ারে অসহায় কান্নায় যেন সে ভেঙে পড়ল।

গীতা চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল, "দিদিমণি,

তোমার কি শরীর খারাপ ?" হাতের ইশারায় ট্রে রেখে যেতে বলে মনীষা উঠে বসার চেষ্টা করল। এক মুহূর্তে মনীষার জগৎ যেন হারিয়ে যেতে বসল। সময় কি খুব বেশি পার হয়ে গেছে ? মনীষা ভেবে পায় না। তার মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। চা খেতে খেতে সে যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। অতীতের পথ বেয়ে বেয়ে কিছুদূর গেল, অনেকদূর যাওয়া আর তার হল না। গীতা গরম জল নিয়ে এলো। বর্তমান তাকে ঝাঁকুনি দিল, তাকে পার্টি-তে যেতে হবে। সময়ের ঘণ্টাধ্বনি কেশগুচ্ছের রূপোলী রেখার আড়ালে তাকে বারে বারেই উন্মনা করে গেল। দ্রুত হাত চালাল মনীষা। পরিপাটি তৈরি হয়ে নিল। আয়নায় প্রজাপতির বর্ণসম্ভার দেখে মোহিত হল। শাড়ির আঁচলটিকে নিটোল টেনে ধরে তরবারির ধার দেখে অবসন্নতাকে ঝটকা মেরে উড়িয়ে দিল। মনে মনে ভাবল,—দেহে যদি বেলাভূমির সদ্য ধৌত মসৃণতা দ্যুতিময় থাকে তাহলে ঢেউএর শীর্ষে ভাসমান শুভ্র-বিন্দু-ফেনাকে কিসের ভয় ? মনের গভীরে বিষাদের বিসর্জনের পর অনাগত সান্ধ্য-পার্টি-র কাল্পনিক গুঞ্জন যেন দূর থেকে ভেসে আসা নির্ঝরের জলতরঙ্গ বলে মনে হতে লাগল।

নিচে গাড়ির হর্ন শুনতে পেয়ে গীতাকে ডেকে বলল, "ফিরতে দেরি হবে। তুমি শুয়ে পড়বে।" মনীষা তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গীতার মনে হল এক আকাশ বর্ণ-গন্ধ-ছন্দ যেন তার দিদিমণির অঙ্গ বেষ্টন করে আনন্দে হাততালি দিতে দিতে নেমে গেল।

যৌবনান্ত রজনীর গভীরে মনীষার অবচেতন হয়তো তাকে স্বস্তি দেয় নি। দৈনন্দিনের বিলম্বিত সকাল আজ প্রলম্বিত প্রভাতে জানালা দিয়ে মনীষাকে ডেকে তুলল। ঘুম ভেঙে ওঠাতেই দিদিমণির অভ্যাস, ঘুম ভাঙানোতে নিষেধ আছে। তাই গীতা ক'একবারই জেনে গেছে দিদিমণির ঘুম ভেঙেছে কিনা। অভ্যাস মতো এবারে ট্রে-সজ্জিত করে সে ঘরে ঢুকল। "স্নানের জন্যে মনটা উতলা হয়েছে!" মনীষা গীতাকে জানাল, "খাবার টেবিল সাজিয়ে ফেল চট্‌পট্‌, অফিসের সময় হয়ে এলো!" চায়ের কাপ হাতে মনীষা আবার ড্রেসিং টেবিল এর সামনে গেল। কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে গেল। সময়ের শুভ্র দন্ড ? অবচেতন ? সর্বশরীরে একবার আলতো চোখবুলিয়ে নিয়ে যেন অবচেতনের দিক্‌-নির্দেশকে অস্বীকার করতেই মনীষা গ্রীবা-কণ্ঠে

দৃষ্টিকে স্থির ধরে রাখল কিছুক্ষণ! তার দৃষ্টি গেল চোখের কোলে। অবিশ্বাস্য! তাড়াতাড়ি হাতের কাপ ট্রেতে রেখে দিয়ে আবার আয়নার সামনে এলো। 'কাকের পদচিহ্ন ?' আঁতকে উঠলো মনীষা। আরও তীক্ষ্ণ হল। বলিরেখা ? মনীষার পক্ষে আভাসই যথেষ্ট। তার অস্তিত্বের ভিতর থেকে একটা চিৎকারের মতো 'না-না-না' যেন মনীষাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইল। সময় আমাকে আজীবন বরাভয় দিয়েছে, কখনই আমাকে এমন করে ভয় দেখায় নি, ছেড়ে যায় নি, আমার আরব্ধ এখনও আমার আয়ত্তে আসে নি। তাই 'সময় কর্কশ হতে পারে না। নির্দয় হতে পারে না, আমাকে পথপ্রান্তে ফেলে রেখে দিয়ে সে কখনই আমাকে নিঃস্ব করে দিতে পারে না!' মনীষা ভয় পেল, মনীষা পালাতে চাইল, তার সব রাগ পড়ল ঐ আয়নাটার মধ্যে। শূন্য কাপটা হাতে তুলে নিয়ে মনীষা সপাটে ছুঁড়ে দিল সেই আয়নাটার দিকে। ঝন্‌ঝন্‌ করে কাপটা চুর চুর হয়ে নিচে ঝরে পড়ল, আয়নায় একটা ফাটল এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত ছড়িয়ে পড়ল।

রইল পড়ে স্নান করা, অফিস যাওয়া, মনীষা সটান ছুটে গেল বেডরুম-এ। উত্তেজনায় সে ছট্‌ফট্‌ করছে, পরাভবের সম্ভাবনায় তার চোখ ফেটে জল আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে দিদিমণিকে অমন আলুথালু দেখে গীতা তাকে ডাকার কথা ভুলে গেল। "কি হয়েছে দিদিমণি ?" গীতা দু'পা ভিতরে গিয়ে সভয়ে প্রশ্ন করেছিল। "কিছু না, আমাকে একা থাকতে দে!" বলে মনীষা গীতাকে যেন তাড়িয়ে দিয়েছিল। সন্তর্পণে গীতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে জানল দিদিমণির আজ স্নান-খাওয়া হবে না, অফিসও বোধহয় যাওয়া হবে না। ভেবে পেল না কিছুই।

বিষণ্ণতা মনীষাকে পেয়ে বসল। বর্তমানের বিন্দুতে থেকে সে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় অনেক ক্ষণই বিভোর রইল। তার যে এখনও অনেক কিছু করার বাকি, অনেক দূর যাওয়া, অনেক অনেক পাওয়ার থেকে গেল! সেই কবে কোন তরুণী বয়সে মনীষা যাত্রা শুরু করেছে। বুদ্ধিকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করে ও যা পারে নি কতো সহজেই সে সব কাজ অনায়াস হয়ে গেছে ওর তরবারিখানাকে যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগানোর ফলে। স্কুল কলেজে ভাল নম্বর পেয়েছে অনেক জানত বলে নয়, শিক্ষকদের অনেক কাছে যেতে পারত বলে। বেশিরভাগ দিদিমণিরা পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যেতেন মনীষার চপলচঞ্চল

নৈকট্যের মায়াজালে। অনেক সকাল সকালই ও জেনে গেছে যে শরীরের মোহময় ছন্দ উজ্জ্বল বুদ্ধির ধারের চাইতে অনেক বেশি কার্যকর, আরশুকে পেতে, বরফকে গলাতে এমনকি বিরুদ্ধতার মধ্যে পথকে সহজ করে তুলতেও স্মার্টনেস অনেক বেশি বাস্তব। ব্যবহারে ওর জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে, নিপুণতা বেড়েছে, কৌশল আয়ত্তে এসেছে। তাই ওর সহপাঠিনীরা যখন চাকরির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে প্রবেশের পথ খুঁজছে মনীষা তখন, পরীক্ষা দিয়েই, বেসরকারী সংস্থায় এ্যাসিসটেন্ট-এর মই-তে পা রেখেছে। তার পরের ইতিহাস মনীষার সবই পরিষ্কার মনে আছে।

মনীষার ইংরেজি উচ্চারণ অত্যন্ত পরিশীলিত, আদব-কায়দায় কোনও ব্যাকরণগত ত্রুটি ধরা পড়ে না, যাঁর অধীনে কাজ করে তাঁর দু'ধাপ উপরের কর্তার দৃষ্টির মধ্যে দ্রুত চলে আসে এবং অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই কাজের চাইতে মনীষা সাজে. নিজের টেবিলের চাইতে ফাইল নিয়ে অফিসারের চেম্বারে বেশি তৎপর হয়ে উঠতো। অফিসের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে সান্ধ্য পার্টি-র প্রাঙ্গণে মনীষা অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। এবং একদিন বড়সাহেবের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় অন্যতর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে এবং সম্মান অর্থে নিজেকে খুঁজে পেত। উন্নতির লক্ষ্য স্থির রেখে উপলক্ষ্য তরবারিটি মনীষা সুকৌশল নিপুণতায় প্রয়োগ করত। ক্যাপিটেল-এ ঘাটতি না ঘটিয়ে মনীষা ইন্টারেসট উপভোগ করত।

মনীযা তার অনেক সহকর্মিনীর কথা ভাবল, অনেক সহপাঠিনীর কথাও। গত কুড়ি বছর ধরে তারা যেখানে ছিল সেখানেই কাজ করে চলেছে। কেউ প্রমোশন পেয়েছে, কেউ পায়ই নি। অনেকেই বিয়ে করে জীবনের তরতাজা প্রাণকে রান্নাঘরের ছ্যাঁক-ছোঁকে, বাচ্চা-কাচ্চার স্যাঁত-সেঁতে রুটিনে অথবা অনুনয়-বিনয়ের আর্থিক অনুকম্পায় ধূসর করে তুলেছে। অনেকে মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগ্নীর সংসারে আটপৌরে পাংশুবর্ণ জীবন যাপন করে চলেছে। এদের কথা ভেবে মনীষা মনে একটু বল খুঁজে পেল। সে অন্তত ওদের মতো ডোবা জীবনের পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খায় নি।

'চল্লিশের রেখায় পৌঁছোতে তিনবার ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছি। ম্যানেজমেন্টের সুপরিসর এলাকায় দৃপ্ত পদচারণা করতে পারছি। এ্যাসোসিয়েশন

আছে, পার্টি আছে, ক্লাব আছে। আছে নিজস্ব ফ্ল্যাট, গাড়ি এবং যত্নে ধরে রাখা আমার তরবারি।' মনীষার ভাবনায় ছেদ পড়ল। ধরে রেখেছি কি? অস্তিত্বের ভিতর থেকে যেন মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল অনুভব সিরসির করে ঘাড়ের কাছে পৌঁছে বেদনার অনুভব জাগ্রত করে দিল। আবার সেই ভয় মনীষাকে কাঁপিয়ে দিল। দ্বিপ্রহর কি তাহলে অতিক্রান্ত? Executdive manager এর ভার্নিশ করা প্রশস্ত দরজাটা ওর চোখের সামনে যেন হাতছানি দিল। কালকের পার্টিতেই তো chairman ওকে একান্তে পেয়ে, নৈকট্যের ঘোরে মদির হয়ে, একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে name plate টি কেমন হলে শোভন হয় তা জানতে চেয়েছিলেন! ক্ষুরধার তরবারি যদি এতটুকু ভোঁতা হয়ে যায়, যদি সময়ের মরচে পড়ে, যদি মাথার উপর সাদা পতাকা আর চোখের কোলে ঢেউ দেখা দেয় তাহলে?

মনের depression থেকে মুক্তি পেতে মনীষা তার বন্ধুকে ফোন-এ ডাকল। "এই বিপাশা তুই কি করছিস্ এখন? একবার আসবি? আজ office যাই নি রে।" বিপাশার সঙ্গেই ওর যা একটু সম্পর্ক এখনও টিকে আছে। স্কুল থেকে কলেজ। দীর্ঘ পরিচয়. অনেক আন্তরিক অতীতের পারস্পরিকতায় সেই পরিচয় এক সময়ে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। বিপাশা বলল, "তুই চলে আয়, টেনে আড্ডা দেওয়া যাবে"।

বিপাশার স্বামী একটি বেসরকারী সংস্থায় মোটামুটি উচ্চপদে চাকরি করে। শাশুড়ী আছেন আর আছে অত্যন্ত দুষ্টু দুটি সন্তান। বিপাশার কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পরে এম. ফিল করতে করতে বিয়ে হয়ে যায়। একটু বেশি সময় নিয়েই প্রদীপ্ত আর বিপাশা পরস্পরকে জানতে বুঝতে চেয়েছে। ওরা নিশ্চিত হয়েই জীবনকে সংসারমুখী করেছে। ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। "তাহলে আমিই আসছি", বলেছিল মনীষা। বিপাশা বলল, "এখানে দুপুরে খাবি? লাঞ্চ খেয়ে খেয়ে তোরা তো শাকচচ্চড়ি আর নারকেল-চিংড়ি ভুলেই গেলি! চলে আয়। একদিন অন্তত বাঙালী হয়ে দেখ কেমন লাগে?" মুহূর্ত ভেবে মনীষা রাজি হয়ে গেল। 'নিজের চেতনার হাত থেকে মুক্তিও মিলবে, বিপাশার ঘরোয়া জীবনও দেখা যাবে'—ভাবল মনীষা।

অনেকক্ষণ ছিল মনীষা বিপাশার ওখানে। বিপাশা প্রদীপ্তকে ফোন করে

ডেকে এনেছিল। তিন-চার ঘণ্টা একটা পরিবারের একেবারে আটপৌরে মধ্যিখানে কাটিয়ে মনীষার মনের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। বিপাশার জীবনে আনন্দের হাট; প্রদীপ্ত-বিপাশার চোখে-মুখে কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে মনীষার দৃষ্টির সামনে একটা অন্য জগৎ যেন অবারিত হল। আর প্রদীপ্তর মা? মনীষা মায়ের নৈকট্যহীন জীবনে এই মহিলাকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেল। জীবনে যে স্নেহ-ভালবাসা প্রেম-প্রীতি হিসেব করে খরচা করার বিষয় নয়, সে যে স্বাভাবিক মনের স্বচ্ছন্দ উৎসে স্বতঃই উৎসারিত তা যেন প্রতিমুহূর্তেই মনীষা টের পেতে লাগল। আর বিপাশার ছেলেরা? ব্যাকরণের ধার ধারে না, আত্মজনের মতো কতো সহজেই মনীষাকে আপন করে নিল?

ওরা সকলেই ঘরের বাইরে পর্যন্ত এসে মনীষাকে বিদায় জানাল। "আবার আসবে মাসি"—যেন দুই ছেলের একই কামনা। মাসিমা বললেন, "একা থাক, সময় পেলে আসবে কিন্তু"। মনীষা আনমনে ঘরে ফিরল। শুভ্র কেশের বেদনা বোধ নেই, বলিরেখার কথা ওর মনেই এলো না। মনীষার ভাবনা এবারে অন্য ধারায় বইতে লাগল। সে যে সঠিক কি তা তখনও সে বুঝে উঠতে পারে নি। ওর মনে একটা প্রশ্ন খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল, 'জীবনের এতোটা সময় ধরে যাকে সত্য বলে মনে করেছি সে কি সত্য? অন্ধের মতো যথার্থ সত্যকে, অধিকতর সত্যকে মিথ্যা বলে মনে করি নি তো?'

———

॥ বৌমা ॥

দুপুরে বেলার স্বল্পায়ু বিশ্রামটুকু শয়নকক্ষের নিঃশব্দ একাকিত্বে কাটিয়ে চিত্রলেখা বিছানা থেকে উঠি উঠি করছেন। অন্যাদিনের মতো আজ যেন পাশে রাখা অর্ধসমাপ্ত কাঁথাখানা গোল টেবিল থেকে মুখ বের করে তেমন করে হাতছানি দিচ্ছে না। কাজ হাতে নিয়ে চিত্রলেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পান না। একটা কাজ শেষ করে অন্য কোনও কাজ মনে মনে স্থির করা থাকলেও একবার বৌমাকে জিজ্ঞাসা করে নেন, "এবারে একটা কিছু কাজ থাকলে দিতে পার"। কাজ ছাড়া যেমন তিনি থাকতে পারেন না, তেমনি কাজের ধরন ধারণ বিষয়েও তাঁর কোনও নিজস্ব বাছ-বিচার তেমন প্রবল নয়। কাজের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা থাকলে তাঁর মন সেকাজে সম্পূর্ণকরেই নিজেকে নিবেশ করে দিতে পারে। অন্যথা যান্ত্রিক কুশলতায় মনকে নিযুক্ত রাখেন।

চিত্রলেখা অতীত নিয়ে খেলা করতে, নাড়াচাড়া করতে, অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁর সাত দশকব্যাপী জীবনের প্রায় ছয় দশক পরিসরকে নিয়ে, শত শত ঘটনা, কাহিনী উপাখ্যানকে পুতুলের সংসার করে ছেলেবেলার মতো বারে বারে সাজান, আবার সাজান এবং উপভোগ করেন। এখন তাঁর অফুরন্ত সময়, ভাবনার জগতে নির্বাধ পাখা মেলে অনুভবগুলোকে যেন অনেক দূর থেকে, অন্য কারো জীবনের বলে, উপলব্ধি করেন। তাঁর দীর্ঘজীবনের শতসহস্র আনন্দ-বেদনার অণু-পরমাণুগুলো যেন এক একটা প্রেক্ষিতকে বৃত্ত করে করে ঘুরপাক খায়; আনন্দগুলো উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলে স্মিত হয়ে দেখা দেয়, দুঃখ-বেদনাগুলোও যেন তাৎক্ষণিক তীব্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে অনেকটাই আপন বোধে একটা সির-সির তরঙ্গ তোলে মাত্র। চিত্রলেখা তার এই মনের ঘরের অন্দরে নিতিনিতি অতীত দিনকে নিয়ে যে খেলাঘর পাতেন তা আড়াল দেবার জন্যে, তাকে নির্বাধ যেমন-খুশি-তেমন গতায়াতের স্বাধীনতা দেবার জন্যে আর অন্যের দৃষ্টি-প্রশ্ন-ঔৎসুক্য থেকে, ছোঁয়া বাঁচানোর মতো করেই, বাঁচানোর জন্যে কাজের মাধ্যমটিকে আঁকড়ে থাকেন। কাজ সময়কেও ভরাট করে, মনকেও একা-একা থাকতে সাহায্য করে।

"মা, এই আপনার হরলিক্স।" বিকেল হতে না হতেই বৌমা শ্বেত পাথরের 'গ্লাসে' করে চিত্রলেখার অপরাহ্নের বরাদ্দ পানীয়টি সামনে নিয়ে আসে। কাজ থেকে পলকমাত্র দৃষ্টি তুলে বৌমার মুখে বিকেলকে পড়ে নিয়ে চিত্রলেখা বলেন,—"রেখে দাও বৌমা। খুব বেশি গরম?" গ্লাসটি তাঁর পাশে রেখে তার পুত্রবধূ যখন চলে যায় তখন সেই চলনে-গমনে তিনি সন্তর্পণে সেই দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস পড়ে নিতে চেষ্টা করেন। এই পথটি তিনি অনেক দেখে শুনে এবং ভেবে চিন্তে স্থির করে নিয়েছেন। তিনি ভাবেন. আমাদের সময় অনেক অনেক আগেই কেটে গেছে। এখন ব্যক্তিগত জীবন আছে আর তা ক্রমশই বাড়ছে। আমাদের সময়ে ব্যক্তিগত জীবন সমগ্র পরিবারের মধ্যে হারিয়ে যেতো, মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতো। পুত্র পুত্রবধূর বেলায় ওদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালে 'ও কিছু নয়'-এর কপালকুঞ্চন দেখা দিত। আর এখন তো নাতি-নাতনীদের বেলায় ব্যক্তিগততা একেবারে টৈটম্বুর অবস্থানে ঝংকার তোলে। তাই চিত্রলেখা আবহাওয়াকে বোঝার চেষ্টা করেন, জানার জন্যে প্রশ্ন করেন না।

হাতের কাজ বন্ধ করতে সূচ-টিকে কাঁথায় গেঁথে রেখে একটু পাশ ফিরে বসেন। বিকেলের এই পানীয়টুকুকে হাতে নিয়ে রোজই তিনি তাঁর কোনও না কোনও অতীত ঘটনাকে একই সঙ্গে পান করেন। আজ প্রায় পাঁচ বছর চিত্রলেখা স্বামী-ছাড়া একেবারে একা। মৃত্যুর আগেও তিনি মজা করতে ছাড়েন নিঃ 'রোজ আমাকে ঘন করে জ্বাল দেওয়া একগ্লাস দুধ দাও, আর নিজে কিছুই খাও না। কেন? সে কি তুমি আগে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছ বলে?'—বিকেলে দুধের গ্লাসটি হাতে করে দিতে গেলে মৃদু মৃদু হেসে বলেছেন। কখনও বলেছেন, 'সোনাবউ, বিকেলে দুধের পরিবেশনটা বাটিতে করতে পার না?' চিত্রলেখাকে তিনি 'সোনা বউ' বলে ডাকতেন। 'কেন? গ্লাসে কি দোষ হল?'—চিত্রলেখা প্রশ্ন করেছেন। একটা ভারি শিশুসুলভ মুখ করে বলেছেন, 'তাহলে সঙ্গে একটা-দুটো কলাও দিতে পারতে!' চিত্রলেখা নিজের অতীতের কপালের ভাঁজ যেন এই এখনও হরলিক্স পান করতে করতেও দেখতে পান।

দেহের ভার বাঁ হাতের তালুতে রেখে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে শূন্য গ্লাসটি যথাসম্ভব দেয়ালের ধারে জমা করে দিয়ে চিত্রলেখা আবার সেলাইতে মন

দিতেন! বৃদ্ধ বয়সে খুনসুড়িটা বেশই বেড়ে গেছিল। চিত্রলেখা নিজের মনে মৃদু মৃদু হাসেন আর অবসর গ্রহণের পাঁচ-ছয় মাস আগে থেকে স্বামীর হাল্কা মনের উপদ্রব আর পিছনে লাগার ঘটনাগুলো উপভোগ করেন। 'যতদিন উপার্জন বেশি করেছি ততদিন তুমি আমার ঘাড় ভেঙেছো; এবারে রিক্ত হস্ত আমি তোমার ঘাড়ে চড়ে বসব দেখে নিও!' চিত্রলেখা স্বামীর কথা শুনেই বলেছেন,—'তোমাদের পরিবারকে সেই দশ বছর বয়স থেকে কাঁধে বয়ে বয়ে আমার কাঁধ-ঘাড় তোমার একার বোঝাকে বুঝতেই পারবে না! গল্পের উদাহরণ দিয়ে নিজের আর তোমার ধর্ম-নাশ করাবো না।' চিত্রলেখা হাতের সূচকে থামিয়ে রেখেই দৃশ্য-নাট্যটি দেখে নিলেন। 'অতীতের কাঁটাগুলো সময়েব আঘাতে বোধহয় বিদ্ধ করার শক্তি হারায়!' মনে মনে ভাবলেন চিত্রলেখা। 'কম চোখের জল আর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসতো পড়েনি তাঁর যাবার বেলায়! এখন কেন তবে তাঁর স্মরণ সুখের অনুভবকেই সামনে আনে মাত্র?'

চিত্রলেখার মনটি শেষ বিদায়ের দিনটির কথা ভাবতেই অনুসঙ্গে প্রথম গৃহ প্রবেশের দিনটিকেও ছুঁয়ে নিতে চায়। অর্ধ শতাব্দির ওপারে হলেও মনে পড়ে যেন অত্যন্ত তরতাজা। কারণ বোধহয় এই, চিত্রলেখা ভাবে, যে অন্যান্য অনেক জীবনচিত্র একা-একা এসেছে মনের সামনে. যৌথ স্মৃতিমন্থনের সুখ চেতনায়, প্রদর্শনীতে পর-পর পাশাপাশি সাজান অভিজ্ঞানে; কিন্তু প্রথম দিনের অবুঝ প্রানের অলক্ত-রঞ্জিত কপালে-কপোলে লাল চেলীর ঘোমটা আঁটা অবোধ কিশোরীটি এসেছে বার বার, বহুবার। সুযোগ পেলেই তার তরুণ স্বামীটি জড়োসড়ো সেই একবান্ডিল বেনারসীটির কথা নানাভাবে নানান ভঙ্গিতে এবং কণ্ঠের প্রভূত কারিকুরিতে এই সে দিন পর্যন্তও পুত্র পুত্র-বধূর সামনে তুলে ধরতে দ্বিধা করেন নি!

পুনঃ পুত্র-বধূর কথায় চিত্রলেখার মন দ্রুত সময়ের পাতা উল্টে একলহমায় সানাই বাজা ভোরে টোপর হাতে পুত্রকে যেন দেখতে পেলেন বধূ সহ গৃহ দ্বারে, বরণের অপেক্ষায় আনন্দ-দৃষ্টি। পাশে নত-মুখ সলজ্জ দাঁড়ানো তাঁর পুত্রবধূ। একটু দূরে হৃষ্ট-তৃপ্ত মুখে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো অকারণ রহস্যালাপেই বোধহয় উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখে গৃহকর্তাটি চারদিকে নজর বুলিয়ে বুলিয়ে চলেছেন। চিত্রলেখা জানতেন তিনি কিছুই সবিশেষ দেখছেন না, দেখা-দেখার প্রশাসনিক তৎপরতাকেই প্রকাশ করে চলেছেন মাত্র।

তাঁর পুত্রটি সমৃদ্ধ চাকরি করে। পুত্রবধূটিও শিক্ষিত, সম্পন্ন গৃহে লালিতপালিত। নিজের বেনারসী-বাণ্ডিল গৃহ-প্রবেশের দিনটিকে পুত্রবধূর পাশাপাশি রেখে নিজের অজান্তেই একবার দেখে নিলেন। একপুরুষে দিন কতোই না পাল্টালো। চিত্রলেখা বহুদিন মেয়ের মতো 'মানুষ' হয়ে, শত ধারায় স্বামীর পরিবারের সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছিলেন 'বধূ' হবার আগেই। আর এখন? এখন এরা একা-একা হয়ে আসে, পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকার নিয়েই বধূ থেকে কর্ত্রী হয়ে ওঠে। পত্র-পল্লবের পুঞ্জিত-সঞ্চয় সঙ্গে নিয়েই প্রবেশ করে স্বামী গৃহে, কিশলয়-কৈশোর তাই এরা মাতা-পিতার আওতায় রেখে আসে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এরা অভিব্যক্ত হয় না, স্বীকৃত সামাজিক ব্যাংক-এ এরা, যোগ্যতা অর্জনের আগেই, অধিকারী হিসেবে সম্পর্কের ভিত্তিতেই চেক কাটতে পারে, চেক কাটতে থাকে।

চিত্রলেখা চশমাটি খুলে একবার আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন। বাইরের দিকে তাকালেন। বুঝলেন আকাশের আলোই কমে এসেছে, তাঁর চোখের কোনও দোষ নেই। চশমাকে আবার নাকে লাগিয়ে হাতের কাজটুকু গুছিয়ে রাখলেন। ব্যালকনিতে গিয়ে চেয়ারখানাকে সোজা করে বসলেন। সামনের পথে চলমান জীবনকে কিছুক্ষণ দেখতে লাগলেন। কর্মহীন সান্ধ্য অবসরটুকুকে কোলে করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

সুমিতার কথা চেষ্টা করেও মন থেকে সরাতে পারলেন না। সুমিতা তাঁর পুত্রবধূ। বছর তিনেক হয়ে গেল সুমিতা তার ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনেছেন। পুত্র সুদীপ সুমিতার একমাত্র সন্তান। অত্যন্ত স্নেহে-ভালবাসায় লালিত-পালিত। সুমিতা পুত্রঅন্ত প্রাণ। এই সেদিন পর্যন্তও সুদীপ মা ছাড়া এক পাও চলত না, তার পরামর্শ ছাড়া কোনও কাজই করত না। আর এখন? সুদীপের জীবনে তপতী এসে যেন সব তছনছ করে দিল। মায়ের বৃত্ত থেকে যেন সুদীপ কক্ষপরিবর্তন করে তপতীর বৃত্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। মর্মবেদনার কারণ এখানেই, এই পুত্রকে হারানোর জন্যেই। চিত্রলেখা তাঁর নিজের পুত্র শ্রীময়কে অসীম স্নেহেই বড় করে তুলেছিলেন। মা-বাবার নৈকট্য আর স্নেহ-ভালবাসার পাশাপাশি বৃহৎ পরিবারের স্বজন পরিজনরাও সমান ভাবেই শ্রীময়কে প্রভাবিত করেছে, প্রেম-বাৎসল্যের শত

তরঙ্গ ভঙ্গে সে ধাপেধাপে সম্মুখ হয়েছে। শ্রীময় তাই চিত্রলেখার গর্ভজাত সন্তান হয়েও তাঁর একার সম্পদ হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। আর তাছাড়া তাঁর স্বামী ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির, দার্শনিক চেতনাসম্পন্ন। কর্তব্যে অসীম নিষ্ঠা কিন্তু সুখে-দুঃখে সমান নিরুত্তাপ। নিজের সন্তানকে নিয়ে তাই চিত্রলেখার কোনও হারানোর বেদনা বোধ কখনই মনে আসে নি। স্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে মনে করে নিতে তার কোনও প্রচেষ্টাই দিতে হয় নি। পুত্রবধূ, সুমিতা, যখন শ্রীময়ের জীবনে এলো তখন শ্রীময়ের সব ভার অনায়াসেই সুমিতার হাতে তিনি তুলে দিতে পেরেছিলেন।

'সুমিতা যা সহজে পেল তাই তপতীর বেলায় কেন সহজ বলে মনে করতে পারছে না?' মনে মনে এই প্রশ্ন নিয়ে চিত্রলেখা বিব্রত বোধ করছে। যাঁর কাছে এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি সহজেই দাঁড়াতে পারতেন সেই তিনি আজ নেই। সুমিতার কাছে প্রশ্নটি একেবারেই ব্যক্তিগত। সুদীপকে সকলের হয়ে বড় হবার, বেড়ে ওঠার, সুযোগই দেওয়া হয় নি। সে সুমিতার নয়নের নিধি, আঁচলের ধন, জঠরের অভ্যন্তর থেকে শুরু করে জীবনের সুদীর্ঘ তিন দশক সুমিতা সুদীপকে নিয়ে কতো কল্পনার জাল বুনেছে, শত পরিকল্পনার রূপরেখা অঙ্কন করেছে আর ভবিষ্যতকে ঘিরে আশাআকাঙ্ক্ষার প্রদীপখানি প্রোজ্জ্বল রেখে রেখে সময় কাটিয়েছে। এখন হঠাৎ তপতীর আবির্ভাবকে তাই সুমিতা আশাভঙ্গের কারণ বলে, পরিকল্পনার জলাঞ্জলি বলে মনে করছে। উত্তেজনা বাড়ছে, পথ ভুল হচ্ছে আর পুত্রবধূকে দূরে রাখতে গিয়ে ক্রমশই পুত্র থেকে দূরত্বকে বাড়িয়ে চলেছে।

আজ সাতদিন হল সুদীপ তপতীকে নিয়ে তাদের সদ্য কেনা ফ্ল্যাটে-এ উঠে গেছে। সুমিতা তার অদম্য বেদনাকে একা একা বয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীময় বাবার ধাতু পেয়েছে। সংসারের কোনও ব্যাপারেই সে নিজে থেকে নাক গলাতে চায় না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীবনের সত্যও যে পরিবর্তিত হতে বাধ্য, এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলাটাও যে জীবনেরই দাবি তা শ্রীময় বিশ্বাস করে।

কিন্তু সুমিতার বেদনাবোধ চিত্রলেখার মনকে ছুঁয়ে যায়। তপতীর অধিকারবোধকেও তিনি অকারণ বলে মনে করতে পারেন না। কর্তব্য-অধিকার, উচিত অনুচিত তো মানুষের নিজের মনের বিশ্বাসে আর চেতনায় ব্যক্তিগত

তাৎপর্য পায়, পেতে বাধ্য। সেই বিশ্বাস আর চেতনার যা কিছু আনন্দ-বেদনা তার সবই তো ব্যক্তিকে মেনে নিতে হবে।

ভিতরে, শয়ন কক্ষে, 'খট' করে শব্দ হতেই চিত্রলেখার চিন্তায় ছেদ ঘটল। 'অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘরে আসুন'—বলে সুমিতা ঘরের আলো জেলে তাঁকে ডাকল। সন্ধ্যের পরে চিত্রলেখা যাহোক কিছু পড়েন। বইয়ের যোগান গৃহ-গ্রন্থাগারের গহ্বরে যা আছে তার বাইরে শ্রীময়ই ব্যবস্থা করে দেয়। বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র খানা হাতে নিয়ে বিছানায় বসলেন। আজ মনে হল মনটা কেমন যেন উন্মনা। সুমিতার জন্যেই কি? সুমিতার বেদনাবোধ, কষ্ট, দাহ যেন আজ বারবারই চিত্রলেখাকে উদাস করে তুলছে। ডেকে কাছে এনে সান্ত্বনা দেবো?'—ভাবলেন। তখনই যেন স্বামীর কথা মনে হল। যেন বলছেন, 'জীবনে সমস্যা থাকবেই। সুমিতার সমস্যা সুমিতার; সে তোমার সাহায্য চাইছে কি, সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে কি?' চিত্রলেখা মনে মনেই উত্তর দিলেন, 'কিন্তু ওর যে অসীম কষ্ট! পুত্র বলে কথা!' কর্তা যেন বললেন, 'তোমার সমস্যা নিজেকে শান্ত রাখা, অপরকে অনাকাঙ্ক্ষিত সান্ত্বনা দেওয়া নয়। বর্তমান সমাজ তার ব্যক্তিগত জীবনবোধ নিয়ে যদি হিমসিম খায় তবে তার পথ, যদি কিছু থাকেও, তা সেই জীবনই খুঁজে নেবে। তুমি সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে মাত্র। তোমার পুরোনো মূল্যবোধ এখন থৈ পাবে কি?'

চিত্রলেখার বার বারই মনে হতে লাগল 'না-না, এ-ঠিক নয়, ঠিক নয়! ত্যাগের স্বাভাবিক প্রকাশ যদি বাধা পায় তাহলে ভোগও স্বাভাবিক হতে পারে না। সুমিতা পুত্রকে পুত্র-হিসেবেই ধরে রাখতে চায়, স্বামী হয়ে তপতীর হতে দিতে চায় না। এই স্বার্থ বোধের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে সুমিতা কষ্ট পাচ্ছে, সুদীপের সমস্যা বাড়াচ্ছে আর তপতীকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথে ঠেলে দিয়েছে।' ঘরে পদশব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সুমিতা। বর্ষন ক্লান্ত মুখমণ্ডলটি বেদনাহত। 'মা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না! কি করব বলে দিন।' চিত্রলেখা পুত্রবধূকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

॥ অতীত ভবিষ্যত ॥

অজিত সামন্ত হঠাৎই একদিন হারিয়ে গেল। প্রথম প্রথম কানাঘুষো, একটু বেলা বাড়তেই ফিসফিস এবং বিকেল নাগাদ সকলেই জেনে গেল যে অজিত সামন্তকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে নেই তো একেবারেই নেই। কাল পর্যন্ত যে লোকটা সর্বত্রই, সর্বক্ষণেই উপস্থিত ছিল, সচেতন চিন্তায় আর অবচেতনের সিরসির অনুভবে, সেই লোকটা একটা রাত যেতে না যেতেই যেন সকলের মনেই একটা হাল্কা বাতাস বইয়ে দিয়ে এক-ঝটকায় উবে গেল। একটা রক্ত-মাংসের সামাজিক অস্তিত্ব কেমন হঠাৎই যেন একটা শব্দ-ইতিহাস-সর্বস্ব অতীত হয়ে গেল।

শহরের উপকণ্ঠে আধাগ্রাম-আধাশহর এলাকায় একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল অজিত সামন্তর। সকলেই মনে মনে ছেলেটিকে অপছন্দ করতো, কিন্তু সামনা সামনি হলে অবশ্যই সমীহ করে ভাই-বাছা করে কথা বলতো। পুজা-উৎসবে অজিত ছিল নেতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শবযাত্রা-ব্যবস্থাপনায় পুরোধা। কেরোসিনের লাইনে অথবা র‍্যাশনের দোকানে অজিত থাকলে কারো কোনও ট্যাঁ-ফোঁ শোনা যেতো না। মুকুটহীন এই রাজাটি নিজে কখনও কাউকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেছে বলে শোনা যায় নি, সে নিজে কারো গায়ে হাত তুলেছে, বোমা ছুঁড়েছে বা কারো বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে কাজ আদায় করেছে বলেও কেউ কখনও বলে নি। তবুও সকলে বিশ্বাস করে যে অজিত সব পারে, মনে করে অজিতের খপ্পরে পড়লে সর্বনাশ অবধারিত, এবং ভয় পায় যে অজিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে এলাকায় বাস করাই সম্ভব হবে না।

অজিত অবশ্য ওর নিজের নাম, কিন্তু নিজের অর্জিত নাম অজা। অজিত ওর মা-বাবার দেওয়া সামাজিক-পারিবারিক নাম, ওর শৈশবের নাম। অজিত নামটা কৈশোর ছাড়িয়ে ওর তরুণ জীবনের অনেকখানি পথ পরিক্রমা করার সুযোগ পেয়েছিল। তার পরেই আর অজিত নিজেকে অজিত বলে চিনতে পারে নি। অন্যান্যদের মতো কিছুদিন বিদ্যালয়ে যাতয়াত ঘটেছিল। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি ওর কুশলতা প্রকাশের নমুনা দেখেই বোধহয় ওর শিক্ষকরা ওকে প্রথম অজ-অজা ইত্যাদিতে অভিহিত করে থাকবেন। সে সকল

অনুসন্ধান এখন ইতিহাসমনা লোকেদের এলাকায়। প্রতিবেশীদের এলাকায় অজিত যখন অজা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন ওর খর-দ্বিপ্রহর।

অজিতের যারা উপগ্রহ বা চামচে, যারা ওর প্রতিফলিত তেজে ও ব্যক্তিত্বে নিজেদের তেজ আর দ্যুতি খুঁজে পায় তারা অবশ্যই জানে কোন কাজে আর অকাজের সাফল্যে, কি পদ্ধতিতে আর কোন উপায়ে অজিতের এই অজা-তে বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। তারা জানে কত চোখের জলে অজিতের পথ পরিক্রমা সহজ হয়েছে, হয়েছে কত রক্তপাতে, কত ভীতি প্রদর্শনে আর ত্রাস সৃষ্টিতে। এলাকার অধিবাসীরা ফলাফলেই তুষ্ট কারণের অনুসন্ধানে নিজেদের বিপন্ন করার ঝুঁকি নিতে নারাজ।

শুনেছি দুটি বিষয়ে অজিতের কোনও সমস্যা ছিল না। একটি টাকা, অন্যটি নারী। টাকা বিষয়ে ওর কোনও সংশয় ছিল না কারণ যেখান থেকেই আসুক আর যেমন পথেই আসুক টাকা টাকাই। টাকার কোনও বর্ণ নেই, ভাল মন্দ নেই। টাকার সার্থকতা খরচা করে উপযোগ-উপভোগ ক্রয় করাতেই শেষ। তেমনি নারী বিষয়েও ওর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। নারী মাত্রেই মাতা, ভগ্নী বা কন্যা। সুতরাং শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। সেখানেও বর্ণ নেই, শ্রেণী নেই, ভালমন্দ নেই। অজিতের বিরুদ্ধে যেকোনও অভিযোগ বিশ্বাস্য—খুন-জখম-মারপিট, ছিনতাই-রাহাজানি-ডাকাতি, ভয় দেখানো ব্ল্যাকমেল-জালসই, বাড়ি বেদখল, অগ্নিসংযোগ উৎখাত—যে কোনও বিষয়েই অজিত negotiable, কিন্তু একটি শিশুও বিশ্বাস করবে না যদি কোনও নারী-নির্যাতনের সঙ্গে অজিতের নাম যুক্ত করে কোনও অভিযোগ আনা হয়। বরং লোকে বিশ্বাস করবে যে অজিত তখন নির্যাতিতার পক্ষে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে অথবা তার সাহায্য চাওয়া হয়।

সাধারণ উচ্চতার চর্চাপুষ্ট দেহখানি পোষাকের আড়ালে সবিশেষ বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। চলনে বলনে ভেতো বাঙালীর যাবতীয় প্রলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। অজিতের একমাত্র বিশেষত্ব তার চোখে। টানা চোখের গভীরে একটা বিতৃষ্ণা যেন শ্বাপদ হিংস্রতায় সকুণ্ঠন স্থির। ওর চোখের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় খোঁচা খেলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে, ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে।

অজিত গৃহের চাইতে রাস্তার মোড়গুলো বেশি পছন্দ করে। একা থাকতে চায় কিনা তা জানার উপায় নেই কারণ উপগ্রহদের স্বভাবই এই যে গ্রহের টানকে তারা এড়িয়ে যেতে পারে না। অজিতের একটা ব্যক্তিগত দিক আছে তা সবাই জানে, কিন্তু ওর কোনও ব্যক্তিগত জীবন আছে কিনা তা বোধহয় কেউই জানে না। রাজনীতির নেতা থেকে উপনেতা পর্যন্ত সকলেই অজিতের সময় ও স্থান নির্ঘণ্ট জানে। মুহূর্তে সংযোগ সাধনের সব প্রক্রিয়া-মাধ্যম তাদের নখদর্পণে; প্রয়োজনীয় কাজে অজিত দ্রুত এবং to the point, পরিবর্তে অজিত কখনও সখনও যে সরকারী অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্বরূপ থানায় যেতে বাধ্য হয় সে অনেকটা পদ্মপত্রে বারিবন্দুর মতোই স্থায়ী হয়ে থাকে। অলিখিত 'বদলী বা barter' পদ্ধতিতেই এটা হয়ে থাকে। নেতারা নিশ্চিন্ত হয়ে দেশোদ্ধার ব্রত পালন করতে পারেন আর অজিত নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের অর্থ-সংগ্রহ-প্রক্রিয়াগুলো লাগু করতে পারে। এটা লেনদেন না গিভ অ্যান্ড টেক তা নিয়ে অজিতের মাথাব্যথা নেই।

দুটি বিষয় নিয়ে অজিতের মনে একটা সুপ্ত বেদনা বোধ আছে। একটা লেখাপড়া অন্যটা তার মা। লেখাপড়া সে শিখতে পারে নি; শিক্ষকদের নির্দয়তা, স্নেহ-ভালবাসা-হীন যান্ত্রিকতাকে দোষ না দিয়ে সে নিজের অক্ষমতাকেই বেশি দোষ দেয়। এখন, এতদিন পরে, শৈশবের পাঠশালা দিনকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না, তাই সে তার অতৃপ্ত বাসনাটুকুকে ছোট্ট বোনটির মাধ্যমে পূরণ করে নিতে চায়। তার জন্যে একটি কমবয়সী গৃহশিক্ষিকার ব্যবস্থাও সে করে দিয়েছে। দ্বিতীয় বেদনার উৎসটি তার মা। অজিতের বাবা নেই। মা যেন কেমন শূন্য দৃষ্টি নিয়ে অজিতের দিকে তাকান। এখন তো দু'বার খাবার জন্যে ঘরে যায় মাত্র। চেলা-চামুণ্ডাদের খিদমদগারিতে র‍্যাশান-কেরোসিন-বাজার-হাট নির্বাধ সহজ। কিন্তু মায়ের মনের গভীরে অজিত যেন এক উদাসী-নারীকে দেখতে পায়। একটা বেদনা বোধ ওর অন্তর্মুখী মনের মধ্যে যেন খোঁচা মারতে থাকে।

এই দ্বিবিধ বেদনা বোধই আবার ইদানীং তীব্র হয়ে উঠেছিল। সীমাকে যে পড়াতে আসে সেই গীতা ওর নিরক্ষরতা বিষয়ে কিছুই বলে না বটে তবে মাঝে মধ্যে যে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে অজিতের অন্তর্দাহ বেড়ে যায়। মাঝে মাঝেই ওর মনে হয় সময় করে রাতের গভীরে সীমার বই-পত্র নিয়ে বসলে

কেমন হয়? স্থির করতে পারে না। আর অজিত দেখতে পেয়েছে সীমার পড়াশুনো শেষ হয়ে গেলে ওর মা আর বোন মিলে গীতাকে নিয়ে গল্প করে. আনন্দ করে, সময় কাটায় কিছুক্ষণ। কখনও তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলে এই দৃশ্য অজিতকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। গীতা চলে যায় আর মার চোখেমুখে ধীরে ধীরে অসহায়তা ফিরে আসে।

অজিতের মনের বেদনাবোধ আর 'অজার' জীবন-সংগ্রাম মিলে একটা সংঘাত কি অনিবার্য হয়ে উঠছিল? অজিত টের পায় নি। কিন্তু ওর মনে ধীরে ধীরে যেন একটা অবসন্নতা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছিল। অবসন্নতা না একটা প্রতিবাদ? নিজের বিরুদ্ধেই নিজের প্রতিবাদ? অজার বিরুদ্ধে অজিতের?

ভিতরের অন্তর্দাহ ওকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইল। অজিত কি অপরের হাতের খেলনা হয়ে গেছে? নেতাদের হাতের? চামচে·উপগ্রহের আশা আকাঙ্ক্ষার? মনেমনে ভাবল--ওর মা স্বাভাবিক, বোন স্বাভাবিক, এমনকি গীতাও তো স্বাভাবিক। ওরা প্রত্যেকেই তো স্বাধীন, কেউই তো অপরের হাতের অস্ত্র নয়। দুঃখ-বেদনা যা আছে তা ওদের নিজের নিজেরই আছে।

সকাল করে বাড়ি ফিরল। সোজা গীতাকে প্রশ্ন করল, "তুমি শিক্ষিকা? তাহলে আমাকে লেখাপড়া শেখাবে?" গীতা অবাক হয়ে তাকাল, "ভয়ে না নির্ভয়ে?" জানতে চাইল। একটু ভেবে নিয়ে অজিত বলেছিল, "নির্ভয়ে।" গীতা একবার সীমার দিকে দেখে নিয়ে বলেছিল,—"একবারও অবাধ্য হবেনা? একদিনও?" 'না'—বলে অজিত গীতার দিকে তাকিয়েছিল।

ওরা হারিয়ে গেল পরদিনই। অজাকে গীতা অজিত করে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে? অতীত কি সর্বদাই ভবিষ্যতের হত্যাকারী?

———

॥ ছিন্নকক্ষ ॥

সুপ্রশস্ত flat এর অতি উপভোগ-সমৃদ্ধ আয়োজনের মধ্যে একেবারে একা বিয়াস আজ আনমনে ইতস্তত ছড়ান ইংরেজি magazine এর একখানা তুলে নিয়ে অলস দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। আজ তার কিছুই ভাল লাগছে না। কোনও appointment নেই, কোনও তাড়া নেই। এমন নিঃস্ব-রিক্ত একটা গোটা দিন বিয়াস সাকসেনার জীবনে এর আগে কখনও আসে নি, অন্তত বিয়াস তা মনে করতে পারে না। সুদীর্ঘ অতীত সে পিছনে ফেলে এসেছে। সেই অতীতের মধ্যেও একটা প্রাথমিক, একটা মধ্য এবং একটা ইদানীং অতীতকে সে অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারে। হাতের magazine খানা তার মনোযোগ না পেয়ে কোলের উপর এলিয়ে পড়েছিল। বিয়াসের মন কোনও বিশেষ বিন্দুতে যুক্ত হতে পারছিল না, উদ্দেশ্যহীন ইতস্তত হেলেদুলে ভাসমান পালকের মত, বাতাসের অলস প্রবাহে বাহিত হবার মতো করে, সেই সুদূর অতীত থেকে যেন নেমে আসছিল বর্তমানের নিস্তরঙ্গ মৃত্তিকা জীবনে। "The pill and its effects" বিয়াসের দৃষ্টি পড়ল উজ্জ্বল ছাপা caption এর দিকে। Cover story, সালঙ্কারা পত্রিকাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে সেখানা হাতে তুলে নিল।

বিয়াসের মন শব্দটির অনুসঙ্গ বেয়ে যেন নিজে নিজেই ভেসে গেল তার প্রাথমিক অতীতে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান বিয়াস অফুরন্ত আদরযত্নে লালিত। ছাত্রী হিসেবে তার নাম ছিল স্কুলে, তার চাইতে বেশি নামডাক ছিল extra curricular activities-এ। উঁচু শ্রেণীতে ওর ঔজ্জ্বল্য অনেকেরই ঈর্ষার কারণ ছিল। ঘরের চাইতে বাইরেটা ওকে বেশি আকর্ষণ করত। কারণও ছিল। ওর বাবা সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী। Export import এর বিশ্বব্যাপী যোগাযোগে তিনি বেশিরভাগ সময় কাটাতেন plane-এ এবং দেশ বিদেশের হোটেলে। গৃহেব অবস্থান সময় ছিল অত্যন্ত কৃপণের মতোই সীমিত। বিয়াস যখন বড় হয়ে উঠছে, জীবনকে বোঝার মতো যখন তার মনে বহু প্রশ্ন ভিড় করে উম্মনা করে তুলছে তখন সে বাবাকেও কাছে পায় নি, মাকেও নয়। তার মা স্বীকৃত সমাজ-কর্মী। কোনও সংস্থায় তিনি সভাপত্নী

কোথাও সম্পাদিকা কোথায়ও বা Treasurer বিয়াসের. সেই প্রাথমিক অতীতে একাকিত্বও যেমন ছিল তার নিজস্ব, তার স্বাধীনতাও ছিল তেমনি একান্ত। পড়ার বই-এর চাইতে আলমারি ঠাসা বাইরের বই, class note এর চাইতে magazine periodicals তাকে মুক্তির পথ করে দিয়েছিল।

এই সময়ে মনে মনে পশ্চিম-আকাশের জীবন চেতনা, জীবন-সমস্যা এবং সে সবের সমাধান সূত্রগুলো বিয়াসের পুঁথিগত জানা হয়ে গেল। তার আগে স্কুল জীবনের কোনও কোনও একান্ত নৈকট্যে, সে যৌন চেতনা, উপায় এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সহপাঠিনীদের কাছে কিছু কিছু জেনেছে, আভাস পেয়েছে, উত্তেজিত বোধ করেছে। তার অনুসন্ধিৎসু মন তাকে ক্ষুধার্ত করে তুলেছে। আর তখনই তার মনে হয়েছে আরও তথ্য চাই, পরিসংখ্যান চাই, সত্যকে বিধিগত করে জানা চাই। তার অন্তরের মধ্য থেকে একটা গোটা eve প্রকাশের পাখাঝাপটানিতে তাকে যেন প্রতিনিয়ত tease করে চলেছে। তার দৃষ্টিতে এখন বর্ণালির ছটা, অন্তরে adam এর আকর্ষণ, আর হৃদয়ে একাকিত্ব মুক্তির জন্যে বন্ধু অন্বেষণ যেন কিশলয় থেকে পত্র-পল্লবের ঘন সবুজকে খুঁজে পায়। মা-বাবার জীবনে সে যেন এখন কাজের বাইরে একটা প্রাণের স্বাভাবিক টানকে দেখতে পায়। একান্ত পরামর্শের, আলোচনার আর বিচার বিবেচনার জন্যে মাঝে মাঝে মায়ের গৃহ অধিবেশন-গুলো এখন বিয়াসের মনে হয়, অকারণ রাতের গভীরতাকে আবাহন করে। পিতার দীর্ঘ অনুপস্থিতি কেন যে মায়ের মনে বিরহের বেদনাকে অসহনীয় করে তোলে না তা যেন magazine এর তথ্য আর পরিসংখ্যান স-মূলে ব্যাখ্যা করতে পারে। গৃহে সব ব্যবস্থা পরিপাটি থাকা সত্ত্বেও কেন তার বাবা ডিনার করে গভীররাতে হোটেল থেকে ফেরেন, কখনও ফেরেনই না, সে বিষয়ে বিয়াস এখন আর আগের মতো সহজ ব্যাখ্যাকে সকল ব্যাখ্যা বলে মেনে নিতে পারে না।

বিয়াস একটা বিষয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করে। তার মা-বাবার মধ্যে ভদ্রতার কখনও ঘাটতি পড়ে না। অন্যান্যদের, বন্ধুবান্ধবীদের কাছে এখন অনেক তথ্য ও কাহিনী বিয়াসের জানা। মায়েদের বন্ধু-বান্ধব এবং বাবাদের সঙ্গিনী-বান্ধবীদের আনাগোনার অগুণতি তথ্য এবং একই শয়ন-কক্ষের দিনান্ত পরিশীলিত (?) নিশান্ত ভিন্ন ব্যবহারের কাহিনী পরিশীলিত

ফিস্‌ফিসানির গভীর কণ্ঠে আর অন্তরের ভিসুভিয়াসতুল্য হিস্‌হিসানির অগ্নুদ্গারে বিয়াসের জানা।

প্রাথমিক অতীত ছেড়ে বিয়াস মধ্য অতীতে চোখ ফেরায়। শ্রীবাস তার জীবনের এই মধ্য জীবনের একটি অনাস্বাদিত পূর্ব, এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। শ্রীবাস মালহোত্রা। পরিচয়টাও যেমন হঠাৎ আবিষ্কারটিও তেমনি অকস্মাৎ ঘটেছিল। Co-education college এর notice board এর সামনে স্বল্প-ভিড়। বিলম্বে পৌঁছে বিয়াস একটু তাড়াহুড়ো করে বোর্ডের সামনে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। রুটিনটা টুকে নিয়েই class-এ যাবে। Routine টুকে নিয়ে তখনই ঋজুদেহী ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটি ছোট্ট সংঘাত! শ্রীবাস লজ্জিত হয়ে হাত জোড় করে যেন নমস্কারের ভঙ্গিতে একাগ্র করে বলেছিল —"sorry !" বিয়াস একটু অপ্রস্তুত বোধ করেছিল ছেলেটির ভঙ্গিটি দেখে। বলেছিল—'thats ok !' তখনও বিয়াস নাম জানে না, জানে না কি বিষয় নিয়ে ছেলেটি ভর্তি হয়েছে। College Libraryতে বই খোঁজার অবকাশে ওদের পরিচয়। শ্রীবাসের দর্শনে অনার্স, বিয়াসের ইংরেজি সাহিত্যে। সামান্য যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু বিয়াসের মনে শ্রীবাসের প্রতিটি কথাই যেন গভীর করে ধরা পড়ছিল। কিছু না ভেবেই, যেন কথা বলাটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যেই বিয়াস প্রশ্ন করেছিল, "আপনি দর্শন নিলেন কেন ?" শ্রীবাস বিয়াসের চোখের তারায় কিছু যেন খুঁজল তারপরে ধীরে ধীরে বেশ যেন মেপে মেপে বলল, "পশ্চিম আমাদের পূর্বকে আক্রমণ করে চলেছে দীর্ঘদিন। সকলেই Alexander এর পোষাকে-পেখমে, স্বপ্রকাশ শৌর্যে বীর্যে এবং সম্পদ সম্পন্নতার কাছে নত নেত্র নত-শির মান্যতায় গৃহত্যাগ করে চলেছি। আমার বাসনা সেই ত্যক্ত গৃহের সহস্র বছরের পুঞ্জীভূত দীনতা-কে জানা অথবা সেই পুঞ্জীভূত শূন্যতার মধ্যে যদি কোন হাহাকার থাকে তাকে বোঝা ; পাঁচহাজার বছরের সত্য ও শক্তি কেন নিজেকে দু'শো বছর ধরে রাখতে পারে না তার কারণ জানা আমার একান্ত ইচ্ছা।

সেদিন বিয়াস বার বারই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, বার বারই শ্রীবাসের কথাগুলো ওর মনে জলতরঙ্গের মতো ধ্বনিময় হয়ে ওকে অবগাহন করিয়েছে। গৃহে ফিরে ওর আর আজ যেন একা বোধ হয় নি, একটা নোতুন দিগন্ত যেন ঊষার মৃদু আলোকে বিয়াসের মনের কূলে উপকূলে উদ্ভাসিত হতে চাইছিল।

তাকে নিয়ে সে বিভোর হয়ে রইল। পূর্বদেশীয় শান্ত ঐশ্বর্যের বিষয়ে একটা আগ্রহ যেন শ্রীবাসকে ঘিরে ঘূরপাক খেতে লাগল।

বিয়াসের মনের গতিপথটি হঠাৎই পশ্চিম মুখীতা ছেড়ে পূর্বমুখী গতি পেল। সব ফাঁকা সময় ও এখন শ্রীবাসকে দিয়ে ভরাট করে তুলতে চায়। কথা ব'লে অসীম তৃপ্তি পায়। বিয়াসের মনে একটা প্রত্যয় যেন দীপ শিখার মতো উজ্জ্বল আলো দেয়। ইংরেজি সাহিত্যকে বিয়াস এখন মন থেকে 'সম্মানের' প্রয়োজনে পড়ে ; শ্রীবাসের দেওয়া দর্শনের বইগুলোকে সে অন্তরের আকর্ষণে অধ্যয়ন করে।

বিয়াসের এই দিক পরিবর্তন ওর মায়ের চোখে পড়ল দু'চার দিন যেতে না যেতেই। বিলেতী ম্যাগাজিনগুলো এখন সব shelf-এ স্থান পেয়েছে, অপ্রত্যাশিত সময়েও বিয়াসকে study-তে একাগ্র দেখা যায়। কর্মব্যস্ত জীবনে ওর মা যদিও খুবই কম খোঁজ রাখেন মেয়ের তবুও বিয়াস যে আগের মতো নেই তা তাঁরও বুঝতে দেরি হয় না। ঘরে আর আগের মতো western music বাজে না, বিয়াস আর আগের মতো নিজেকে নিয়ে তন্ময়ও হয় না। মা তাকে অনেক আগে থেকেই, সময় মতোই, schooling করতে শুরু করে-ছিলেন। Friends party society ; manners formality etiquette নানা বিষয়ে বিয়াসকে অবহিত করানো মায়ের কর্তব্য বলেই তা সব মনোযোগ দিয়েই করেছেন। Dating pill protection-ও বাদ যায় নি। মেলামেশা করা, friendship আর partnership যে এক ব্যাপার নয় সে বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়েছেন, কিন্তু কিছুদিন যাবত তিনি যেন বিয়াসকে ঠিক তেমন করে চিনতে পারছেন না। তার নিজের সময় নেই, fast life ; কিন্তু মায়ের মন আর চোখ তো মেয়েকে দূর থেকে দেখলেই চিনতে পারার কথা? এতোদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন বিয়াস সময়মতো যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে বলে। বিয়াসের এখনকার এই অন্তর্মুখী অবস্থান দেখে তিনি তাই একদিন প্রশ্ন করলেন জীবনটা উপভোগের, তপস্যার নয়। আমরা তোমাকে সবই দিয়েছি, সবই দেবো। তোমার যখন চনমনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময় তখন কেন তুমি বাইরেটা ত্যাগ করে নিজের ভিতরে বন্ধ হয়ে আছ?

ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে দাঁড়ানো মায়ের দিকে অনেকটা বিয়াস একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার পরে খুবই ধীরে ধীরে বলেছিল ভোগের জীবন আমি দেখেছি,

জেনেছিও। তপস্যার জীবন আমি দেখিনি, জানার চেষ্টা করছি মাত্র। তোমরা অবশ্যই আমাকে সব দিয়েছো, আমাদের সমাজে যাকে 'সব' বলে তার কোনও অভাবই আমার নেই, বরং সুযোগ আছে অনেক বেশি। Pill থেকে swinging পর্যন্ত জীবন বিষয়েও পঠিত তথ্য আর পরিসংখ্যান-সত্য অধিগত হয়েছে, তোমরা সে সুযোগও দিয়েছো magazine periodicals ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু…' বিয়াস থেমে গেছিল। "কিন্তু কি? বল?" মা ওর কাঁধে হাত রেখে মেয়ের কষ্টের বিষয়, পরিবর্তনের কারণ জানার জন্য ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। "তুমি বুঝবে না, তোমাকে বোঝাতে পারব না এখন। সময় হলে তোমাকে বলব, যদি সেই সময় কখনও আসে।" বলেছিল বিয়াস। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা চলে গেছিলেন সেদিন। "কি জানি তোকে যেন আর চিনতে পারছি না এখন!" যেতে যেতে যেন নিজে নিজেই কথাগুলি বলে গেলেন।

তার পরেই বিয়াসের ইদানীং অতীত যেন ওর চোখের সামনে এসে ভেসে উঠলো, শ্রীবাসের সঙ্গে ওর পরিচয় নিকট থেকে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সেই ঘনিষ্ঠতা কখনও তাপের সৃষ্টি করে নি, আলো দিয়েছে। পূর্বদিগন্তের ঊষা ধীরে ধীরে ওর magazine periodicals এর তথ্য আর পরিসংখ্যানকে রক্তের প্রবাহ থেকে মস্তিষ্কের কোষে স্থানান্তরিত করেছে।

জীবন যে শুধুমাত্র পার্থিব ভোগের চৌহদ্দিতে সত্য নয়, মূল্যবোধের অনুসরণের অসীমতায় সমৃদ্ধ, জীবন যে মাত্র ইন্দ্রিয়সুখের means নয়, হৃদয়ানুভবের end-এ দিক-নিষ্ঠ, গতানুগতিকের স্রোতে না ভেসে গিয়ে কোথায়ও কোনও উত্তরণের জাগ্রত চেতনাই যে জীবন তা এখন বিয়াস জেনেছে।

শ্রীবাস এখন এক নামকরা কলেজ-এর তন্ময় অধ্যাপক। বিয়াসের জীবনে সেই দূর থেকেও শ্রীবাস আলো দেয়, পথ দেখায়। এদিকে গৃহে বিয়াসের মা-বাবা দীর্ঘজীবনের সংগ্রাম-প্রাপ্তি ভোগের উপান্তে পৌঁছে আশাহীন অক্ষমতাকে ভবিষ্য করে অবসর জীবনে প্রবেশ করেছেন। মেয়ে স্বাধীন, স্বাধীন জীবন-বোধ ও জীবন-যাপনের নির্দেশ-উপদেশ তাঁরা দিয়েছেন। মেয়েকে ঘিরে তাঁদের ভাবনা আছে কিন্তু কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

বিয়াস প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে। তার সুদূর অতীত তার অস্তিত্বের

মধ্যে পশ্চিমের কৃষ্টি-সভ্যতা-ভোগবাদের ডাক দেয়; তার মধ্য-অতীত তার মনে পূর্বদিগন্তের আলোর আহ্বান বয়ে আনে। তার বর্তমান অতীত তাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। তার কোনও সমস্যা থাকত না যদি শ্রীবাস তার জীবনের কক্ষপথে উপস্থিত না হত; যেমন তার মা-বাবার জীবনে, এবং আরও অনেকের জীবনেই, কোনও সমস্যা আসে নি কারণ সেখানে কোনও শ্রীবাস তাদের কক্ষপথকে কেন্দ্রাতিগ টানে নি। বিয়াসের অতীতের জোর আছে, শক্তি আছে কিন্তু সেই অতীত তাকে সম্ভাব্য তৃপ্তির দিশা দেয় না; বিয়াসের বর্তমানের দিশা আছে কিন্তু নিজের মধ্যে শক্তির উৎসটিকে সে খুঁজে পায় না। শ্রীবাস তার বর্তমান জীবনের গোমুখ, মূল্যবোধের উৎস, প্রবাহের প্রেরণা। সেই প্রেরণার প্রাণবন্ত উপস্থিতিটি হারিয়ে গিয়ে বিয়াসের পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বটি যেন তার উপলব্ধির যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

বিয়াস অনেক ভেবে তাই শ্রীবাসকেই একটা চিঠি লেখা স্থির করল। কিন্তু কি লিখবে সে? জন্মাবধি প্রাপ্ত হরমোন-পিল-প্রতিরক্ষা জীবনের দেহগত ভোগ-গতি জীবন বৃত্ত থেকে যে মূল্যবোধের উপলব্ধির পিল মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের অনুভবে অনুভবে ছড়িয়ে দিয়ে শ্রীবাস তার জীবনকে প্রকৃতিনির্দেশিত কক্ষপথ থেকে সরিয়ে আনল, সে কি জীবন যন্ত্রণায় অবসন্ন হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার জন্যে? সে কি জানতে চাইবে সমস্যার যে স্রষ্টা, শ্রীবাস নিজেই, তার সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে বিয়াসকে সাহায্য-সহায়তা দিতে পারে কি না?

— — —

।। চার চিত্র ।।

এক : রাজেন্দ্রলাল

রাজেনবাবুকে আমি ভুলতে পারি নি। রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী। তাঁকে প্রথম দেখি আমার বয়ঃসন্ধিকালে। সেও তো হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ বছর। যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখনই তিনি বৃদ্ধ; আমার বর্তমানের চাইতেও অনেক বেশি ছিল তার বয়স। ষাটোর্ধ্ব। তাঁকে তখনই দেখাতো পঁয়ষট্টি-সত্তরের মতো। তিনি তখন প্রকৃত অর্থেই 'তেমাথা'। মাটির দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়েই বেশি সময় কাটাতেন। বসার জন্যে কখনও ছোট্ট একটা কাঠের পিঁড়ি টেনে নিতেন, কখনও বা তাও নিতেন না। হাঁটু দুটি কানের দু'পাশ দিয়ে মাথার দু'পাশে দুটি মুণ্ড হয়ে যেন মাথাটাকেই ধরে রাখত। শরীরের সঙ্গে লেপটে থেকে, চেপে ধরে, যেন পতন থেকে দেহখানিকে রক্ষা করত। পায়ের পাতা দুটো অস্বাভাবিক দীর্ঘ এবং চওড়া দেখাত। একগাছা লাঠি কখনও হাতের থাবায় নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন, কখনও পাশে আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি শুইয়ে রেখে দিতেন। সদাসর্বদাই তাঁর চোখেমুখে বিরক্তির প্রকাশ দেখেছি। কথা 'বলতে' প্রায় কখনই শুনি নি তবে এক-অক্ষর শব্দগুলো মাঝে-মধ্যেই ধ্বনি-বুলেট হয়ে তাঁর ভারি কণ্ঠ থেকে ছিটকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে 'দেখেছি'। সেই-সব শব্দ-ব্রহ্ম তীক্ষ্ণ-ধ্বনি হয়ে যখন ছিট্‌কাতো তখন, প্রথম প্রথম, হকচকিয়ে যেতাম। রাজেন বাবুর মনের গভীরে যে একটা জ্বালামুখী সর্বদাই টগবগ ফুটছে তা আন্দাজ করতে পারতাম। তাই তাঁর কণ্ঠে আগুন ছড়াতো, লাভা ছিটকাতো। তাঁর মনে নিশ্চয়ই ভাষাহীন যন্ত্রণারা তাঁকে ছিন্নভিন্ন করতো, তাই তিনি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেতেন না, ধ্বনির সাহায্য নিতেন।

প্রথম প্রথম ভয় পেয়েছি, আঁতকে উঠেছি। ফিসফিস করে দিদিকে প্রশ্ন করেছি, জ্যেঠিমার ধার ঘেঁষে বসে তাঁর মৃদু-মৃদু হাসি দেখে ভয় কেটেছে। মহেশ্বরপাশার সেই আম-জাম-কয়েদবেলের ঘন ছায়ার নিচে আমার তরুণ বয়সের বেশ কয়েকটা মাস কেটেছে। দিদির শ্বশুর বাড়ি। ম্যাট্রিক পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্যে দৌলতপুরের আশ্রয় নেওয়াই ঠিক হয়েছিল। কারণ

অবশ্যই দিদি-দাদাবাবুর ইচ্ছা এবং আগ্রহ। ওদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথেই দৌলতপুর কলেজ এবং ছবিআঁকা শেখার স্কুল। ট্রেনে খুলনা শহরও অত্যন্ত কাছে। তাছাড়া পিচ-ঢাকা ইঁটে-মোড়া কলকাতার চাইতে আমার বুনো জংলী স্বভাব যে মহেশ্বরপাশার গ্রাম্য-সবুজে আর খুবই কাছের প্রশস্ত প্রবাহিনী নদীর ধারে ধারে সহজ বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে তা হয়তো আমার মা-বাবার বিচারের মধ্যে ছিল। এবং অবশ্যই, কঠোর অভিভাবক সবসময়েই যে আমার জন্যে প্রয়োজন তা আমার মা অত্যন্ত ভাল করেই জানতেন; দিদির তুল্য কঠোর-কঠিন অভিভাবক তখন স্বজন পরিজনের মধ্যে আর দ্বিতীয়টি মার চোখে পড়ে নি। তাছাড়া, উপরন্তু পাওনা হিসেবে দিদির শ্বশুরমশাই ছিলেন। নিষ্করুণ খোদাইকরের হাতে অপর্যাপ্ত কাটাই-ছাঁটাই করে মসিকৃষ্ণ গ্রানাইট পাথরের সেই ছ'ফুটের বেশি দীর্ঘ দেহ-খানির মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন স্নেহ-মমতার সে স্থান ছিল না তা তাঁর চোখের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যেতো। ধীরগতি চলতেন, শব্দহীন বিড়াল-পায়ে নজর রাখতেন আর, বোধহয় বয়সের ভারেই, বায়সের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চারপাশের সবকিছুকেই দেখতেন। মিতব্যয়িতা তাঁর শরীরেও যেমন, মনেও তেমনি প্রধান গুণ হয়ে প্রকাশ পেত। সে ছিল তাঁর প্রকৃতি থেকেই পাওয়া; নিজের স্বভাবে তিনি কৃপণতাকে অত্যন্ত যত্নে ধরে রাখতেন। চলনে, বলনে, সংসার পালনে এবং অবশ্যই তাঁর অত্যন্ত পুঁজি স্নেহ-ভালবাসার খরচে!

রাজেন বাবুরা দুইভাই ছিলেন। রাজেনবাবু আর ব্রজেনবাবু। রাজেন বাবুর দুই বিয়ে এবং প্রথম পক্ষের এক সন্তান, অমলবাবু। দ্বিতীয় পক্ষ নিঃসন্তান ছিলেন। বড় জন ছিলেন বড়-জ্যেঠিমা, ছোট জনকে বলতাম জ্যেঠিমা। যে কারিগর ছোটকর্তা ব্রজেন বাবুকে তৈরি করেছিলেন সেই তিনিই বোধহয় একই ধাতুতে, একই নিয়মে, এবং একই প্রকৃতিতে বড় জ্যেঠিমাকে গড়ে থাকবেন! ঠিকানা আলাদা আলাদা হয়ে জন্ম নিলে কি হবে অদৃষ্ট ওঁদের দু'জনকে আবার প্রথম সুযোগেই কাছাকাছি, একেবারে একই পরিবারে জুড়ে দিয়ে থাকবে। শরীর-মনের গঠনে দেওর-বৌদি হয়ে ওঁরা একই বৃত্তের মধ্যে জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে গেছিলেন। ওদিকে ব্রজেনবাবুর স্ত্রী তিনটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাসন্তান উপহার দিয়ে

ব্রজেনবাবুর কাছ থেকে বেশ আগেই চিরতরে ছুটি নিয়ে বসলেন। কেন, কখন এবং কিভাবে তা আমার তখনও জানা হয়নি, এখনও বলতে পারব না। তবে এখন এই এতোদিন পরে, জীবনের জাল-জটিলতা দেখে দেখে আর জ্বালা যন্ত্রণা বুঝে বুঝে, মনে হয় ব্রজেন্দ্র-মহিলার চিরগমনের সঙ্গে রাজেন বাবুর লাভা-উদ্গীরণের বোধহয় কোনও নিকট অথবা দূর সম্পর্ক ছিল।

রাজেন বাবুর বিষয়ে আমার জানা যত কম অনুমান ততই বেশি। তিনি গত শতাব্দীর মানুষ। ছ'ফুট দু'তিন ইঞ্চির গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহখানির মধ্যে রাজেন বাবু একটা অত্যন্ত তেজী মনের তরুণ ছিলেন। স্কুলে তাঁর ধীশক্তির প্রকাশ শিক্ষকদের ভালবাসা আদায় করে নিত, আর খেলার মাঠে, শরীর চর্চার আখড়ায় এবং ছাত্রসমাজে তাঁর দৃঢ়-সক্ষম-নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী রাজনীতির এলাকায় আলোচিত হত। তাই রাজেন বাবু বেশিদিন সমাজ-রাষ্ট্র-দেশ চেতনার বাইরে থাকতে পারেন নি। স্বাধীনতার তৎকালীন মহাযজ্ঞে তিনি আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠতে দেরি করেন নি।

কিন্তু এই জ্বলে ওঠার আগেই তিনি মা-বাবার পীড়াপীড়িতে একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হলেন। বড় জ্যেঠিমা সেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শ্বশুর-শাশুড়ীর ইচ্ছা হয়ে চক্রবর্তী-পরিবারে স্থান করে নেন। রাজেন বাবুর জীবন অনুশীলন সমিতির টানে আর স্বাধীনতার ব্রতে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশই গতি পেতে থাকে, শক্তি সংগ্রহ করে আর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাই জেলের অভ্যন্তরে আর দেশজননীর অন্তরে দ্বিধা বিভক্ত সময় কাটাতে বাধ্য হয়ে পড়েন। তার পরে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং তারপরে, তারও পরে দেশোদ্ধারের শত কর্মে সহস্র সংঘর্ষে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

ছোট ভাই ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু শৈশববাল্যকাল থেকেই হিসেবী। রাজেন্দ্রের বিপরীত : তিনি পা মেপে মেপে পথ চলেন, হিসেব করে পথ স্থির করেন। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে কলেজের পাঠ নেন। গৃহের অভ্যন্তর তাঁর কাছে মাঠের খোলামেলার চাইতে অনেক বেশি প্রিয়। বিশেষ করে সেই ঘরে প্রায় সমবয়সী প্রাণ চঞ্চল তাঁর বৌদিটি তাঁর ঘরের চারদেয়ালের মধ্যেই মনের মহাকাশে নীলের ছোঁয়া এনে দিতে পারেন। পড়াশুনোর মধ্যেমধ্যেই তিনি জীবনের ছোঁয়া পান, বিকেলের আলো-আঁধারিতে তিনি প্রাণের নৈকট্য

অন্বেষণ করেন আর গ্রাম্য রাত্রির মৃদু আলোর তীব্র দ্যুতিকে আক্রমণ করার বাসনায় প্রহর গোনেন।

রাজেন্দ্র ঘরের টানকে উপেক্ষা করে দেশের আকর্ষণকেই বড় করে তোলেন; ব্রজেন্দ্র বাইরের জীবনকে ছোট করে ঘরের জীবনকেই বড় করে নেন। তার পরে একদিন রাজেন্দ্র জীবনের দ্বিপ্রহরকে দেশের কাজে আহুতি দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন; আর ব্রজেন্দ্র প্রথম প্রহর শেষ হতে না হতেই সরকারী চাকরি নিয়ে বি-দেশে চলে যান—চলে যান দেশের, বাংলাদেশের বাইরে, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে।

জীবনকে যেখানে রেখে দেশের কাজে বেরিয়েছিলেন রাজেনবাবু ফিরে এসে আর সেখানে খুঁজে পেলেন না। ততদিনে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। শিশু অমলের দেবকান্তি দেহখানির দিকে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে পুত্রকে আদর করার চাইতে রাজেনবাবু সময়ের অঙ্ক কষতে বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলেন। রাজেনবাবু মাঝে-মধ্যেই ফাঁকে-ফোঁকরে নিজের গ্রামে, স্বগৃহে আসাযাওয়া করেছেন। আবার দীর্ঘ অনুপস্থিতিও ঘটেছে একাধিক। তাই মনের সন্দেহ তাঁকে অঙ্ক কষতে প্রবৃত্ত করে, আর যত অঙ্ক করেন ততই যেন সন্দেহ বাড়ে। সংশয় আশংকা বাড়িয়ে তোলে, আশংকা আরো সংশয়ের জন্ম দেয়। ক্রমশ এমন অবস্থা এলো যে রাজেন বাবু স্ত্রীর নৈকট্য একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, নিজে একা একঘরে থাকেন এবং সন্তানসহ স্ত্রীকে অন্য ঘরে আলাদা চালার নিচে চালান করে দেন। সম্পর্কছেদ করে দিয়ে নিজের মনের গভীরে সংশয়ের শ্বাপদ-হিংস্র নখ-দন্তসমূহকে অবাধ স্বাধীন বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে থাকেন। নিজের মনের সন্দেহ-অস্বস্তি ঘৃণার জন্ম দেয়, ঘৃণা ধিক্কারের আর সেই ধিক্কার অন্তর্মুখী হয়ে জ্বালাময়ী এক অগ্নিকুণ্ডের আগ্নেয়গিরি তৈরি করে ফেলে।

রাজেন বাবুর মা-বাবা চলে গেলেন সময়ের একটু আগেই। সাংসারিক অশান্তি আর যন্ত্রণার আগুনে পুড়েই কি? সে কথা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে একথা জেনেছি যে রাজেনবাবু অচিরেই এক অনাথা পরিচিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী করে ঘরে এনেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে গ্রামেরই একপ্রান্তের একটি একান্ত পরিবারের সাহায্য তিনি অনেকবারই নিয়েছেন, পেয়েছেন। সেখানেই পরিচয়।

সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে 'জ্যেঠিমা' জ্যেঠিমা হয়ে চক্রবর্তী পরিবারে এসে গেলেন। অত্যন্ত নম্র স্বভাবের এই মহিলাটিকে ঘরে এনে রাজেন বাবুর জ্বালা-যন্ত্রণা কতোটা কমেছিল তা না জানলেও এটা জানতাম যে জ্যেঠিমা তাঁর নির্বাক স্পর্শে চক্রবর্তী পরিবারে একটা শান্ত-সহনীয় বাতাস বইয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর চলনে বলনে স্বভাবে এমন একটা দৃঢ়তা সদাসর্বদা স্থির বাসা বেঁধে ছিল যে সকলেই, এমনকি যুযুধান রাজেন বাবু এবং কর্কশকণ্ঠী বড় জ্যেঠিমা পর্যন্ত, তাঁকে সমীহ না করে পারতেন না। কাউকে কিছু না বলেও যে তিনি শুধুমাত্র তাঁর চোখের দৃষ্টি দিয়েই সকলকে শাসন করতে জানতেন, চুপ করিয়ে দিতে পারতেন তা অতদিন পরেও আমার অনুভবে সত্য ছিল।

রাজেন বাবুর সব দাপাদাপি, হাঁকডাক, তর্জনগর্জন তাই আর দাওয়া পার হয়ে উঠোনে পৌঁছোতে পারত না, অন্য দাওয়া পর্যন্ত ধাওয়া করা তো দূরের কথা! তাই তাঁকে আমি যখন দেখেছি তখন সিংহের মতো দাওয়ায় বসে গজরাতে দেখেছি. মনের গভীরের ফুটন্ত লাভাকে ছিটকে ছিটকে বাইরে আসতে দেখেছি। তার বেশি তাঁর পক্ষেও আর সম্ভব ছিল না, কারণ জ্যেঠিমার গণ্ডি কাটা ছিল।

রাজেনবাবুর ছেলে অমল চাকরি করত। রাজেন বাবু কিন্তু ছেলের অন্ন গ্রহণ করেন নি। বড় জ্যেঠিমা আর অমল মিলে ছিল এক সংসার, সে সংসারে রাজেন বাবুর সদাবিচ্ছুরিত অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই দেবার ছিল না। আর তাদেরও এই বৃদ্ধকে দেবার মতো কোনও ভালবাসা কোনও অনুকম্পা অবশিষ্ট ছিল কি ?

জ্যেঠিমা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। সন্তানাধিক আদর করতেন। জ্যেঠিমার কোনও সন্তান হয় নি। আমি যখন দেখেছি তখন জ্যেঠিমা একাধারে জননী-জায়া-কন্যা রূপে রাজেনবাবুর সেবা করতেন। এবং শাসন অবশ্যই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুর বিরুদ্ধেই রাজেনবাবুর অসহ্য বিরক্তি ছিল, ছিল ঘৃণা, ছিল অসহিষ্ণুতা-বিদ্বেষ-অসূয়া। একমাত্র জ্যেঠিমাই ছিলেন আগুনে জলেরছিটের মতো। অনেকবারই অলক্ষ্যে দেখেছি। দাওয়ায় বসে অনেকক্ষণ ধিকিধিকি জ্বলে জ্বলে রাজেন বাবু নিজের হৃদয়ের আগ্নেয় তাপে হঠাৎ হঠাৎ লাভা-নিক্ষেপে বিস্ফোরক হয়ে উঠতেন। তখন যদি

রান্নাঘরের দাওয়া ছেড়ে জ্যেঠিমা বাইরে আসতেন, অথবা বাগান থেকে উঠোনে, রাজেনবাবু তৎক্ষণাৎ কেমন যেন ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবেই মিইয়ে যেতেন, একেবারেই থেমে যেতেন।

ব্রজেন্দ্র-কে যে রাজেনবাবু সহ্য করতে পারতেন না তা জানতাম। কিন্তু কেন পারতেন না তা বোঝার মতো বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা কোনওটাই তখন ছিল না। দু'ভাই-এর মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক বিষয়ে মনে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু দিদির কাছে জানতে গিয়ে বকুনি ছাড়া অন্য কিছুই জোটে নি; জ্যেঠিমাকে প্রশ্ন করে শুধুমাত্র লাভ হয়েছে শতবার পাওয়া মিষ্টি হাসির সঙ্গে আর একটি মৃদু-হাসি। বড় হলে যে বুঝতে পারব সে আশ্বাস টুকু কতো সহজেই সেই হাসির সঙ্গে আমার মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তিনি। তাই আমিও বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাকেই অনেক অন্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও মেনে নিয়েছি সেই জ্যেঠিমার পরামর্শেই।

অনেক অনেক বছর পরের কথা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিভক্ত হয়েছে এবং তছনছ হয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেছে। ব্রজেন্দ্র বাবু 'সপরিবারে' দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। দিদি স্বামীর সঙ্গে তাঁর চাকুরিস্থলে বাসা বেঁধেছেন। ঝরা পাতার মতো শতসহস্রের দলে ভিড়ে আমরাও জমি খুঁজে পেয়েছি। রাজেনবাবু কিন্তু দেশ ছাড়া হতে চান নি। বড় জ্যেঠিমা তাঁর ছেলে নিয়ে বনগাঁ-এর কাছে কোথায় ঘর বেঁধেছেন। জ্যেঠিমা এক-প্রাণ এক-মন হয়ে অতি-বৃদ্ধ রাজেনবাবুর পাশে থেকে গেছেন গ্রামের সেই আমজামকাঁঠাল কয়েদ বেলের ছায়ার নিচে, মাটির ঘরে।

শেষজীবনে, দিদির কাছে শুনেছি, রাজেন বাবু আর লাভা উদ্গার করতেন না। করতে পারতেন না বলে করতেন না, না জ্যেঠিমা তাঁকে শান্ত করতে পেরেছিলেন তা আমার জানা হয় নি। দর্শনে-বিজ্ঞানে সংশয় আকাঙ্ক্ষিত; জীবনে সেই সংশয়ই অনেকাংশে অনিবার্য কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত নয়। আর যে সংশয় নিয়ে রাজেনবাবু জীবনের দ্বিপ্রহর থেকে শেষ প্রহর পর্যন্ত প্রতিনিয়ত জ্বলে পুড়ে ছাই হতে হতেও বেঁচে রইলেন, যে অসহিষ্ণু ধিককার সকাল-দুপুর-রাত্রি তাঁর অন্তরের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস হয়ে হয়ে তাঁকে নিঃস্ব-রিক্ত করে দিল কিন্তু মৃত-অতীত করে দিতে পারল না, সেই সংশয়ের কতোটা তাঁর নিজের সৃষ্টি আর কতোটার জন্যে বড়-জ্যেঠিমা দায়ী

তা আমাকে কে বলে দেবে? জ্যোঠিমার পেলব হাতের প্রীতির ছোঁয়ায় রাজেন বাবু কি শেষ পর্যন্ত শান্ত হতে পেরেছিলেন? নিঃসংশয়?

দুই : চারুলতা

একান্তে বসে চারুলতা নিজের কপালে করাঘাত করেন আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকেন। একটা এতো বড় দীর্ঘ জীবনে সুখ বলে চারুলতা প্রায় কিছুই পেলেন না। ছোট বেলার খেলাঘরের ক'একটি বছর আর বিয়ের পর পর ক'একটি মাস তাঁর জীবনের ছোট্ট দু'টি মরূদ্যান। বাকি সবটাই আ-বার্ধক্য মরুভূমি। চারুলতার স্বামী আছেন, কিন্তু তিনি চারুলতার জীবন থেকে অনেক দিনই দূরে সরে আছেন। পুত্রের সংসারে সারাজীবন কাটালেন কিন্তু পুত্রের ভক্তি-ভালবাসা পেলেন না। পুত্রবধূ ঘরে আনলেন। অনেক দেখেশুনে অনেক আশা বুকে নিয়ে। সেই পুত্র-বধূও কিছু দিন যেতে-না যেতেই কেমন যেন পুত্র সর্বস্ব হয়ে গেল। সারাজীবন অপরের কাছে বোঝা হয়ে হয়ে এখন চারুলতা নিজের কাছে নিজের বোঝা হয়ে উঠেছেন।

অথচ এমন হবার কথা ছিল না। স্মরণকে চারুলতা সুদূর অতীতে ঠেলে নিয়ে যান। মা-বাবার সংসারে একভাই আর চার বোনের গ্রাম্য জীবন। সম্পদের সম্পন্নতা না থাকলেও অনটনের টানাটানি ছিল না। পুজো-আচ্চা করে বাবা যা সংগ্রহ করতেন তার সঙ্গে দেবোত্তর জমির ধান-পান ডাল-কলাই মিলিয়ে আর ঘরের পাশের জমিতে লাউ-কুমড়ো, শাক-পাতা আর কলাটা মুলোটা মিলিয়ে সংসারের চাকাটা কখনই তো থেমে যাবার মতো হয় নি। গাছের তলায় পাকা ফলের খোঁজে, মাঠে-বাটে শাকপাতা খুঁটে খুঁটে আর গোবরের সন্ধান করে করে চারুলতার আর পাঠশালা যাবার সময় হয়ে উঠলো না! যজমান বাড়ি যাতায়াতের সুবাদে মহেশ্বরপাশার এক সম্ভ্রান্ত চক্রবর্তী পরিবারে চারুলতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। ছেলে সুপুরুষ, মেধাবী এবং রাজনীতি করে। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী। শুনে চারুলতার খুবই ভাল লেগেছিল। নিজে সে ভীষণ কালো, তার উপর স্বাস্থ্যের অভাব চারুলতাকে অপেক্ষিত কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত করেই রেখেছিল। কিন্তু ছেলেটির, রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর, পিতার বড় সাধ কালো মেয়ে ঘরে আনবেন। কালো

নাকি জগতের আলো। ফর্সা-সুন্দরী মেয়ে এনে তাঁদের সদ্য পূর্বপুরুষে অঘটন ঘটে গেছে! তাই কালো মেয়ে তাদের চাই।

বিয়ে হয়ে গেল। নদী পার হয়ে চারুলতা ঘোমটা মাথায় শ্বশুর বাড়ি এলেন। সে কতকাল আগের কথা। নিজেকে নিয়ে চারুলতার তো কোনও দাবি ছিল না। সে সুশ্রীও নয়, সুন্দরীও নয়, আর গায়ের রঙ তাঁর ফর্সা তো নয়ই। কিন্তু তাঁর কোনও দাবি না থাকলে কি হবে, যাঁরা তাঁকে, নোতুন বৌকে, দেখতে এলেন তাঁদের তো প্রত্যাশা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁরা তাই চারুলতাকে দেখে কেউ মুখ বিকৃত করলেন, কেউ সামনা-সামনিই কটু উক্তি করতে ছাড়লেন না। কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও চারুলতাকে চোখের জল ফেলতে হল। সেই যে শুরু চোখের জলের তার আর যেন শেষই হল না। কিন্তু কেন? চারুলতা উত্তর খুঁজে পান না।

শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরযত্ন পেলেও চারুলতা স্বামীর নৈকট্য পান নি বললেই চলে। স্বামীর টান বাইরের জগতে। পরিবারের অভ্যন্তরে তাঁর আকর্ষণ কতটা আগে ছিল তা চারুলতার জানা নেই, তবে এখন যে একেবারেই নেই তা তিনি জানেন। তিনি নিজের কৃষ্ণ-বর্ণ অসুন্দরতাকে দায়ী করলেও ভেবে পান না তাঁর নিজের অপরাধটা কোথায়। স্বামীর মা-বাবা যদি তাঁর মতামত ছাড়াই তাঁকে বিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলেও তো সে দায় চারুলতার নয়!

মনের কষ্ট আর অন্তরের দুঃখ তো সময়কে আটকে রাখতে পারে না। তাই এক সময় সময় পার হয়েই যায়, চারুলতা শরীরে শিহরণ অনুভব করেন, অনাস্বাদিতের পদধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, অঙ্গাভরণ বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হয়ে পড়েন। রাজেন্দ্রের জীবনে গতি বাড়ে, ব্যস্ততা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে, গৃহে এলে বিশ্রামের প্রয়োজন বাড়ে। তাই তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে স্ত্রীর নৈকট্যকে আগের মতো নিরস মনে হয় না, ক্লান্ত দেহের উত্তপ্ত কপালে নারী করস্পর্শ বৃন্তের কণ্টকের নয় শীর্ষের পাপড়ির অনুভব জাগায়। জাগ্রত প্রকৃতিই যেন পয়ারের ছন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে একাগ্র করে তোলে। রাজেন্দ্র আনচান্ করেন, চারুলতা নিজের নামের সার্থকতা খুঁজে পান, সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করেন।

ক'একটি এমন অনুভবের রাত্রি ছাড়া চারুলতার জমার ঘরে শূন্য।

দিনের আলোয় রাজেন্দ্র ত্বরিত-পদ হতে বাধ্য, চারুলতা বিমর্ষ। সেই আঁচলের ব্যাঙের আধুলিগুলো সাজাতে সাজাতে হঠাৎই একদিন সেই সব আধুলির কোনও একটা ধীরে ধীরে আসলের রূপ নিয়ে আঁচল থেকে কোলে নেমে এসেছিল। চারুলতা ভেবেছিলেন তাঁর কষ্টের দিনের অবসান এতোদিনে হ'ল! কিন্তু বিধাতার মনে অন্য কিছু ছিল।

শ্বশুর শাশুড়ী ছাড়া চার ভিতের গৃহ-পরিবারে একমাত্র ব্রজেন্দ্রই ছিলেন দুঃখ-কষ্টের শরিক। বয়সেও কাছের দেহের গড়নে, বর্ণের জৌলুসে আর আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবে একই বৃত্তের বলে ওঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নৈকট্য বাড়ে। দেওর-বৌদির সম্পর্কের একটা নিজস্ব টান সেই সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। ওদিকে অনেক সময় রাজেন্দ্র দু'এক ঘণ্টা দু'চার ঘণ্টার জন্যে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি এসেছেন। অবশ্যই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তখন তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পুলিশের পদশব্দ এবং গতিবিধির জন্যে নির্ধারিত থাকলেও চোখদুটি জানালার ফাঁক গলে, বেড়ার ছিদ্রপথে যা দেখেছে তার শতগুণ অনুমান করে নিয়েছে। চারুলতা জানতেও পারেনি তার নিয়তি!

এ-সব চারুলতার জানার কথা নয়, অনুমানের বিষয়। স্বামীর ক্ষণ উপস্থিতিকে চারুলতা মন ভরে উপভোগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজেন্দ্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন, অশিষ্ট আচরণ করেছেন। চারুলতা নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়েছেন আর মনেমনে ভেবেছেন রাজেন্দ্র দেশের কাজে ব্যতিব্যস্ত বলে, সমস্যার ভারে নাস্তানাবুদ বলে, চারুলতার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছেন। আর তাছাড়া যে টুকু তিনি রাজেন্দ্রকে কাছে পেয়েছেন তার চাইতে বেশি আশা করার মতো মনের জোর খুঁজে পান নি। বেদনার বিন্দু হয়ে যে চোখের জল গালবেয়ে নেমে এসেছে তাকে অবলীলায় পান করে করে সন্তানের মঙ্গল কামনায় সময়কে, দুঃসময়কে পার করে দিয়েছেন।

তখনও চারুলতা জানেন না যে তাঁর সব হারিয়ে গেছে। জানতে পারলেন যখন রাজেন্দ্র দেশোদ্ধার শেষ করে ঘরে এসে বসলেন। রাজেন্দ্রের সন্দেহ তখন আর অনুমানের বিষয় ছিল না। পিতৃত্বের অস্বীকারকে তিনি বাস্তবের সীমা টেনে দিয়ে চারুলতাকে পুত্রসহ অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। একমাত্র বিধাতা ছাড়া চারুলতার নালিশ করার মতো তখন আর কেউ রইল না।

রাজেন্দ্র যখন জীবন-সঙ্গিনীর জন্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন তখনও এই গ্রাম্য নারী, উপেক্ষিতা স্ত্রী এবং সহায়সম্বলহীনা জননীটি বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের জোর খুঁজে পেলেন না। একমাত্র বালকপুত্রকে ভবিষ্যৎ করে তিনি তাঁর আশৈশব কষ্টের জীবনকে যাপন করতে বাধ্য হলেন। স্বগৃহে পরবাসী জীবনে ব্রজেন্দ্রও তো তখন অনেক দূরে, চাকুরিস্থলে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্দেহের বিষয় তাঁর অজানা নয় ; তাই ব্রজেন্দ্র অবসর গ্রহণের আগে আর গৃহে আসবেন না স্থির করে নিয়েছিলেন।

চারুলতার ছেলে বড় হল, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখল আর তার পরেই চাকরি করতে গ্রামের বাইরে চলে গেল। অমলের মনে তার মায়ের জন্যে কোনও বিশেষ স্থান বরাদ্দ হয় নি। কেন? এই কেনর উত্তরও চারুলতার জানা নেই। পাড়া-প্রতিবেশীরা আছেন, আছেন তাঁরই সতিন, আর সবথেকে প্রবল ভাবে যিনি আছেন তিনি তাঁর স্বামী। অমলের মন বিষকুম্ভ ; কিন্তু তবুও সে তার সবহারা মাকে ত্যাগ করে নি। সে বোধহয় জন্ম দিয়েছিলেন বলেই! অন্যকোনও কারণ চারুলতা খুঁজে পান নি।

চারুলতা তাঁর নিজের সব দুঃখ কষ্টের জন্যেই নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে অভ্যস্ত। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল কম তাই যা তিনি পেয়েছেন, সে যতটুকুই হোক, তাকেই তিনি দুহাতে আঁকড়ে ধরে আপন করে নিতে চেয়েছেন। আর যা তিনি পান নি তাকে চোখের জলে বিধাতার অভিশাপ বলে মেনে নিয়েছেন।

তবুও দেশ বিভাগের অনিবার্য ফল হিসেবে যখন ছেলের দাবিতে দেশের ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হল তখন চারুলতা যেন দু' টুকরো হয়ে গেলেন। স্বামীকে তিনি আপন করে কোনওদিনই তো পান নি ; কিন্তু চোখের সামনে তো পেয়েছিলেন, সনাতন বিশ্বাসে অনুরক্তও থেকেছেন। নিজের সর্বৈব অসুন্দরতার জন্যে দায়ী না হয়েও তিনি নিজেই সারাজীবন তার দায় বহন করেছেন ; সন্দেহাতীত নারী-জীবন যাপন করেও স্বামীর সংশয়ের পীড়ন সহ্য করেছেন, এমন কি গর্ভধারিনী জননী হয়েও তো তিনি পুত্রের কাছে এতটুকু শ্রদ্ধা, এতটুকু ভালবাসা পেলেন না। পেলেন না পুত্রবধূর কাছেও। নাতি-নাতনীদের কাছে কি চারুলতা ঠাকুমার প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আশা করবেন?

চারুলতার গৃহ কোথায় ? কোনটি ? বাল্যে নদীর ও-পাড়ে যে খেলাঘর বেঁধেছিলেন সেই খেলাঘর ? যে গৃহের ছায়ায় শৈশব কেটেছিল সেই মাতা-পিতার স্নেহনীড়ই কি চারুলতার গৃহ ছিল ? শ্বশুর-শাশুড়ীর আবাহনে নদীপারের মহেশ্বরপাশায় ? স্বামীর গৃহে ? অথবা অপরিচিত অ-দৃষ্টপূর্ব বনগাঁয়ের পুত্রের-পুত্রবধূর আবাসস্থলে ? চারুলতার মনে একটাই প্রশ্ন, তাঁর ঘর কোনটি ? গৃহ বলে তাঁর কি কখনও কিছু আদৌ ছিল ? এই যে সুদীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়ে এলেন তার কোথায়ও তো নোঙর ফেলার মতো একটুকরো জমি পেলেন না। ভেবে পান না চারুলতা। ভেবে পান না কেন বিধাতা এমন একটা জীবন আদৌ তৈরি করলেন। কষ্টে চারুলতা কষ্ট পেতে ভুলে গেছেন ; একটা মাত্র প্রশ্ন নিয়ে চারুলতা কি বিধাতার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন ? উত্তরের অপেক্ষায় ?

———

॥ তিন : তুলসী দেবী ॥

তুলসীদেবীকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন আমার নারীচরিত্র বোঝার বয়স আসে নি। তাই বোধহয় একটি অতীব কমনীয় মাতৃমূর্তি আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। মিষ্টি হাসিটিকে চোখেমুখে সর্বত্র মেখে রেখে উঠোনের মধ্যেই আমার মস্তক চুম্বন করে বলে উঠেছিলেন, 'আহা' কী মিষ্টি ছেলে! মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে গো!' তার পরেই পাশে দাঁড়ানো আমার দিদিকে নির্দেশ দিলেন, 'চিনি নারকেল কোরা দিয়ে ওকে চাট্টি চিড়ে মেখে দাও, ও ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে নেবে। প্রণম্যদের প্রণাম সারা হতেই জ্যেঠিমা, তুলসীদেবী, আমাকে পিঠে তাঁর স্নেহ করস্পর্শে এগিয়ে নিয়ে জলের সন্ধান দিলেন। বাড়ি থেকে তিন মাইল হেঁটে, সারারাত স্টিমারের ভিড়ে কাটিয়ে দুপুরের পরে খুলনা হয়ে রেলে চড়ে দৌলতপুর পৌঁছেছিলাম। কাঁধে স্যুটকেস আর হাতে ব্যাগ নিয়ে রেললাইন বরাবর প্রায় মাইল খানেক হেঁটে যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহে-মনে দিদির আস্তানায় পৌঁছেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি এমন একজন জ্যেঠিমা আমার পথ চেয়ে বসে থাকবেন। যদি বলি আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম তাহলে পাকা-পাকা শোনাবে, আসলে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জ্যেঠিমার নাম যে তুলসী দেবী তা অবশ্য অনেক পরে জেনেছি। মা-জ্যেঠিমা-পিসীমাদের যে আবার একটা করে নামও থাকে তা দেশে থাকতে শুনলেও জানা ছিল না, এই প্রথম জানতে পেরেছিলাম। আমার ধারণা ছিল ওঁদের অস্তিত্বটা সম্পর্কের সুতোয় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায়, নামের চিহ্ন আর তেমন গ্রাহ্য থাকে না। জ্যেঠিমার ছোট বেলায় ওঁর মা-বাবা ওঁর বড়-বেলাটা দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না; তবে নামটা যে জ্যেঠিমার মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল তা সত্য বলেই জেনেছিলাম।

এই জ্যেঠিমাটি দিদির জ্যেষ্ঠশ্বশুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলেই আমার জ্যেঠিমা। সেই প্রথম দিনেই আমি সকল স্বজন-পরিজনদের মনে মনে জরিপ করতে লেগে গেছিলাম। জ্যেঠামশাই, রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, দাওয়ায় বসে পা জড়ো করে হাঁটুদ্বয় উন্মুক্ত রেখে দু'চারবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শেষটায় সিংহ-

হুংকার ছেড়ে চুপ করে গেলেন। তখন বুঝি নি যে তাঁর হঠাৎ থেমে যাবার পিছনে জ্যেঠিমার তির্যক দৃষ্টিবাণ কাজ করেছিল, পরে দিদির কাছে শুনেছি আর তারও পরে নিজেই অনুভব করেছি সেই জ্যেঠিমা-তথ্য এবং তাঁর দৃষ্টি সত্য। পুব ভিটের দাওয়া থেকে শেষ খুঁটিতে বাঁ হাতের ভর রেখে আমার তালুই মশাই, ব্রজেন্দ্রলাল, দেহের ভার এক পায়ে সামলিয়ে ঘাড় কাত করে উঠোনে নেমে এসেছিলেন। আমাকে আদ্যোপান্ত দেখে নিয়ে প্রণামটি গ্রহণ করতে করতে কিছু একটা বিড়-বিড় করে বলেছিলেন। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে সেটা আশীর্বাদের অনুচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ হয়ে থাকবে। দু'টি ঘরের দাওয়ার ফাঁকে একান্তে দাঁড়ানো শীর্ণদেহ কৃষ্ণবর্ণ যে নারীমূর্তিটি সকলের থেকে দূরে থেকে সবই দেখেছিলেন কিন্তু কাছে এলেন না তিনি যে বড় জ্যেঠিমা, চারুলতা, তা অন্য কেউ বলে না দিলে আমাকে অন্য কিছু ভেবে নিতে হত। সেই অন্য ভাবনায় আমার যতটা দোষ ঘটত তার চাইতে বেশি অপরাধ হত পরিবেশ-পরিস্থিতির এবং স্বয়ং বড় জ্যেঠিমার।

জ্যেঠিমার হাতে একদিকে দিদির সংসারে, রান্নাঘরে এবং বৃহত্তর জীবনে হাতে-খড়ি চলছিল অন্যদিকে তেমনি তাঁরই দৃষ্টিতে আমার কলেজ জীবনের, ছবিআঁকার শিল্পী জীবনের, যাত্রারম্ভ হয়েছিল। নিঃসন্তান জ্যেঠিমা বহু সন্তানের জননীটি হয়ে তাঁর অফুরন্ত স্নেহ-সুধার ধারাটিকে প্রবাহিনী রেখেছিলেন। জ্যেঠিমার মুখ দেখে মনেই হত না যে তাঁর জীবনে কোনও কণ্ট আছে, অপূর্ণ কোনও বাসনা আছে, প্রত্যাশা বাধাপ্রাপ্ত হবার কোনও বেদনা আছে। এ-যে কতোবড়ো বালখিল্য মূল্যায়ন তা অনেক অনেক দিন পরে দিদির কাছে জেনেছি। জেনেছি আর মনে মনে বেদনায় অশ্রুসিক্ত বোধ করেছি, জেনেছি আর ভেবেছি না জানলেই ভাল ছিল। সেই পরের কথায় পরে আসছি।

জ্যেঠিমা সকলের প্রতিই সমান সদয় ছিলেন। যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর সতর্ক দৃষ্টি সদাসর্বদাই স্বামীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। কথা কম, কাজ বেশি, স্মিতহাসিটি ততোধিক বেশি। পরিশ্রমে কাতর হতে দেখি নি, সময়ের কোনও অভাব জ্যেঠিমাকে স্পর্শ করতে পারত না, আর মনে হত দুঃখ তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল। ব্রজেন্দ্রলাল সামনে এলে, এমন কি ব্রজেন্দ্রের ছায়া কোথায়ও দেখা গেলেই

জ্যোঠিমাকে হঠাৎ যেন রূঢ় হয়ে যেতে, কঠিন হয়ে যেতে আর তীক্ষ্ণ হয়ে যেতে দেখেছি। ব্রজেন্দ্র তখন মৃতদার। ধীর পদ শ্বাপদ চলন, দৃষ্টিতে অনুসন্ধান-অনুসন্ধেয় সন্দেহ-উৎকণ্ঠা। অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। আমরা ভাবতাম কোথায়ও কিছু বেহিসেবী খরচা হচ্ছে কিনা, কোথায়ও অপচয়ের গন্ধ আসছে কিনা, কোথায়ও যার যা পাওনা নয় সে তাই পেয়ে গেল কিনা, এ-সবই ব্রজেন্দ্রের সহস্রমুদ্রা প্রশ্ন ছিল। আমরা যখন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে পত্রে পল্লবে বৃন্তে বলে মনে করছি তখন সেই দৃষ্টি যে কোথায় বা কোন্ ফলের দিকে তা অনুমান করা অসাধ্য ছিল আমাদের পক্ষে। প্রথম তো বয়সই হয়নি তখনও, দ্বিতীয় তাঁর বায়স বঙ্কিম গণ্ড চক্ষুর অসম বিক্ষেপ বোঝার মতো পাকা হতে যে অভিজ্ঞতা অনিবার্য তা থেকে আমরা শত-হস্ত ছিলাম। কিন্তু জ্যেঠিমা? বিধাতা তাঁর চোখের পিছনে সম্ভবত এমন একটি radar বসিয়ে দিয়েছিলেন যে ঘুণাক্ষর বৈপরীত্যও তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারত না। তাই কি? কে জানে?

দেশ বিভাগের মার খেয়ে সমগ্র দেশের চিত্রটির সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরপাশার জীবনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রাখান হয়ে গেল। শত শত ফাটলের বেদনা-রেখাগুলো যেন জ্যেঠিমা একা একা বুকের মধ্যে ধারণ করে চললেন। জ্যেঠিমার নিজের কোনও সন্তান হয়নি, হবার আর সম্ভাবনাও ছিল না বলে জেনে গেছি ততদিনে। তাই তিনি রাজেন্দ্রের পুত্র, তাঁর সতিন-তনয়, অমলকে নিজের পুত্রের মতোই মনে করতেন। এবং অমল? অন্তরের কোন্ ফল্গুপ্রেরণায় কে জানে, অমল নিজের মায়ের প্রতি সদাই কুণ্ঠিত দৃষ্টি হয়েও তুলসীদেবীর প্রতি নম্র-নত, মাতৃভাবাপন্ন ছিল। প্রত্যেক সন্তানের, শিশুর, মনের গভীরে যে মায়ের আঁচলখানির সনাতন খোঁজটি চিরায়ত সেখানে অভাব তারা মেনে নিতে চায় না বোধহয়; বোধহয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পথনির্দেশেই সন্তানরা মা খুঁজে নেয়, পেয়ে নেয়। জল যেমন নিম্নমুখী, সন্তানরাও তেমনি বোধহয় মাতৃমুখী, স্নেহের ধর্মে, ভালবাসার স্বাভাবিক টানেই বোধহয় সন্তান-জননীর এই জোয়ার-ভাটার গতিটি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। কারণ ব্রজেন্দ্রের তিন পুত্রের সকলেই এই তুলসীদেবীকেই মায়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় প্লাবিত রেখেছিল যখন দূরে ছিল তখনও, যখন কাছে এসেছিল তখনও। তারপর যখন তাদের গর্ভধারিনী জননী তাদের ছেড়ে চলে গেলেন তখন সেই সন্তানরাও তাদের

জ্যেঠিমার মধ্যেই মাকে খুঁজে নিয়েছিল। তুলসীদেবী তাই শরীরের অভ্যন্তরে সন্তান ধারণ না করেও মনের গভীরে একাধিক সন্তানের পীযূষ ধারাটি বহমান রেখেছিলেন। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজ সত্য।

যে রাজনীতি তাঁর স্বামীর তরুণ-যুবক কালটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তুলসীদেবী পরিষ্কার দেখতে পেলেন, সেই রাজনীতিই দেশবিভাগের প্রক্রিয়া হয়ে আবার তাঁর সন্তানদের ছিনিয়ে নিল, তাঁর মাতৃত্বকে শূন্যতার আঘাতে নিঃশেষ করে দিল। সকলেই দেশ ছেড়ে যে যার মতো পথ দেখে নিল। একমাত্র তিনিই পড়ে রইলেন মহেশ্বরপাশার আম-জাম কয়েদবেলের ছায়া ঘেরা শূন্যতায় এক শরীরে অক্ষম, মনে নিঃশেষিত, সময়ের আক্রমণে জীর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে। সেই ব্যক্তি তাঁর স্বামী। কিন্তু আরও অনেক কিছু। রাজেন্দ্র তখন আচরণে একটি অবোধ শিশুরও অধম, চিন্তায় ভাবনায় এক অতিবৃদ্ধ বট বৃক্ষের মতো প্রায় শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে বেদনাহত, চারপাশের অতলান্ত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক জাগ্রত প্রতিবাদের মতো গর্জমান। তুলসী-দেবী এই ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেন, সান্ত্বনা দেবার জন্যে স্নেহসিক্ত করস্পর্শটি তাঁর কপালে রাখেন আর অতীতের স্মরণ থেকে মূল্যবোধের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে খুঁজে রাজেন্দ্রের জীবনে জোনাকি জোনাকি আলোর আভাস এনে দেবার চেষ্টা করেন।

তুলসীদেবীর এই একা জীবনের শূন্যতাকে বাইরে থেকে পরিমাপ করা যায় কি? দিদির কাছে শুনেছি, শুনে শুনে কেমন যেন উদাস হয়ে হারিয়ে গেছি, আর ঘুরে ঘুরে সেই জ্যেঠিমারই চারপাশে ঘুরঘুর করেছি। দিদি বলেছিলেন জ্যেঠিমার সেই সদাহাস্যময়ী মুখটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছিল, তাঁর চোখের গভীরে স্নেহের উৎসটি যেন শুকিয়ে গেছিল। জ্যেঠিমা প্রায় বোবা হয়ে গেছিলেন। কখনও দাওয়ার অন্যপ্রান্তে খুঁটি ঠেস্ দিয়ে শূন্য দৃষ্টি উধাও হয়ে যেতেন, কখনও ধীর পায়ে আমগাছের পাশ দিয়ে, জামগাছের তলা দিয়ে আর কয়েদবেল গাছটির প্রায়ান্ধকার নিচ দিয়ে আপন মনে হেঁটে বেড়াতেন। জ্যেঠিমা কি কিছু খুঁজতেন, কাউকে খুঁজে বেড়াতেন? দিদি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি। আমার মনে হয়, এই এতদিন পরে সেই আমার শাশ্বত স্নেহের উৎসরূপ জ্যেঠিমার কথা ভেবে আমার মনে হয়, জ্যেঠিমা সারাজীবনই একটা অভাবকে আপন মনের গভীরে নিজস্ব করেই ঢেকে

রাখতে চেয়েছিলেন। আর যা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন, যাদের দিয়ে সেই চির অভাবের বিরাট গহ্বরটিকে বন্ধ করে রেখেছিলেন সেই তারা যখন সকলেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন সে হাঁ-মুখটিও আর নীরব নিশ্চেষ্ট রইল না। জ্যেঠিমা কি সেই অভাবের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন ? যে সন্তান-স্নেহ তুলসীদেবীর জীবন মঞ্চের প্রদীপ শিখা হয়ে তাঁকে উজ্জ্বলতা দিয়েছিল সেই সন্তানরাই কি তাঁর মঞ্চটিকে শূন্য করে দিয়ে গেল ?

রাজেনবাবু গত হয়েছিলেন সে খবর পেয়েছিলাম। তুলসীদেবী ? তিনি কি এখনও সেই মহেশ্বরপাশার আম জাম কয়েদবেলের ছায়া ঘেরা উঠোনে, তুলসীমঞ্চের আশপাশে, শূন্য দৃষ্টিতে আপন মনের অভাবকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন ? কে বলে দেবে ?

———

॥ চারঃ ব্রজেন্দ্রলাল ॥

ব্রজেন্দ্রলাল একা একা শৈশব কাটালেন, একা-একা বড় হলেন, একাই একক ভাবে সংসার করলেন, শেষ জীবনে অবসর নিয়ে একেবারেই একা হয়ে গেলেন। এবং দেশ ছেড়ে এসে, সন্তানদের কাছে এসেও, তাঁর একাকিত্ব ঘুচল না তাই একদিন কাউকে বিন্দুমাত্র না জানিয়েই রাতের অন্ধকারে একা একাই মরে গেলেন!

বৃদ্ধ ব্রজেনবাবুকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন আমার বাল্যকাল শেষ হবার মুখে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে দিদিকে দেখতে এসেছিলেন। ছ'ফুটের উপর দীর্ঘদেহখানি যেন আবলুস কাঠের শুকনো গুঁড়ি দিয়ে অযত্নে বানানো। জীবনের হাতে শত চাবুক খাওয়া দৃষ্টি, মুখে সহস্র বিস্বাদ যেন বাসা বেঁধে আছে। হাঁটু ঢাকা হ্রস্ব ধুতির উপর সাদা শার্ট। দেখেই মনে হয়েছিল এখানে দিদির বিয়ে হবে না। ঐ কুঞ্চিত ভ্রূর নিচে যে বাঁকা অনুসন্ধান ঘাপটি মেরে আছে সে হয়তো জেলের ঝুড়ির মাছ অথবা দালালের ধানিজমি পছন্দে কাজে লাগতে পারে, কিন্তু, মনে হয়েছিল, মেয়ে দেখতে কখনও কাজে লাগে না। কিন্তু আমার আশংকা অমূলক প্রমাণ করে ব্রজেনবাবু তাঁর ছেলের জন্যে আমার দিদিকেই পছন্দ করে গেছিলেন।

তারপর ব্রজেনবাবুকে অনেকবার দেখেছি। দূর থেকে দেখেছি, দেখেছি কাছে থেকেও। ওঁকে যেন কোনওদিনই সঠিক করে দেখতে পেলাম না। ওঁর চলন-বলন চিন্তা-ভাবনা এবং ওঁর চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাব কাউকেই প্রীত করার মতো নয়। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম প্রথম মহেশ্বরপাশায় ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিভাবকত্বে যখন জীবন শুরু করি তখন ওঁকে অত্যন্ত ভয় পেতাম, সামনে পড়লেই পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতাম। কখনও কোন মন্দ কথা বলেছেন বলে মনে করতে পারি না, কখনও তেমন করে শাসনও করেন নি, তবুও পারতপক্ষে ওঁর সামনে পড়তে চাইতাম না। কেন? কে জানে; কিন্তু তখনই এটা জেনে গেছিলাম যে জ্যেঠিমার, আমার বড় তালুই মশাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তুলসী দেবীর আড়াল-আশ্রয় নিলে বাঘেও ছোঁবে না, রাবণেও ধরবে না!

কথায় বলে সকাল নাকি দিনের অনাগত প্রকৃতিটি জানিয়ে দেয়। ব্রজেনবাবুর জীবনের সকালটাও তার দিনটাকে কি তেমনিই জানিয়ে দিয়েছিল? ওঁর ছোটবেলাটা নাকি চেপে-ধরা আর ছিটকে যাওয়ার ইতিহাস। মা-বাবা যত আঁটুনি শক্ত করেন ব্রজেন বাবু ততই 'গেরো' ফস্কা করার পথ বার করে ফেলেন। গরুর রচনা অনুশীলনে ছেলের যতটা টান তার শতগুণ বেশি সেই গরু নিয়ে মাঠে যাবার আকর্ষণ। শুধু গরুই তো আর পোষা ছিল না, ছিল ছাগল এবং হাঁস। দিনের সিংহভাগ সময় ছেলে কাটাতো পোষ্যদের দেখাশুনোয় আর খিদমতগারিতে। অশান্তি যত বাড়ত ছেলের পড়াশুনোর সময় তত কমে যেতো। অথচ বড় ছেলে রাজেন্দ্র ছিলেন একেবারেই আলাদা, অন্য ধাতুতে গড়া। একমাত্র দৈর্ঘ্য ছাড়া দু'ভাই ছিলেন উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু। বড়জন ধীমান এবং আদর্শবান, ছোট জন বুনো এবং চকিত-চতুর। গৃহের খাদ্যের চাইতে ব্রজেন্দ্র গাছের ফল-মূলকে অধিক পুষ্টির মাধ্যম বলে মনে করতেন। আদাড়ে বাগানে ঝোপে জঙ্গলে তাঁর অসীম টান ছিল। সভ্য-সুশৃঙ্খল গার্হস্থ জীবনের তুলনায় তিনি মাঠে-মাঠে গাছে-গাছে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। বাল্যজীবনের এই জীবন-বেদ বোধহয় তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গিটি উপহার দিয়ে থাকবে। ইতিহাস তিনি পড়তে নয় করতে, সৃষ্টি করতে, চাইতেন; ভূগোলকে বইয়ের পাতায় না খুঁজে বাস্তবের মাটিতে সন্ধান করতেন। প্রতিবছর তাই তাঁকে ঠেলেঠুলে মই লাগিয়ে একশ্রেণী থেকে অন্যশ্রেণীতে পৌঁছোতে হত। এই করতে করতে একসময়ে প্রবেশিকা পার হয়েও গেলেন। কিন্তু শত টানাটানিতেও তাঁকে আর সামনে নেওয়া গেল না।

স্বভাবতই মা-বাবা রাজেন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। নিজের চেহারাটি ব্রজেন্দ্ররা আয়নায় দেখতে তেমন আকর্ষণ বোধ করেন না, কিন্তু মা-বাবার 'পক্ষপাতমূলক' ব্যবহারকে অনায়াসেই বিকর্ষণের শেষ পর্যায়ে টেনে নিয়ে যান। এখানেও ইতর বিশেষ হল না। এই না হওয়াটাই ছাপা হয়ে গেল ব্রজেন্দ্রের চোখেমুখে? তাঁর স্বভাবে? তাঁর আচরণে? কে জানে! তবে এটা জানা যায় যে তাঁর চাকরি, সেই চাকরিকে কেন্দ্র করে 'গৃহত্যাগ' এবং গৃহের প্রতি প্রীতির অভাব বাস্তব ঘটনা।

পাত্রী স্থির করে মা-বাবা ব্রজেন্দ্রকে সংসারমুখী করে তুলতে চাইলেন।

তিনি সংসার করলেন এবং এমন ভাবেই করলেন যে তাঁর স্ত্রী বোধহয় বাধ্য হয়েই একমাত্র সংসারে সন্তান যোগান দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্বই পেলেন না! শুনেছি স্বামীর শাসনের কারণে তিনি বৈরাগীর মানসিকতার সংসার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে একদিকে ছেলেরা ঝুঁকে গেল জ্যেঠিমার দিকে আর ব্রজেন্দ্র ঝুঁকে পড়লেন কৃপণতার দিকে। সন্তানদের সংখ্যা আর প্রয়োজনের সীমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভূঁই-এ আয়ের বৃদ্ধিতো আর ঘটে না, তাই অর্থ সামগ্রী বিষয়ে তাঁর কৃপণতা প্রায় সূচী-বায়ুগ্রস্ত পর্যায়ে চলে গেল।

শতবার ধুয়ে নিলেও যেমন কয়লার কালি মোছে না, তেমনিই বোধহয় মনের কালি একবার গভীর করে বসে গেলে সেই মসিকৃষ্ণ মানসিকতা আর জীবনে ঘোচে না। ঘোচেনা যেতা আমিও টের পেয়েছি, বাইরের দর্শক-কুটুম্ব হয়েও। তার খতিয়ান অন্যত্র সবিস্তার দেওয়া আছে মনে পড়ে।

ব্রজেন্দ্রলাল সারা জীবনে একমাত্র নিজের চাকরিটি ছাড়া আর কিছুই বোধকরি আপন করে পান নি। নিজেকেও কি তিনি আপন করে পেয়েছিলেন? একটা নিরালম্ব জীবন বয়ে বয়ে ব্রজেন্দ্রলাল কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ? সন্তানদের সঙ্গে কখনই খেলাঘরে প্রবেশ করেন নি, স্ত্রীকে বৈরাগ্যের নিশ্চেষ্ট অবসন্নতায় ঠেলে দিয়েছেন আর কৈশোর বাল্যের গ্রাম্য পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রজেন্দ্রলাল সারা জীবন নিজের অন্তরের মধ্যে একটা হাহাকারকেই কেবল আপন করে পেয়েছেন। তাই সদাহাস্যময়ী শান্তশ্রী তুলসীদেবীর মধ্যে দিকভ্রান্ত ক্লিষ্ট-অন্তর ব্রজেন্দ্রলাল একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছায়াঘন মানসিক মরূদ্যান দেখতে পেয়েছিলেন। তুলসীদেবী বয়সে ব্রজেন্দ্রের ছোট, সম্পর্কে বৌদি। মরুবালুর উত্তপ্ত মন নিয়ে এক আঁজলা আপনত্বের বারি-আকিঞ্চন সর্ব-অন্তর দিয়ে ব্রজেন্দ্র জীবন পিপাসায় তৃষ্ণা নিবারণের মানস করে থাকবেন। কিন্তু তার মনের ঢেউ ভুল পাড়ে সম্ভবত অনাকাঙ্ক্ষিত অসময়ে আছাড়িয়ে পড়ে থাকবে; অপর পাড়ে কুলুধ্বনির সংগীত না তুলে ব্রজেন্দ্র মনের ঢেউ আঘাত হেনে ধ্বস নামিয়ে দিল। ঢেউ পড়ল চাপা, মন হল আহত। বেদনাই অনুসঙ্গ হয়ে দেখা দিল। তপ্ত চিত্তে ব্রজেন্দ্র শুধু অপমানের তাপই বাড়িয়ে তুললেন।

তার পরের ব্রজেন্দ্র-জীবন সব হারানোর জীবন। এমন কি বোধহয়

তিনি নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্ত্রী গত হয়েছেন, পুত্ররা যে যার কর্মক্ষেত্রে সংসার পেতেছে, দাদা তার কোনও দিনই আপন নয়। একমাত্র কাছের বলে মনে হয়েছিল বড় বৌদিকে। সেই আপন-বোধ ছিল নঞর্থক মূল্যায়নের ফল। দুজনেই বিধি-ধিকৃত, দুজনেই একা এবং দুজনেই অনাকাঙ্ক্ষিত। একটা বেদনাবোধ যেন দুজনের মনের দুঃখের প্রবাহে, দুজনের অন্তরের গভীরে কাছাকাছি করে তুলেছিল। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, কেবলমাত্র এক অসহায় অভাববোধ এই দুটি জীবনকে যেন একই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল।

অনেক যন্ত্রণা, অনেক গ্লানি, অনেক ধিককার পার হয়ে বাকি জীবনটা একেবারে একা কাটিয়ে ব্রজেন্দ্রলাল সেই রাতটিকে খুঁজে পেলেন যে রাতে তাঁর অন্তরের অন্তঃমূল থেকে একটাই প্রার্থনা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল। কি ছিল ব্রজেন্দ্রের প্রার্থনা? কার কাছে?—যদি একটা জীবন দিলেই বিধাতা তাহলে ভালবাসা দিলে না কেন? একটা মন যা ভালবাসতে পারে? একটা মন যাকে ভালবাসা যায়?

তাই কি? জানি না। এমন কি ব্রজেন্দ্র আদৌ কোন প্রার্থনা করেছিলেন কিনা তাও জানি না। তবে এই বার্ধক্যের দ্বিপ্রহরে ব্রজেন্দ্রের জন্য আমার বেশ কষ্ট হয়।

———

।। জনারণ্যে একা ।।

বরাবরই দেখেছি আমার বন্ধুভাগ্য তেমন প্রবল নয় । মিত্র এবং শত্রু ভাগ্য অবশ্যই প্রধান হয়ে বার বার দেখা দিয়েছে । তা, ঐ বন্ধুস্থানে বৃহস্পতির বদলে শনির প্রকোপের কারণটি বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে আমার কুর্ম প্রকৃতির মধ্যেই । দোষ তাই সম্ভাব্য বন্ধুদের প্লাবিতার দৈন্যে নয় আমার স্বরূপের ঊষরতায় । সিন্ধুপ্রমাণ সম্ভাবনাও আমার নীরস মনের বালুদেশে বিন্দু হয়ে হারিয়ে যায় । এই যে কুর্ম-অবতার আমি, এই আমিকেও যে দুজন ব্যক্তি ঘায়েল করে কাবু করে ফেলেছিল তাদের মধ্যে সুবাস একজন । সুবাস আচার্য । প্রবল ঢেউ-এর মত ধেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । হারিয়ে যেতে যেতেও ফল্গু ধারাটি হয়ে থেকে গেল । থেকে গেলই শুধু নয়, সুবাস আমার শুকনো বালুময় জীবনে একটা সরসতার বাতাবরণ তৈরি করে দিল । আজ এই সুবাসের কথা বলতে মনটা কেন যেন বেশ আনচান করে উঠছে । ভাল কথা অপরের সঙ্গে ভাগ করে না নিতে পারলে মনে হয় যেন সেই ভালটুকু মার খেয়ে গেল । আর সব ভালই তো কষ্টের মধ্যে জন্মায়, বিষাদের গর্ভে প্রাণ পায় । সুবাসের বেদনাবোধটুকু তার মনের গভীরে চিৎকার করে উঠেছিল । কিন্তু সেই বেদনাবোধ সুবাসের একার হয়েও একার নয় । একাকার হয়ে সকলের । তাই তো সুবাসের বিষাদটুকু প্রদোষের প্রায়ান্ধকার অবশেষে এমন করুণভাবে আমার মনে বার বার ঝংকার তুলছে । সেই সুরটিকে আপনাদের দৃষ্টি পথে মর্মের দ্বারে পৌঁছে দিতে তাই আমার মনের আনচান ভাব ।

সুবাস আমার যুবক বয়সের বন্ধু । সে এখন আমার অবসরজীবনের তপোবন । শীর্ণ দেহ, প্রশস্ত কপাল আর উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ । সেই চোখদুটি যা দেখে তার চাইতে দৃষ্টিপাত ঘটায় অনেক বেশি । সুবাসের অপুষ্ট সারস কণ্ঠটি যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতে গেয়ে ওঠে তখন তার পুষ্টির শিষ্টতার আর সরসতার মাত্রা অপরিমেয় বলে শ্রোতাদের মোহিত করে দেয় । কোনও দৃশ্যত শুষ্ক বাক্‌যন্ত্রে যে এমন শ্রুতিশুদ্ধ নিটোল-সুন্দর গভীর-গম্ভীর ধ্বনি নিঃসৃত হতে পারে তা সুবাসকে না শুনলে বোধহয় বোঝাই যাবেনা । তাছাড়া

সুবাসের হাতের লেখাটি ? আপনারা দেখেন নি, আমি দেখেছি। প্রকৃতিতে পুরুষের ভাগে সুন্দরের প্রকাশের অংশ, আর মানুষের সমাজে নারীদেহে। সুবাস বর্ণমালার দেহে সেই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটিয়ে তোলে! বর্ণমালা দিয়ে ও শব্দ লেখেনা যেন মনোহরকে, বর্ণমালার অন্তরে একটি মর্মবাণীকেও সে প্রকাশ করে তোলে তার কবিতায়, তার গল্পে তার নাটকে। সুবাস স্বভাব কবি, হার্দ সাহিত্যিক, হৃষ্ট নাট্যকার।

এ সবের যে কোনওটাই সে হতে পারত। অথবা সবকটিই। কিন্তু হল না। সুবাস অনুসরণ করল কিন্তু অনুশীলন করল না। সে যে শুধু বদলীর চাকরি করত বলেই তা নয়। সুবাসের মনে সম্পূর্ণতার একটা ধারণা বা আদর্শ তার সব সৃষ্টির দেহে প্রতিনিয়তই যেন একটা অসম্পূর্ণতার ছাপ মেরে দিতে লাগল। ওর হাতে যখন শিব তৈরি হল তখনও সুবাস সেই শিবকেই বাঁদর বলে ত্যাগ করতে লাগল, ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'হয় নি, হয় নি'-র একটা অনুভব, 'হচ্ছেনা হচ্ছেনা'-র একটা চেতনা সুবাসকে তার সৃষ্ট-সম্ভার থেকে বিতৃষ্ণ দূরত্বে ঠেলে দিতে থাকল। বলা যায়, সুবাসের অন্তরের শিল্প চেতনা তার মনের সৃজন ক্ষমতাকে গলা টিপে হত্যা করে দিল। বলা যায়, তার আদর্শবোধ তার প্রকাশ প্রচেষ্টার সর্বদেহে নৃশংস আঘাত হেনে হেনে মৃতপ্রায় করে ফেলল।

এতক্ষণে নিশ্চয় করে বুঝে গেছেন যে সুবাস স্বভাবে আমার বিপরীত। তাই নির্গুণ আমার প্রতি সুবাসের এবং হৃদয় গুণের গঙ্গাপ্রবাহে সমৃদ্ধ সুবাসের প্রতি আমার টানটা ছিল প্রকৃতিসিদ্ধ। সুবাসের মধ্যে একটা বৈঠকী মেজাজ তাকে সহজেই অপরের মনের কাছে পৌঁছে দিত। তার সঙ্গে সুবাসের গানের গলাটি একই সঙ্গে তাকে বহুজনের অন্তরগুলো ছুঁয়ে দেবার ক্ষমতাটুকু অকাতরে দান করেছিল। সরকারী চাকরির তাড়নায় আর প্রশাসনের ডামাডোল ব্যবস্থায় সুবাসকে তাই অন্য অনেকের চাইতেই বেশি বেশি পর্যটন ভাগ্য, বন্ধুভাগ্য আর স্থান দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল। উচ্চস্থানে এবং ঊর্ধ্ববর্গে সুবাসের চর্চা-কর্ষণ-সৃজন ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। তাই স্বস্থানে এবং স্ববর্গে সে তুষ্ট থাকত। শিল্পসাহিত্য-সঙ্গীতের জগতে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যতটাই তেজী, জাগতিক ভোগ সুখের বেলায় তার চাহিদা ছিল ততটাই সীমিত। বস্তুভোগের অভাব ওকে পীড়া দিত না

কিন্তু চিৎ-উপভোগের অনটন ওর কষ্টের কারণ হয়ে উঠত। কপালে লেখা ভাগ্যকে নিয়ে ও রসিকতা করত, কিন্তু আড্ডার ভাগ্যে দৈন্য দেখা দিলে সুবাস রসহানি হল বলে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ত।

তাই শহর থেকে শহরান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে সুবাসের মনটি সদাসর্বদা গুনগুন করে যা খুঁজে বেড়াত তা গৃহ নয়, বাজারের দূরত্ব নয়, সিনেমা হলের নৈকট্য নয় স্টেশন বা বাস স্ট্যান্ডের অবস্থান নয়। সুবাস খুঁজতো আড্ডা। একটি সংস্কৃতি সচেতন শ্রীক্ষেত্র। সুবাস যখন বাঁকুড়ায় গেল তখন সেই তেপান্তরের কাঁকুড়ে জীবনের তপ্ত নীরস উদাসী অন্বেষণে যিনি প্রথম দখিণে বাতাস বয়ে আনলেন তিনি স্বয়ং সুদাসবাবু। সুদাস লাহিড়ী।

রতনে রতন চেনে। সুদাসে সুবাসে চেনাচিনি হতে তাই দেরি হল না! সুদাসবাবু স্বল্পভাষী কিন্তু বহু গুণের জ্বল্যমান ফলগুধারাটি হয়ে বোধহয় সুবাসের প্রতীক্ষায় শবরী হয়েই ছিলেন। সুদাসবাবু গৃহের অভ্যন্তরে একটি এবং গৃহের অঙ্গনে একটি—এই দুটি বাগান নিয়ে তিনি, মত্ত নন, 'মস্ত' বলা যায়। নিজে তিনি বিশেষ কিছুই করেন না—না গৃহের অভ্যন্তর বাগানে, না গৃহাঙ্গনের সবুজ বাগানে। ঘরের মধ্যে আছেন তাঁর স্ত্রী আর বাইরে আছে বিনা পয়সায় মালী। প্রথম জন এসেছেন ছাতনাতলার গায়ে হলুদ মেখে সুদাসবাবুর দায় আর সন্তানদের দায়িত্ব ঘাড়ে করে। আর দ্বিতীয় বাগানের জন্যে এসেছে অফিসের মাইনেয় পুষ্ট সুদাসবাবুর ব্যবহারে তুষ্ট একাধিক বাগান কর্মী। ভিতর বাগানে গৃহমালিনী তিনটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সন্তানের ফুলে ফলে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সদারত, আর প্রাঙ্গণ বাগানের প্রশস্ত অঙ্গনে অফিসের মালীরা কেয়ারি করা ফুলগাছের শ্যামল অঙ্গে সুন্দরের আবাহনে আরাধনায় সদাতৎপর। সুদাসবাবু সাংখ্যের পুরুষটি হয়ে ঘরে বাইরের এই প্রকৃতির ক্রমউন্মোচিত লীলা উপভোগ করেন।

সুদাসবাবুর এই উপভোক্তা স্বরূপটিই সুদাস-সুবাস দ্বৈত মনের মেলবন্ধনটি পত্তন করে, দৃঢ় করে এবং উত্তর অবসর জীবনেও যোগসূত্র হিসেবে স্থায়ী হয়। সে কথায় ক্রমশ আসা যাবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, একই শহরের উপকণ্ঠে এবং একই ধরনের দুটি সরকারী বাসগৃহে বাস করতেন এই

দুই সহকর্মী। কাজে যোগ দেবার সময় সুদাসবাবু বলেছিলেন, "ঘর ছাড়া এই কাঁকড় মাটির দেশে রইল আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ। আমার ঘরে। আপনি থাকবেন আপনার শূন্য ঘরে একা। আমি আছি আমার পূর্ণ গৃহে একা। তাই আপনি এলে আমার ভাল লাগবে।"

কাগজ-পত্র সই করতে করতে সুবাসকে ছুঁয়ে গেল সুদাসবাবুর আমন্ত্রণের আন্তরিকতাটুকু। একবার চোখ তুলে দেখে নিতে চাইল সেই আহ্বানের কতটা নিয়মের দড়িদড়ায় ফর্মাল আর কতটাই বা হৃদয়ের সরসতায় ইনফর্মাল। শেষ সইটির তলায় দাগ টেনে দিয়ে সুবাস প্রশ্ন করেছিল, "সে চা না হয় হবে এখন—চাই কি, আজ বিকেলেই হয়ে যাবে সদ্য সদ্য। কিন্তু ঐ 'একা'-ব্যাপারটাতো বেশ ধন্দে ফেলে দিল, সুদাসবাবু? আমি যে একা একাই এসেছি, একা একাই থাকব, থাকতে বাধ্য হব তা আমার কাছে পরিষ্কার। কিন্তু আপনি স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে থেকেও কেমন করে একা হলেন সেটা যে বোধগম্য হল না!" সুদাসবাবু মিটিমিটি হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "আপনার আসার আগেই আপনার বিষয়ে আমার অনেক জানা হয়ে গেছে। জ্ঞাত তথ্যের ভিড়ে যে দুচার টুকরো অফিস-অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান-অনাবশ্যক সুবাস-সত্য আমার ঝুলিতে সরিয়ে রেখেছি তা তো আর আপনার জানা নেই। আপনার সেই অপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যককে নিয়েই আমার বিকেলগুলো কেটে যাবে। তখন আপনি ধীরে ধীরে বুঝে যাবেন যে একাকিত্ব সংখ্যার ভিড়ে ঘোচে না, মনের নির্জনতায় বেড়ে ওঠে।"

বক্তব্যকে পেশ করার ধরনে আর সুদাসবাবুর আন্তরিকতার কারণে সেই দিন বিকেলেই সুবাস পৌঁছে গেল সুদাস সদনে। চায়ের টান যত উগ্রই হোক না কেন সুবাসের মনে আগ্রহের টানটা ছিল প্রায় অমোঘই বলা চলে। কাছে যেতেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। বাগানতো নয় যেন সবুজের সমারোহ। আর সেই সমারোহের শ্যামল অঞ্চলে যেন ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্ম রঙ বেরঙের কারুকার্য। কাঁকড়-কঠিন ঊষর প্রান্তরের বুকে যে কল্পমন এমন একটুকরো মরূদ্যান ধরে রাখতে পারে তাকে দূর থেকেই, প্রবেশের মুখেই, শ্রদ্ধা জানায় সুবাস। এমন বিন্যাস মালীর হাতে সম্ভব নয়। পরিকল্পনার এমন একটি স্পর্শ সেই সুপরিসর বাগানের প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ওতপ্রোত ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে, যা একটা কবি মনের অনুভবেই সম্ভব।

ছোট্ট একটুকরো বারান্দার কোণে একখানি আরাম কেদারায় আধশোয়া সুদাসবাবুকে দূর থেকেই দেখা গেল। সুবাস বাগানের ভিতর-পথ দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। মুখের সামনে মেলে ধরা একটা বই। সেই বই থেকে মুখ বার করে সুদাস বাবু উদাস মনে বাগানের দিকে তাকিয়েই 'আরে আরে আসুন আসুন'-বলে ঝট্পট্ উঠে পড়লেন। "কি সৌভাগ্য আমার! আরে, আপনি তো মশাই শিবের চাইতেও বেশি ভক্ত বৎসল!" সুবাস মৃদু হেসে প্রশ্ন করে, "সেটি কেমন ব্যাপার বলুন তো?" "এই যে আমি আপনার ভক্ত। আপনার বাঁকুড়া আবির্ভাবের পূর্বেই আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছিলাম। তা, আমি চাইলাম আর আপনি তথাস্তু বলে এই যে আপনার উপস্থিতির বরদান করলেন এটা কি শিব ছাড়া অন্য কোনও দেবতার পক্ষে সম্ভব ছিল?"

একটু মজা করার লোভে সুবাস বলেছিল, "তাহলে কি আপনি এত তাড়াতাড়ি আমাকে আশা করেন নি? সহজ-প্রাপ্য করে কি তবে নিজের মূল্যহানির কারণ ঘটালাম?" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদাসবাবু বলে উঠেছিলেন, "মূল্য হানি না ঘটিয়ে বরং বলুন অমূল্য করে তুললেন!" বলেই হাঁক দিলেন, "কৈ? দেখবে এসো কে এসেছেন?" সুবাস অনুমানে বুঝে গেল উদ্দিষ্টা ব্যক্তি অবশ্যই সুদাসগৃহিনী আর কর্ণ প্রত্যক্ষে জানল তিনি দ্বারপ্রান্তে সমাগতা। নর্তকীদের পায়ের ঘুঙুর যেমন তাদের চলন বলে দেয়, গৃহিনীদের বেলায় হাতের চুরির বোল আর আঁচলের চাবির চাল এঁদের গতি ও দিক নির্দেশ করে। আঁচলের প্রান্তটিকে খোঁপার কাঁধে তুলে দিয়ে সুদাসগিন্নী বাইরে এসেই বললেন, "নমস্কার সুবাসবাবু। আপনার কথা এত শুনেছি এই ক'দিনে যে আপনি অনায়াসেই আমাদের পূর্ব পরিচিতের দলে ভিড়ে যেতে পারেন।" অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা চেয়ারখানা টেনে দিয়ে বললেন, "বসুন। আপনারা কথা বলুন আমি চায়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলি।"

সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটি আজও সুবাসের স্পষ্ট মনে আছে। তারপর কত বিকেল গড়িয়ে গড়িয়ে রাতের গভীরে হারিয়ে গেছে, কত ছুটির সকাল সন্ধ্যা তন্ময় নৈকট্যে ঘন গভীর ব্যঞ্জনা পেয়েছে তার আর হিসেব থাকে নি। কবিতা আবৃত্তি, পাঠ থেকে গল্প-গান। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, হয়ে দেবব্রত-চিন্ময়ের কণ্ঠ ছুঁয়ে অত্যাধুনিক লেখক-শিল্পী-কবিদের অঙ্গনে চলে

ফিরে ওদের সময় যেন পূর্ণ মনের দুকূল বেয়ে তর্ তর্ বয়ে চলেছিল। সুদাসবাবু অত্যল্প সময়েই 'লাহিড়ীদা' হয়ে গেলেন। বয়সে প্রায় বছর দশেকের বড়। কিন্তু তার মনের বয়স ক্যালেন্ডারের বন্ধনকে অস্বীকার করে অনেকটাই সুবাসের কাছাকাছি এসে গেল। মিসেস্ লাহিড়ী তত্দিনে বৌদি হয়ে নৈকট্যের প্রমোশন পেয়ে গেছেন। দুটি ছেলে একটি মেয়ে যেন ওদের কাঁকুড়ে জীবনে সবুজের-শীতলের স্পর্শ হয়ে, দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি হয়ে বারে বারে আভাসিত হতে লাগল। ওরাও এই সময়ের অন্যতর তাল-লয়-ছন্দময় জীবনে আবৃত্তির উচ্চারণে আর কণ্ঠের গানে বারে বারেই সামিল হয়ে পড়ত। সুবাস বাড়ি থেকে তার টেপ্‌রেকর্ডার লাহিড়ীদার হেপাজতে জমা করে দিল। সেই যন্ত্রে রেকর্ড হতে থাকল বর্তমানগুলো, বাজতে থাকল অনতি অতীতগুলো আর ওদের সকলের ভবিষ্যৎগুলো একাগ্রভাবে যেন রেকর্ড হবার বাসনা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেল।

সুবাসরা স্বামীস্ত্রীতে চাকরি করে। দু'টি মাত্র সন্তান। থাকে কলকাতার উপকণ্ঠে, স্বগৃহে। অর্থের অনটন নেই। ওদের ভোগ বাসনা অত্যন্ত সীমিত তাই প্রাচুর্য সৃষ্টি করে নিতে পারে। সুদাসবাবুর একক উপার্জন। পাঁচ জনের সংসার। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর পিছনে অকাতর খরচা। সবিশেষ, তারা তিনজনেই উঁচু মেরিটের পরিচয় দিয়ে চলেছে। সুদাসবাবু 'পুরুষ' প্রকৃতির হলেও লাহিড়ী বৌদি ত্রিগুণাত্মক অস্থিরতার অনুভব বোধ করেন। প্রথম দিন টেপরেকর্ডারটি দেখে তিনি সন্তানস্নেহের হৃষ্টতায় সেই যন্ত্রটির দেহে আলতো আলতো হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "আমার কতদিনের শখ। মনে মনেই সাধটি পোষণ করেছি, সাধ্যের মধ্যে আনতে পারিনি।" সুবাস বলেছিল, "তা, আপনি এটা আপনার কাছেই রাখুন না, বৌদি ? আমি তো এখানেই বেশি ওটাকে ব্যবহার করি।" লাহিড়ীবৌদির চোখে মুখে একটা ঝকঝকে আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেছিল, "সত্যি বলছ সুবাস ঠাকুরপো ? এটা আমার এখানেই থাকবে ?"

কতদিন আগের কথা। সেই বাষট্টি-তেষট্টি সালের কথা। প্রায় তিরিশ বছর আগের। অথচ সুবাসের মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা। এতো পরিষ্কার ছবি ছবি সেই দিনগুলো। সুদাস লাহিড়ীর সদ্য পাঠানো আমন্ত্রণ পত্রখানা হাতে নিয়ে সুবাস উন্মুক্ত আকাশের নিচে আরামকেদারায়

বসে আছে। হাতড়াতে হাতড়াতে যেতে হয় নি, সটান চলে গেছে লাহিড়ীদার সেই বাগান ঘেরা বাঁকুড়া-জীবনে। অঙ্গনের মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ, নাম না জানা কোনও পাখির ডাক। পড়ন্তবেলার আসর একান্ত নৈকট্যে চলে এসেছে তরুণ রাতের আবছা অন্ধকারে। সুবাসের কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীতটি হয়তো তখনও তার রেশটুকুর অনুরণনে ওদের ঘিরে আছে। সুন্দরের উপভোগে যখন ওরা তন্ময় তখন হয়তো লাহিড়ীবৌদি বলে উঠলেন, "সাধ ছিল অনেকই, ঠাকুরপো। সুন্দর জিনিসপত্র আমার খুবই ভাল লাগে। অনেক কিছুরই ইচ্ছে ছিল। হল না!"

রাতের গভীরে একা ঘরের নির্জনতায় সুবাস তার লাহিড়ীবৌদির বেদনাকে বোঝার চেষ্টা করেছে অনেক। তিনটি মেধাবী সন্তানের জননী আর সুদাস লাহিড়ীর মত এক সুন্দরের পূজারীর স্ত্রী হয়েও মহিলার অন্তরে বস্তুভোগের আকাঙ্ক্ষাটুকু যে থেকে থেকেই দহনের জ্বালা বয়ে আনে সেকি নারী প্রকৃতির চিরন্তন সত্য? সুবাস আচার্য আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু বুঝে পায় না। খুঁজে পায় না কেন হয়? কেমন করে হয়? সুবাস কষ্ট পায়, বিছনায় এপাশ ওপাশ করে। তার পরে নিজের অজান্তে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়ে।

বাঁকুড়ার পাট একদিন চুকে গেল লাহিড়ীদার। অবসর নিলেন সেখান থেকেই। অন্যত্র বদলীর আদেশ এসেছিল। এসেছিল স-প্রমোশন কলকাতায় পোস্টিং অর্ডার। সে সবই লাহিড়ীদা এড়িয়ে গেলেন। বাগানের টানে আর বিকেলের আকর্ষণে লাহিড়ীদা অর্থ এবং কলকাতাকে যোগ্য সম্মান দিলেন না। লাহিড়ী বৌদি অনেক বুঝিয়েও কিছুই করতে পারলেন না। ছেলেরা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেল। একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অন্যজন শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যাপনায় নিজ নিজ ভবিষ্যৎ গড়ে নিল। মেয়ের বিয়ে দিলেন। ভাল পাত্র, ভাল ঘর। সে গেল সংসার করতে। লাহিড়ীদার পারিবারিক যোগাযোগ শত পথ বেয়ে বেয়ে বহু যোজন বিস্তৃত। নিজের 'লাহিড়ী' দিকে এবং স্ত্রীর 'রায়' সংযোগে। এসব কথা সুবাস অনেক পরে পরে, একে একে জেনেছে।

লাহিড়ীদের সঙ্গে বহুদিন আর কোনও দৈনন্দিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি। সুবাস নিজেই একদিন সময়ের স্রোত বেয়ে আর নানান অসময়ের পীড়ন চিহ্ন

অঙ্গে-অন্তরে বয়ে বয়ে অবসর জীবনের ঘাটে এসে ঠেকল। চিঠি পত্রের আদান প্রদান সেই অতীতের বাগান-ঘেরা বাঁকুড়ার সম্পন্ন অতীতের স্মরণ সড়কটি দীর্ঘদিনই খোলা রেখেছে। লাহিড়ীদার মৌন নৈকট্য যেমন সরব হতে পারত, তেমনি এখন সুবাস দেখল লাহিড়ীদার দু-চার ছত্রের চিঠিও কেমন অনায়াসে আন্তরিক হতে পারে। লাহিড়ীদার বড় ছেলে এখন আমেরিকায় কোনও এক নামজাদা সংস্থায় কর্মরত। মেজো বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। দু'টি মাত্র উজ্জ্বল সন্তান নিয়ে মেয়েটি এখন সুখী পরিবার। নানান অনুষ্ঠানে সুবাস সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়েছে সুদাসগৃহে। সুদাস লাহিড়ীও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন সপরিবারে সুবাস আবাসে। চোখের আড়ালে গিয়েও তাই মনের আড়ালটি ঘটেনি আচার্য-লাহিড়ী জীবনে।

মনের আড়াল ঘটেনি বটে কিন্তু মানের আড়ালটি ঘটে গেছে। মনে হয়েছে সুবাসের যে লাহিড়ীদার স্ট্যান্ডার্ড অনেক বদলে গেছে। শেষের দিকে লাহিড়ীদার ডাকে তাঁর বারাকপুরের বাড়িতে সুবাস একবার দু'বার গেছে। গেছে কিন্তু লাহিড়ীদাকে আর খুঁজে পায় নি। বাঁকুড়ার লাহিড়ীদাকে বারাকপুরের ত্রিতল অট্টালিকার আড়ালে বার বার দেখছে কিন্তু সেই সবুজের বুকে সুন্দরের অনুভবে মৌন মুখর লাহিড়ীদার স্পর্শটি আর খুঁজে পায় নি। এখন তিনি মিঃ সুদাস লাহিড়ী। স্থানীয় এম,এল,এ তাঁর সকল অনুষ্ঠানে আসা যাওয়া করেন। এস, ডি, ও, এস, ডি, পি, ও-রা মিস্টার লাহিড়ীর দেওয়া লাঞ্চ ডিনারে উপস্থিত থাকেন। লাহিড়ী বৌদির বদলে মিসেস লাহিড়ী সম্ভাষণে অধিকতর প্রীতি বোধ করেন সুদাস গৃহিনী। ঘরে আসবাবপত্রের অঢেল উপস্থিতি আর মূল্যবান বিন্যাস সোচ্চারে বিত্তের ঊর্ধ্বস্তরটির ঘোষণা করে চলেছে। মিসেস লাহিড়ী আনন্দকে ধরে রেখেছেন নিজের পোষাকে-অলংকারের ঔজ্জ্বল্যে, সুখের অনুভবকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কণ্ঠের অনর্গল ওঠানামার যতি-ছন্দে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সুবাস মনে মনে লাহিড়ীদাকে খুঁজে বেড়ায়। একবার বাগান ঘেরা বাঁকুড়ার গৃহাঙ্গণে আরাম কেদারায়, একবার বারাকপুরের ত্রিতল অট্টালিকায়, একবার হাতে ধরা সদ্য পাওয়া চিঠির মধ্যে। যে আন্তরিকতা নিয়ে সেই প্রথম পরিচয়ের দিন চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন

সেই একই সজীব সরস আন্তরিকতা চিঠিটির ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়ছে। লিখেছেন, 'তুমি অবশ্যই আসবে সুবাস। আসবে অবশ্যই। এটি আমার শেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। এর পরে তোমাকে আমার আর ডাকার সময় না-ও আসতে পারে। অথবা সুযোগটিও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কারণ নাতির এই অন্নপ্রাশন শেষ করেই আমরা আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। তোমার বৌদির আবদার আর আমার বড়ছেলের অনুরোধ। কবে ফিরব অথবা আদৌ ফিরব কিনা তা আমার জানা নেই। তুমি না এলে আমার সকল আয়োজনকে আমি ব্যর্থ বলে মনে করব।'

অত্যন্ত নরম বোধ করে সুবাস। অতীতে 'আর না'—বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিল তা যেন নরম হয়ে আসতে চায়। গত তিনচার বছরে লাহিড়ীদা সপরিবারে সুবাস আলয়ে এসেছেন। এসেছেন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অথবা এমনিই, কোথায়ও যাতায়াতের পথে। সুবাস যাওয়া বন্ধ করে চিঠি এবং উপহার প্রেরণকেই উচিত বলে স্থির করে নিয়েছে। কিন্তু সে সব অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ ছিল আনুষ্ঠানিক। আর আজ লাহিড়ীদার চিঠিটি যেন কথা বলে উঠছে—সুবাসবাবু, এটা আমার শেষ সামাজিক অনুষ্ঠান, তোমাকে আসতেই হবে·······—সুবাসের মনের গভীরে একটার পর একটা ঢেউ যেন অতীত থেকে দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসছে! অস্থির করে তুলছে সুবাসের সিদ্ধান্তকে।

আজীবন সুবাস চেয়েছে একটি নীড়। শান্তির নীড়। ভোগের উপকরণ ওকে কখনও হাতছানি দেয় নি। আনন্দের অনুভবকে সে নিজের মধ্যে একান্ত করে ধরে রাখতে চেয়েছে আর আপন জনেদের মধ্যে ভাগ করে উপভোগ করতে চেয়েছে। যাকেই সে আপন বলে মনে করেছে তাকেই সে আনন্দের ভাগ দিতে চেষ্টা করেছে, তার কাছ থেকে আনন্দ খুঁজে নিতে চেয়েছে। ভালবাসা। শুধু ভালবাসাই সুবাসের আজীবন কাম্য। তাই সেবার, সেই শেষবার, সুবাস যখন বারাকপুরে গেল আর তার লাহিড়ী বৌদি যখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের অঙ্গসাজ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তখনই সে জেনে গেল তার বৌদি অতীতকে হারিয়ে ফেলেছেন। এই বৌদি তার অচেনা।

চিঠির মধ্যে লাহিড়ীদাকে যেন নতুন করে খুঁজে পেল। তাই অস্থিরতা কাটিয়ে সুবাস স্থির করল যে সে যাবে। স্ত্রীও বললেন, "সে কি? কেন

যাবে না ? অমন করে লিখেছেন ! আপন বলে মনে করেন বলেই তো নিজের বলে ডেকেছেন। অবশ্যই যাবে।" সুবাস মনে মনে অনেক জোর পেল।

দুটো বাড়ি মিলে অনুষ্ঠানটা ছড়ানো। নিজেদের সুপ্রশস্ত আবাসে সব কিছু ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। পাশেই একটা দোতলা ভাড়া-বাড়ির সবটা ভাড়া নেওয়া। প্যান্ডেল, ডেকরেশন, সানাই, আলোর রোশনাই—সব মিলে একটা উৎসব যেন এবাড়ি-ওবাড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সম্পন্নতার ছোঁয়ায় ঔজ্বল্য যেন ছিটকে ছিটকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সুবাস ঘরে ঢুকে অপরিচিতের ঢল পার হয়ে বৌদির খোঁজ করল, লাহিড়ীদার সন্ধান নিল। লাহিড়ীদার মেয়েটির নজর পড়তে সে এগিয়ে এলো। প্রণাম করে উঠতেই সুবাস জানতে চাইল, "কেমন আছ ? বৌদি কোথায় ? একটু ডেকে দিও। লাহিড়ীদা ?" প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই পাশের বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন লাহিড়ী বৌদি। না, লাহিড়ী বৌদি নয়, মিসেস লাহিড়ী! তার চোখের সামনে বাঁকুড়া ভেসে ওঠল। প্রশ্ন করল সুবাস, "কেমন আছেন বৌদি ? লাহিড়ীদা কোথায় ?" সুবাসের কথাগুলো হারিয়ে গেল মিসেস লাহিড়ীর উচ্ছল উদ্বেল সম্ভাষণে, "হ্যালো মিসেস সেন, কখন এলেন ? মিস্টার সেন কোথায় ? হ্যালো, হালদার ? কবে ফিরলেন স্টেটস্‌ থেকে ?" মিসেস লাহিড়ীর মেয়ে কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে জানাল, "মা, সুবাস কাকু এসেছেন।" মা একটু ঘুরে বললেন, "এসে গেছো ? তোমার দাদা তো ও বাড়িতে। ওখানেই সব ব্যবস্থা করেছি। এখানে একটা বাড়িতে স্থান সংকুলান হবে না তো। তাই।" সুবাস জানতে চাইল, "কেমন আছেন বৌদি ? ছেলেরা ?" "সবাই ভাল আছে। বড় ছেলে তো এসেছে। দেখা হয় নি তোমার সঙ্গে ? আমরা স্টেট্‌সে যাচ্ছি। ছেলে নিয়ে যাচ্ছে।" বলেই তিনি মিসেস চ্যাটার্জীকে সম্ভাষণ জানালেন। তাঁকে হাত ধরে সোফায় বসালেন। খোঁজ খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সুবাস বেরিয়ে এসেছিল কালক্ষেপ না করেই। ও বাড়িতে উৎসব অঙ্গনে পৌঁছে লাহিড়ীদার খোঁজ করতে করতে দোতলায় তাঁকে পেয়েও গেল। ব্যস্ততম ব্যক্তি। নিমন্ত্রিতরা একে একে আসছেন। একে 'আসুন আসুন'

ওকে 'বসুন বসুন' করে আপ্যায়ন করছেন। এঁকে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎই সুবাসের দিকে চোখ পড়তে দুপা এগিয়ে এলেন, "আরে এসে গেছ? এত দেরি করলে কেন? আর সব কই?" সুবাস 'আর সব'দের না আসার কারণ বলতে গেল। বলতে গিয়েই থেমে গেল। লাহিড়ীদা বললেন, "এসো, পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি মিস্টার সেন, লোকাল এমএলএ। আর ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিস্টার আচার্য। একসঙ্গে বাঁকুড়ায় দীর্ঘদিন কাটিয়েছি।" বলেই এগিয়ে গেলেন অন্য এক সদ্য আগত নিমন্ত্রিতের দিকে, "আরে আসুন আসুন মিঃ হালদার। এত দেরি করলেন কেন? আর সব কই?"

সুবাস চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটা ফাঁকা চেয়ার দেখে বসে পড়ল। এক বাড়ি ভিড়ের মধ্যে একেবারে একা হয়ে ও যেন এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেল। একাকিত্ব যে এমন মধুর হতে পারে তা সুবাসের আগে জানা ছিল না!

চলে আসার সময়ে আর একবার লাহিড়ীদার খোঁজ করল। বসার ঘরের সোফাতে তাঁকে আবিষ্কার করে বলল, "এবারে যাই লাহিড়ীদা। রাত হল।" একখানা 'খাম' পকেট থেকে বার করে লাহিড়ীদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নাতি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা এনেছিলাম। আশীর্বাদ।" হাত থেকে খাম খানা নিয়ে লাহিড়ীদা বললেন, "ঠিক আছে। ভাল কথা, সুবাস, জানত' সামনের সপ্তাহেই আমরা আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। বড় ছেলের ওখানে।" সুবাস বলল, "আপনার চিঠিতেই জেনেছি।" 'ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে লাহিড়ীদা একটু যেন হাসলেন।

সুবাস ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলো। সামনেই বড় রাস্তা। সে আর একবার জনারণ্যে হারিয়ে গেল। আর একবার একা হতে পেরে যেন স্বস্তি পেল!

———

॥ অনুকেতনের আপনজন ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই কিছু কিছু বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটে। কোষ্ঠি বিচারের গুরু-লঘু অন্বেষণে অথবা হস্তরেখার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও সে সব যোগাযোগের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও ধরা পড়ে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে ঘটে। ঘটে যায়। অনুকেতনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় এ-রকমেরই একটা অ-দৃষ্ট পূর্ব ঘটনা। অনুকেতন লাহি। জীবনের সাতটি দশক একে একে কেতন উড়িয়ে পার করে দিয়ে অনুবাবু এখন প্রায় স্থবির। দু'দুটি স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডান দিকটি তাঁর অধিকার সর্বতোভাবে মান্য করে না। প্যারালিসিস্। ছ'ফুটের উপর দীর্ঘ দেহ, দশাসই চেহারা। বিরাট প্রাসাদোপম প্রশস্ত এবং বিন্যস্ত বাসগৃহ। বাঁকুড়া শহরের সংলগ্ন উপকণ্ঠে সম্পন্ন পরিবারের বর্তমান প্রধান অনুবাবু অবিবাহিত। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক তাঁর পিতা যখন দেহত্যাগ করেন তখন তিনি তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে যান। সঙ্গে রেখে যান দু'তিন পুরুষের পায়ের উপর পা রেখে জীবন পার করে দেবার মত সমৃদ্ধি। অনুবাবু বাবার যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে প্রাপ্ত সমৃদ্ধিকেই অধিকতর সমৃদ্ধ করতে জীবন পাত করলেন। একমাত্র তফাৎ এই যে উত্তর পুরুষের আবাহন করতে নিজে তিনি একেবারেই তৎপর হলেন না। সে দায় সঁপে দিলেন অন্য দুই ভাইয়ের কাঁধে।

অনুকেতনবাবুকে পেলাম আমার কন্যার মাধ্যমে। বাঁকুড়ায় একটা কলেজে অধ্যাপিকা। অনুকেতনবাবুর দোতলায় সে দুখানা ঘর নিয়ে আছে। আমার অবসর জীবনের একাকিত্বের বিষয় জেনে বলেছিলেন, 'বাবাকে এখানে আসতে বলবে আলাপ পরিচয় হবে। দু'চার দিন বাঁকুড়ায় থেকে গেলে ভাল লাগবে। বলবে বাবাকে।' মেয়ে অবশ্যই প্রথাসিদ্ধ মতে বলেছে, 'বলব, নিশ্চই বলব।' তা, সেই অনুকেতনবাবুর আমন্ত্রণ আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে অনেক অন্য তথ্যও সে উদ্ঘাটন করেছিল। যেমন সে জেনেছে, যা সে শুনেছে। মেয়ের কাছেই প্রথম সেই একা-জীবনের কথা শুনে আমার আগ্রহ বেড়েছিল। মেয়ে বলেছিল 'জান বাপি, সারা জীবন সংসার না পেতেও ভদ্রলোক আকণ্ঠ সংসারী। অত্যন্ত বিষয়ী। গোয়ালে গরুবাছুর, মাঠে মাঠে ফসল।

দরিদ্র কোন এক প্রজার কাছ থেকে দু'টি মেয়েকে এনে রেখেছে। তারা একই সঙ্গে অনুকেতন, গবাদি পশু এবং ফসলের দেখাশুনা করে। অত্যন্ত নম্র, অত্যল্পে তুষ্ট। এই মেয়ে দু'টিই যাকিছু প্রাণবন্ত ঐ বাড়িতে।'

আমি মজা করে বলেছিলাম, 'এতো সেই এক যে ছিল জমিদার-এর গল্প হল। জমিদারের কেউ ছিল না। মনে ছিল দুঃখ। একা থাকার দুঃখ। তার ছিল দুই সেবিকা। সেবিকারা দিন রাত মন দিয়ে তাঁর সেবা করত। কিন্তু তোমার গল্পে সেবিকাদের কথাটা নেই। তাদের ও তো মন আছে। মনে দুঃখ আছে—না থাকলেও অন্তত থাকার কথা। দিনরাত এক প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধের সেবায় দু'টি যৌবন নিয়োজিত। ট্রাজেডিটা বৃদ্ধের না যুবতীদ্বয়ের?'

মেয়ে আমার রেগে টং হয়ে গেল, 'আমি তোমাকে অনুকেতনবাবুর কথা বলছিলাম। তাঁর আমন্ত্রণের কথা বলছিলাম। রাধা আর সুরমার কথাটা প্রাসঙ্গিক চলে এসেছে মাত্র। আর তুমি কিনা সাদামাঠা এই ব্যাপারটার মধ্যেও ট্রাজেডির সন্ধান করছ?' আমি রণে ভঙ্গ দেবার মত করে বললাম, 'আমার ঘাট হয়েছে। বিপদ দেখলে পণ্ডিত ব্যক্তিরা অর্ধেক ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই বিপদ যদি নারী উৎসজাত হয়, সবিশেষ নিজের মেয়ে, তাহলে অর্ধেক নয় সর্বস্ব ত্যাগ করে বিপদ থেকে মুক্তি অন্বেষণ বিহিত। সুতরাং এখন তুমিই বল, আমি শুনি।'

কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে সম্ভবত আমার আগ্রহ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে মেয়ে বলেছিল, 'অনুকেতনবাবুর নিজের সন্তান নেই কিন্তু ভাই-এর ছেলেমেয়েরা আছে। নিজের স্ত্রী-ব্যাপারটা ঘটতেই দিলেন না কিন্তু ভাই-এর স্ত্রীরা আছেন। এখন ভাইরা সকলেই গত হয়েছেন। তাঁদের এক বিধবা এখনও বেঁচে আছেন। এঁদের কেউ আছেন কলকাতায়, কেউ সল্ট লেকে কেউ বা একেবারে বাংলাদেশের বাইরে। সকলেই প্রতিষ্ঠিত। বাড়ি গাড়ি ফ্ল্যাট—যে যেমন পারে জীবনকে ভোগে-উপভোগে ভরপুর করে তুলেছেন।' আমি জানতে চাইলাম, 'ওরা অনুকেতন বাবুকে দেখতে আসে না? বাঁকুড়ায়?' মেয়ে জানাল, 'রাধা আর সুরমার কাছে শুনেছি আগে আগে বছরে দু'একবার আসতেন। তখন অনুকেতনবাবু সুস্থ সবল ছিলেন। অত্যন্ত সচল এবং কর্মক্ষম ছিলেন। স্ট্রোকটা হবার পর থেকে ধীরে ধীরে যেন

সব কেমন হয়ে গেল। এখন তো দুবছর তিন বছরে একবার আসে কি আসে না।'

প্রথম প্রথম এই অনুকেতনবাবুকে নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। থাকার কথাও নয়। তিনি আমার মেয়ের বাড়িওয়ালা। আমার মেয়ের বাসস্থানের ভাল-মন্দের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এই মাত্র। তাছাড়া যা ছিল তা তাঁর বয়স এবং অসুস্থতা। একজন আজীবন একা একা বৃদ্ধের শেষ জীবনে পঙ্গুত্ব যে কতটা বেদনাদায়ক তা অনুভবের বিষয়। কিন্তু প্রত্যেকবার মেয়ে বাঁকুড়া থেকে ফিরে এলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কিছুটা অনুকেতন প্রাই পরিবেশিত হয়। 'জান বাপি, অনুকেতন বাবু বেশ ধুম ধাম করেই রাধার বিয়ে দিয়ে দিলেন। তিনিই সব খরচ পত্তর করলেন। এমন কি তাঁর বাড়িতে বসেই বিয়েটা হল।' শুনে বলতেই হল, 'বাঃ বেশ ভাল লোক তো। সহানুভূতিশীল এবং পরার্থপরও বটেন!' মেয়ে জানাল, 'ছেলেটি স্থানীয়। অনেক টাকা চেয়েছিল। বরপণ হিসেবে। ব্যবসায়ের নাম করে টাকাটা অবশ্য চেয়েছিল। অনুকেতনবাবু দেন নি। বলেছেন প্রয়োজন হলে যা চেয়েছে তার চাইতেও বেশি দিতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু নগদ দেবেন না এক পয়সাও। বেশ কড়া লোক বলতে হবে, বল?' বলেছিলাম, 'সে তো বলতেই হবে। কিন্তু টাকাটা তিনি দিতেই বা রাজি হলেন কেন?' মেয়ে যেন অনেকটা অবাক হয়ে বলল, 'বাঃ রে, দেবেনই বা না কেন? গ্রামের ছেলে। রোজগারপাতি তেমন কিছু নেই। কিন্তু ছেলেটি অনুকেতন বাবুর চেনা। ভাল ছেলে। রাধাদেরও চেনা। সকলেরই পছন্দ। এমন কি সব শুনেটুনে রাধারও অপছন্দ হল না। তা সেই ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করবে কে?' আমাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে মেয়ে যেন অসন্তুষ্ট হয়েই বলে উঠল, 'তুমি তো বলবে যে সে দায় ছেলের এবং ছেলের মা-বাবার। অনুকেতন বাবুর কেন হবে! তাই তো? কিন্তু রাধাকে তিনি নিজের মেয়ের মত দেখেন বলেই সেই রাধার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি টাকা দিতে রাজি হলেন। কেন হবেন না?' আমি বললাম, 'তাই বলে বরপণ? আর তুমি তার পক্ষে ওকালতি করছ? 'ডাউরি'-র সমর্থন করছ?'

আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেয়ে কণ্ঠে অভিমান মিশিয়ে বলল, 'তুমি যে ঠিকই বুঝেছ তা আমি জানি। এবং এও জানি যে

আমাকে খোঁচানোর জন্যেই তুমি অমন উল্টো কথা বলছ। অনুকেতনবাবু নগদ টাকা দিয়ে ব্যবসায়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিতে এবং তার জন্যে যত টাকা লাগে তা দিতে রাজি। এটা বরপণ হল? না, প্রতিষ্ঠা দান করার প্রস্তাব হল।'

আমি বলেছিলাম, 'তোমার কথাই ঠিক। তবে তুমি যে আগে একদিন বলেছিলে অনুকেতনবাবু ভীষণ কৃপণ, হিসেবী?' সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বলেছিল, 'সে তো বলেছিলাম কাড়ি ভাড়া কমায় নি বলে। যা চেয়েছিলেন টায় টায় তাই নিয়েছেন। একতলাতেও ভাড়া আছে। এতটাকা কি করবেন তিনি? জমির ফসল, গরুর দুধ। অথচ ঘরে একটা ফ্রিজ কিনতে বলেছিলাম বলে বলেছিলেন আমাকে কিনতে!' আমি বলেছিলাম, 'তাহলে তুমি রাগ করে তাকে কৃপণ আর হিসেবী আখ্যা দিয়েছিলে? বিচার-বিবেচনা করে নয়?' মেয়ে যথেষ্ট অসন্তোষ গলায় রেখে বলেছিল, 'সবটা না শুনেই তুমি প্রশ্নটা তুললে। অনুকেতনবাবু কি কারণ দেখিয়েছিলেন তুমি জান? বলেছিলেন চার-পাঁচ বছর পরে ভাইপোরা যখন এখানে, বাঁকুড়ার বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করতে আসবে তখন 'ডবল ডবল' হয়ে যাবে না? ওদের তো সকলেরই ফ্রিজ আছে। তখন?'

অপরিচিত অনুকেতনবাবুকে নিয়ে আর মেয়ের সঙ্গে তর্ক করি নি। তিনি ভাল থাকুন, শান্তিতে থাকুন, আনন্দে থাকুন। তবে ভেবেছি ওঁকে নিয়ে অনেক। সেটা অনুবাবু বলে নয়। আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থাকলে এক একজন অনুবাবু হয়ে যেতে পারি বলে। অনুবাবু অত্যন্ত 'স্পার্টান' জীবন যাপন করেন। নিজের জন্যে কোনও খরচপত্র করেন না। এমন কি মাঝে মধ্যে যখন একজন ডাক্তার ডেকে অনাটা রাধা বা সুরমা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে তখনও তিনি ওদের বাধা দেন। অকারণ খরচা বলে ওদের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। ওষুধ পত্রের দিকে একেবারেই যেতে চান না। খাদ্য পথ্য বিষয়ে অত্যন্ত অনীহা। ব্যাঙ্কের পাসবুকটির পৃষ্ঠিতেই নিজের তুষ্টি খোঁজেন। এটাই ওঁর বিরুদ্ধে ওঁর কন্যাসম রাধা-সুরমার অভিযোগ। আর এই অভিযোগই ওরা আমার মেয়ের কাছে করেছে। শত হলেও সমবয়সী এবং একই বাড়িতে থাকে। বিকেলে বিকেলে এটা ওটা করেও দেয়, এটা ওটা কবে দু'চার টুকরো মনের কথাও বলে আমার মেয়ের কাছে।

প্রত্যেক সপ্তাহান্তে মেয়ে আসে বাড়িতে। হাজারো কথা হয়। সেই কথার ফাঁকে-ফোকরে অনুকেতনবাবুও এক আধবার ঢুকে পড়েন। কখনও মন দিয়ে শুনি কখনও মন দিই না। এবারে একটা ঘটনা জানাল। সুরমা বলেছে। বছর তিনেক আগের কথা। অনুবাবুর বৌদি তখন এখানে ছিলেন। শরীর অসুস্থ বলে সেই বৃদ্ধাকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় ছেলেরা। তিনি অবশ্য মাঝে মাঝেই এখানে এসে থাকতেন। তা, সেবারের থাকাটা বেশ দীর্ঘ হল। রাণীর মতো চেহারা মহারাণীর মতো থাকতেন। বড়লোকের বাড়ির গিন্নী। খাঁটি সোনার গয়না সব সময়ই গায়ে থাকত। গলায় চওড়া সীতাপাটি হার। দুই লহরা। হাতে চার গাছা করে চুরি। মোটা পেটাসোনার বালা। রাধা আর সুরমাকে খুবই স্নেহ করেন। ওরাও সব সময়ে বড়মার মন যুগিয়ে চলে। তা, তিনি ধীরে ধীরে বিছানা নিলেন। সোনার বরন কালি হয়ে গেল। নধরকান্তি দেবী হারিয়ে গেলেন শীর্ণকায়া বৃদ্ধার কঙ্কালসার দেহের মধ্যে। ওরা আড়ালে চোখ মোছে আর সামনে সতর্ক যত্নে বড়মার শেষের দিনগুলোকে ভরিয়ে দিতে চায়। অনুবাবু সদাসর্বদা খোঁজ খবর নেন। দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তা যেন সকলেই টের পায়। ডাক্তার বলে গেলেন ছেলেমেয়েদের খবর দিন।

মেয়ের মুখে সুরমার কথা। এক মনে শুনছিলাম। 'জান বাপি সুরমা বলতে বলতে এই এতদিন পরেও আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছছিল। ছেলেরা এলো। বৌরা এলো। নাতিনাতনীরাও এলো। রাধা আর সুরমার কাজ চতুর্গুণ বেড়ে গেল।' বলেই মেয়ে বলল, 'সুরমার কথাতেই বলি—সারাদিন হয় আমি নয় রাধা—একজন ঠায় বড়মার কাছে বসে থাকি। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। সব কাজই বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তার পরে এমন হল যে বার বার বিছানা বা বিছানার চাদর পাল্টাতে হয়, বড়মাকে পরিষ্কার করে দিতে হয়। দুই বউ-এর একজনও বেশিক্ষণ কাছে থাকে না। ছেলেরা দিনান্তে দু একবার খোঁজ নিয়ে যে যার কাজে চলে যান। কাজ মানে উপরের ঘরে বসে বসে ছেলে বউ নিয়ে আড্ডা, নয়তো বেড়াতে যাওয়া। দু'ভাই, 'তার' করে দিলেন অফিসে। ছুটি বাড়ানোর জন্যে। আর সবজিওয়ালা আর মাছওয়ালাদের বলে দিলেন রোজ সকালে বাজার ঘরে দিয়ে যেতে। রাধা আর

সুরমার রাতে ঘুম নেই, দিনে অবসর নেই। আর অনুকেতনবাবুর অস্বস্তির শেষ নেই।'

'এরপর যা ঘটল তা তাজ্জব ব্যাপার', মেয়ে একটু থেমে জানাল, 'শুনে তুমি বিশ্বাস করবে না বাপি! একদিন দুপুরে শাশুড়ীর রোগশয্যার ধারে এসে দুই বউ ঘোষণা করল—শীর্ণদেহে সোনার গয়নাগুলো নিশ্চয়ই মায়ের দেহে 'ফুটছে'। তাই ওগুলো খুলে দেওয়া হোক। তারপর একে একে গলার হাতের সব গয়না একটা একটা করে খুলে নিল! বৃদ্ধা দেখতে পান সবই শুনতেও পান একটু একটু। কিন্তু হাতে-পায়ে একেবারেই শক্তি নেই, কণ্ঠে শব্দ নেই। সুরমা দেখেছিল বড়মার চোখের কোণ গড়িয়ে জলের ফোঁটা, গড়িয়ে না পড়ে স্থির হয়ে বড়মার দৃষ্টির মতই যেন নিথর হয়েছিল! ছেলেরা পাশে থেকে এই নগ্ন করণ প্রক্রিয়া দেখেছে। কিছুই বলে নি। সহ্য করতে না পেরে সুরমা ঘর থেকে বাইরে চলে এসেছিল। গোয়ালঘরের ধারে গিয়ে অঝোরে সে কেঁদেছিল সেই কান্না। অনুকেতন বাবুর চোখ এড়ায় নি। সব তিনি ধীরে ধীরে জেনে নিয়েছিলেন।' মেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তারপর? বড়মা কি সেদিনই মারা গেলেন?' 'না সেদিন তো নয়ই তার পরদিনও যখন একই ভাবে কেটে গেল তখন ছেলেদের আনচান্ বেড়ে গেল। তাঁদের ছুটি নেই। বউরা বললেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। ডাক্তারকে প্রশ্ন করেও কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর পেলেন না। তাই ওঁরা সকলেই যে যার স্থানে ফিরে গেলেন। বলে গেলেন প্রয়োজন হলে যেন আবার 'তার' করে দেওয়া হয়। নিঃস্ব রিক্ত শীর্ণকায় তাঁদের জননী, রাধা-সুরমার বড়মা, আর অনুকেতনবাবুর বৌদি সেই একান্ত করুণ অবস্থায় থেকে গেলেন। সম্ভবত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতও তার শক্তি ছিল না। সব জেনে এবং শুনে অনুকেতনবাবু কোনও দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন কিনা অথবা উদ্গত বেদনাবোধকে নিঃশেষে পান করে বৌদির শয্যাপার্শ্বে এসেছিলেন কিনা তা সুরমা জানে না। তবে সে দেখেছিল যে অনুকেতন বাবু, ওরা বলে কাকাবাবু, বৌদির শিয়রে অনেকক্ষণ একা একা বসেছিলেন।'

ওরা বোবা হয়ে সব দেখেছে, শুনেছে। বড়মার জন্যে চোখের জল মুছেছে আর সেবার মধ্যে ডুবে গেছে। কাকাবাবুর জন্যে দুঃখ বোধ করেছে। অসহায়

দৃষ্টিতে কাকাবাবু কি খুঁজেছেন তার হদিস্ পায় নি। তার পর একদিন সত্যিসত্যিই বড়মা চলে গেলেন। সুরমা আর রাধার মাথায় হাত দেবার চেষ্টা করলেন। শক্তির অভাবে সেই আশীর্বাদটুকুও মাঝপথে ঝরে পড়ে গেল। কাকাবাবু পাশেই বসে বসে বন্ধুকে শেষ বিদায় দিলেন। কাকাবাবুর চোখ থেকে দুফোটা তরল বিদায়-বিন্দু প্রিয় বৌদির শেষ যাত্রা পথের সঙ্গী হতেই যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এলো। ছেলে-ছেলেবৌরা কাছে থাকল না। বড়মার যাত্রায় তাতে কোনও বাধা হল না।

পুত্র পুত্রবধূরা এলেন। কাজকর্ম শেষ করে একদিন চলেও গেলেন। ছেলেরা কাকার সঙ্গে বসে বিষয় আশয় নিয়েও কথাবার্তা বললেন। বিলি-বিবরণ, বিধি-ব্যবস্থা এসবও আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত হল। বৌ-রা বাক্সপ্যাটরা সিন্দুক আলমারি নিয়ে ব্যস্ত হলেন, তল্লাশ করলেন। গোছান গাছান হল। তারপর একদিন বাড়িটা ফাঁকা করে দিয়ে যে যার চলেও গেলেন। শূন্য গৃহে দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে প্যারালিসিসে পঙ্গু কাকাবাবু পড়ে রইলেন বৌদির স্মৃতি নিয়ে। আর রইল রাধা আর সুরমা। আর গোয়াল ঘরে অবলা প্রাণীগুলো—বড়মার অত্যন্ত আপন পোষ্যরা !

দু'এক মাস যেতে না যেতেই কাকাবাবু সুরমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'ঘরবাড়ি কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। রিপেয়ার-টিপেয়ার করে ভাড়া দিলে কেমন হয় রে ?' সুরমা বলেছিল, 'আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। তবে যদি দাদাবাবুরা আসেন ? থাকবেন কোথায় ? সে কথার কোনও উত্তর দেননি কাকাবাবু। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। আর বাইরের আকাশের দিকে স্থির তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। কাকাবাবুর মনের কষ্টটা সুরমা টের পেয়েছিল। কিন্তু সেটা যে সঠিক কেমন, কত গভীর ছিল সেই বেদনাবোধ তা এই সরল গ্রাম্য মেয়েটির অনুভবে ধরা পড়েছিল কি ?

সারাজীবন একা একা কাটিয়ে দিয়ে এই শেষ বেলায় জীবনকে তিনি যেন আর কাছে থেকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না ! স্ত্রী কখনও ছিল না বলে জীবনে একটি স্পর্শ থেকে তিনি স্বেচ্ছা-বঞ্চিত। নিজের সন্তান ছিল না বলে ভাইপোদের প্রতি তিনি তাঁর আজীবনের স্নেহসঞ্চয়কে প্রবাহিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু জীবন বোধহয় বড়ই নিষ্ঠুর। সে ক্ষমা করতে জানে না। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে সে সামনে এনে দাঁড় করায় কিন্তু

প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয় না। জীবনের নাট্যমঞ্চে যেমন পুত্র-কলত্রদের স্নেহ মায়া মমতাহীন নির্দয় নিষ্ঠুর বস্তুনিষ্ঠ দাপাদাপি দেখেছেন, তেমনি অনুকেতন লাই সেই নাট্যমঞ্চের গ্রীনরুমে সজল চোখের নিরলস সেবা, মায়া-মমতার স্বতস্ফূর্ত প্রবাহটুকুও দেখেছেন, দেখছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ তিনি অস্থির বোধ করছেন। সঠিক পথের নির্দেশটি সহজপথে খুঁজে পাচ্ছেন না।

মেয়ে বলেছিল, 'প্রত্যেকের জীবনই এক একটা গোলকধাঁধা। এক একটা 'প্রেডিকামেন্ট' তাই না ?' আমি কোনও উত্তর দেই নি। উত্তর দেই নি কারণ ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনুকেতনবাবুর ভাবনাকে আমি আমার নিজের ভাবনা বলে মনে করছিলাম। আমার নিজের এবং আমাদের মত সকলের। সকল অনুকেতনদের। আমাদের প্রত্যেকেরই সারাজীবনের সংগ্রহ আমরা আপনজনের জন্যে জমা করতে থাকি। সেই আপনজন কখনও নিজের সন্তানসন্ততি কখনও, অনুবাবুর মত, ভাইপো ভাইঝিরা। কিন্তু যখন জীবনের সব সময়টুকুই আমরা পার করে আসি, খরচা করে ফেলি তখন সেই স্তূপাকৃতি সংগ্রহকে নিয়ে আমরা বিপদে পড়ে যাই। এই বিপদ আসে একটা বিরোধ হয়ে। ধারণার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ। আমার নিজের মনের মধ্যে দীর্ঘ স্নেহ প্রীতি সেচনে যে আপন-এর ধারণা একটা মোহন অনুভবে আমাকে সততই প্রভাবিত করে, আর অন্যদিকে সেই সব রক্ত মাংসের, প্রকৃতি পরিবেশের, 'আপন'-রা যারা মনের জমিতে শতযোজন দূরে চলে যায়, চলে গেছে।

চিন্তায় বাধা পড়ল। মেয়ে বলে উঠল, তুমি কি ভাবছ ? আমার কথাটা তুমি শোনই নি মনে হচ্ছে।' বললাম, 'শুনেছি। ঠিকই বলেছ। মানুষের মনে স্নেহ মায়া মমতা তো আছেই, থাকবেই। আর এ-সবই তো নিম্নমুখী। শুধু যদি এটুকুই সত্য হত তা হলে সমস্যা হত না, বিরোধের যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না মানুষকে। মানুষের মনের মধ্যে যে একটা বিচার বুদ্ধি একটা চিন্তা ভাবনার কল পাতা আছে তাতেই হয়েছে সমূহ বিপদ। সেখানেই উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্বটি মাথা চাড়া দেয়, 'প্রেডিকামেন্ট' তৈরি করে। তুমি মনে কর অনুবাবুর নিজের স্ত্রী পুত্রকন্যা থাকলে এই দ্বন্দ্ব ঘটত না ? এই 'প্রেডিকামেন্ট' ?'

মেয়ে সংগে সংগেই জানাল, 'না। একেবারেই তা মনে করিনা। নিজের সন্তান আর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে কথা নয়। কথাটা স্নেহের, বিষয়টা স্নেহান্ধতার। পিতা না হয়েও পিতৃত্ব, মাতা না হয়েও মাতৃস্নেহ মানুষের স্বভাব অর্জন। আর সেখানে প্রত্যেকেই অন্ধ, মায়া মমতার মোহে আচ্ছন্ন। বুদ্ধি-বিবেচনা বোধহয় সেখানে তেমন কাজ করে না। বারে বারে আঘাত হানতে পারে, বিপন্ন করে তুলতে পারে কিন্তু কূলে পৌঁছে দিতে পারে কিনা তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' আমি বললাম, 'সেটাই তো দ্বন্দ্ব, প্রেডিকামেন্ট। আমরা যে নিজ নিজ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা স্নেহের গণ্ডি পার হয়ে বিচারের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পা ফেলতে পারি না সে তো আমাদের নিজ নিজ অর্জন। 'শিশু যেমন তার একান্ত নিজের বলে হাতের মার্বেল-চকোলেট-লাটাইটিকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে, দেহের পিছনে লুকিয়ে ফেলে, কাউকে দিতে চায় না, আমরাও তেমনি সারাজীবনের সংগ্রহকে মুষ্টিবদ্ধ করে স্নেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ফেলি। কাউকে ভাগ করে দিতে চাই না। আবার শিশু মায়ের বেলায় হাত খুলে দেয়, মেলে ধরে। আমরাও সন্তানসন্ততিদের বেলায় হাত খুলে দেই, মেলে ধরি। স্নেহভালবাসা এই কাজটি শিশুকেও করায়, আমাদেরও করায়। কিন্তু শিশুর বেলায় এটা কোনও দ্বন্দ্ব নয়, স্ববিরোধ নয়, প্রেডিকামেন্ট নয়। কারণ শিশুর ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচার ব্যাপারটাই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমাদের মত বুড়ো শিশুদের বেলায় ? হৃদয়ের রক্ত যদি চোখের জল হয়ে ঢল নামায় তাহলে সেই বিড়ম্বনার দায়ভাগ করে ঘাড়ে চাপাবো ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়ে বলল, 'অন্তরের বেদনাবোধকে নিয়ে দর্শনের আলোচনা চলতেই পারে। কিন্তু তাতে বেদনা বোধের কোনও হেরফের হয় কি ? অনুকেতনবাবুর জন্যে আমার দুঃখ হয়। যারা রোগ-শয্যায় শায়িত 'বড়মার' দেহ থেকে অকরুণ তৎপরতায় তাঁর অংগাভরণ একটা একটা করে নগ্ন ভোগ-বাসনায় খুলে নিল তারা ছাড়া অনুকেতনবাবুর আর আছেই বা কে ? যে সন্তানরা মায়ের মৃত্যুশিয়রে অপেক্ষা করার মত ছুটি পায় না কিন্তু মৃত্যুউত্তর উত্তরাধিকার স্থির করতে কাগজ-কলম নিয়ে বসার সময় পায়, তারা ছাড়া এই বৃদ্ধের আর আছেই বা কে ?'

মনে মনে ভাবলাম 'এটাই কি আমাদের শেষ জীবনের কাজ ? এই

একেএকে থলে বেঁচকা আগলানো আর অপেক্ষা করা ? আমাদের, বৃদ্ধাবস্থায় শেষ বেলাটি জনহীন একাকিত্বে তিলে তিলে বেঁচে থাকা ? আর সেই 'জনগণ', সেই আপনজনেরা ? তাদের যৌবন-প্রৌঢ়াবস্থায় উচ্ছল জীবনের গতিশীল স্রোতে আকণ্ঠ অবগাহন-উপভোগে লিপ্ত থাকবে ? এটাই চিরায়ত ? চার-পাঁচ বছর পরে কবে তাঁর মৃত্যুশয্যায় ভাইপোরা এসে দাঁড়াবে, তাদের বৌ-রা আঁচলে চোখ ঘষবে সেই দিনটির জন্যেই অনুকেতনবাবুকে অপেক্ষা করতে হবে ? করতেই হবে ? এমনও হতে পারে যে ছুটির অভাব বলে শয্যাপার্শ্বে এসে পৌঁছতে পারবে না একেবারে মৃতদেহে অগ্নিসংযোগের সময়েই এসে পড়বে তারা ? হতে পারেই শুধু নয়, হয়েও থাকে এমন। অজ্ঞাত নয় সে তথ্য অনুবাবুর জীবনে। আর তখন তাঁর আজীবনের একান্ত সুরক্ষায় সুরক্ষিত এই সম্পত্তিসংগ্রহ জলের দামে বিক্রি করে দিয়ে তাঁরই গন্ডি কাটা আপনজনেরা হর্ষমুখে স্বস্ব অদৃষ্টেরে শহরের ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা করে দেবে। পিতৃ-পিতৃব্যদত্ত এই হবে তাদের উপহার—আপনজন-জনিত উপহার। আর অনুকেতনবাবুর আত্মার বায়ুভূত অস্তিত্বেরে সেই হর্ষধ্বনি করবে উপহাস ! এটা কি আমাদের বিধিলিপি না আমাদের নিজ নিজ অর্জনের জীবনান্ত 'ব্যালান্স-শীট' ?

মেয়ে বলল, 'কি ভাবছ এত ? অতীত না ভবিষ্যৎ ?' আমি বললাম, 'দুইই ভাবছি। ভাবছি অনুকেতনবাবুকে, অনুকেতন বাবুদের। আমরা সকলেই এক একজন আজীবন পতাকাবাহী। সে কেতন অণুই হোক আর বৃহৎই হোক। সেই পতাকার গায়ে লেখা আছে আপনজনের কথা, চিন্তানা আছে সেই আপনজনেদের ঘিরে। এখানেই আমাদের ট্রাজেডি।' মেয়ে বলে উঠল, 'ট্রাজেডি কেন ? এই আপনজন বলতে নিজের সন্তানসন্ততি না বুঝে সমাজকে বুঝলেই হয়, দেশ বা মাদার টেরেসা বা রামকৃষ্ণ মিশন। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় !'

'সে তো যায়। অবশ্যই যায়। কিন্তু সারাটা জীবন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে একটা বিশ্বাস একটা চেতনা একটা আকাঙ্ক্ষাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে বাঁচতে হঠাৎ শেষ জীবনে এসে 'আপন'-বোধের মাটি থেকে নিজেকে মুক্ত করে 'সর্বজনের' বোধের আকাশে উড়ে যাওয়া কি আর সম্ভব হয় ? বিশেষ করে যখন জীবনের বাঁচা মানেই শুধু মৃত্যুর জন্যে পলে পলে পল গোনা তখন

এই 'উচিত' ভাবনাটা মনের মধ্যে অংকুর ছাড়লেও বিশ্বাসের জোর পায় কি?'

অনুকেতনবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, 'এখন কেমন আছেন?' একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বোধহয় আমার মেয়েকে এদিক ওদিক খুঁজলেন। দেখা না পেয়ে আবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'আছি আর কৈ মশাই! এ তো আমার নেই-হয়ে বেঁচে থাকা। আপন বলতে সারাজীবন যাদের ভেবে এলাম আর পর বলে যাদের চিহ্নিত করে করে জীবন কাটালাম তারাই আমার সব যেন কেমন গোলমাল করে দিল।' আমি বলেছিলাম, 'তা, আপনার ভাইপোরা মাঝে মধ্যে আসাযাওয়া করে না? চিঠিপত্র? কুশল জিজ্ঞাসা?' চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ করে বললেন, 'ওদের শত কাজ। ছুটিও পায় না সময়ও পায় না!' অনেকক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোনও কথা বলছি না। আমার কথা সেই মুহূর্তে নেই বলে। আর অনুবাবুর বোধহয় গুছিয়ে নেবার সময় চাই বলে। পরে বললেন, 'আর এই দেখুন রাধাকে, সুরমাকে। ওদেরও ছুটি নেই। আমাকে ছেড়ে এক দণ্ডও ওরা কোথায়ও যায় না। ওদেরও সময় নেই। সময় নেই আমাকে নিয়ে ওরা সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে বলে। ওরা তো আমার কেউই নয়। 'আপন' তো নয়ই। আমাদের প্রজার মেয়ে। 'স্লেভস্' বলতে পারেন। কিন্তু ওরাই আমার আত্মার আত্মীয়, পরিবারের আপন যদিও নয়।' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ ওদের কথা অনেক শুনেছি আমার মেয়ের কাছে।' হঠাৎই যেন একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে উঠলেন, 'আমি এখন আর একটা জীবন চাইছি। সারাজীবনের ভুলে আপন-বোধকে নোতুন করে শুধরে নেবার জন্যে। রক্তের গণ্ডি থেকে 'আপন'-কে মুক্তি দেবার পতাকা হাতে আর একটা জীবন চাই।' অনুকেতনবাবুর মর্মবেদনাকে আমি আমার নিজের অন্তরে বয়ে নিয়ে এসেছি। এই বাঁকুড়া যাওয়াটা আমার সফল হয়ে গেল।

———

।। তুমি ।।

তুমি বলেছিলে 'যদি কখনও কিছু লেখ তাহলে আমার কথাটাও কিন্তু লিখো।' তখন বেশ হাসি পেয়েছিল। তোমার কথা বলতে তো কিছুই প্রায় আমার জানা নেই। তুমি বলও নি কখন তেমন করে। বিস্তারিত করে বলতে চেয়েও তো বহুবারই থেমে গেছ। থেমে গেছ অথবা আমিই থামিয়ে দিয়েছি। কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা আমার তখন একেবারেই শুনতে ভাল লাগত না। নিজের জীবন নিয়েই যার যন্ত্রণার ঝুড়ি উপচে পড়ছিল তার পক্ষে অপরের যন্ত্রণার বোঝা বইবার মতো ফুরসত ছিল কোথায়? আমার জীবন বৃত্তে আমি ছুটন্ত ঘোড়ার মতো চতুর্দিকে তখন ছুটছি আর ছুটছি, মাঝে মাঝেই দিশেহারা, মাঝেমাঝে আবার দিক-পরিবর্তনের অনিবার্য ডাক। সেই দুর্জয় ঝ'ড়ো দিনে তোমার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন তোমাকে ভাল করে জানা তো দূরের কথা, দু'টো কথা বলারও সময় ছিল না। মনটাও যে ছিল তা নয়। আমি সংসারের চাকায় যান্ত্রিক ঘুরছি, ঘুরপাক খাচ্ছি। আর তুমি সংসারের চাপে, অভিভাবকের তাড়নায় ধিককৃত হচ্ছ, 'অপছন্দের' আর 'বাড়ি গিয়ে চিঠি দিয়ে জানাব'-র অনিবার্য এবং অনভিপ্রেত মূল্যায়নে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছ।

আমরা দুটি ভিন্ন কেন্দ্রে থেকেও পরিবৃত্ত-দৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই দু'জনে দু'জনকে দেখেছি. দেখেছি যেমন ঠিক তেমনিই আবার অদৃশ্য বিপরীত দূরত্বে সরে সরে গেছি। কাছে আসাটাও যেমন ছিল দৈবাৎ, কখনও সখনও-র ব্যাপার, দূরে সরে যাওয়াটাও ছিল তেমনি অনিবার্য, নিরপেক্ষ। আমরা অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করেও কাছে কাছে আসি নি। এই আসিনি যে তার কারণ আমাব সময় ছিল না, (মন ছিল কি না তা জানতাম না) আর তোমার নিজের পরে বিশ্বাস ছিল না, (আকাঙ্ক্ষা ছিল কি না তা তোমার চিত্তের ত্রিসীমানায় স্থান পায় নি বোধহয়)।

তুমি ক্রমশই কাছে এসেছিলে আমার মা'এর, আমাদের সংসারের এবং অনাদরে, অব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা আমার ভাইবোনের। তুমি চতুরা ছিলে না,

মুখরা ছিলে। অন্তত তাই ছিল তোমার বাইরের পরিচয়। এবং ঘোষিত ও।
তোমার মা'ই ছিলেন তোমার প্রধান বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান। আর আমার মায়ের মনের নরম-জমিতে সহানুভূতির সজল প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছিলে। আমার মা'ই ছিলেন তোমার প্রধান আশ্রয়দাতা। তাই কখনও সখনও তোমার কথা আমার কানে যখন এসেছে তখন বুঝেছি যে তুমি ঘরে অনাদৃত, বাইরে আদৃত ; ঘরে প্রয়োজনের ভাঙ্গাকুলো, বাইরে অতি প্রয়োজনীয় জলের ঘড়া। তোমাদের ঘরের উনুনে তোমার উপস্থিতি ছিল ঘৃতাহুতির মতো, মায়ের নিরাবলম্ব সংসারে তুমি ছিলে গোছানী। এসব শুনে শুনে তো আমার বেশ রাগই হবার কথা। কিন্তু হয়নি। হয় নি যে তার কারণ আমাদের অপরিষ্কার আদাড়-বাগান বাড়িটার' চেহারাখানা তুমি ধীরে ধীরে পাল্টে দিচ্ছিলে। আবাহন-বিসর্জনহীন তোমার দিনান্ত জীবনে মুখ চালনা করা ছাড়া অন্য কোনও কাজই তো ছিল না। তাই কিছুটা মাসিমার' কাছে, মাসিমার ঘরে কাটিয়েও যে অফুরন্ত অলস সময় বেঁচে থাকতো তাকে তুমি বাড়ি পরিষ্কার করার, বাগান বানানোর কাজে লাগিয়ে ছিলে। তোমার সময় কাজে লাগছিল, বাড়ির হাল ফিরছিল, আমার কোনও খরচা হচ্ছিল না, আর তোমার মায়ের মুখচালনার জমি বাড়ছিল। তোমার মায়ের সম্ভাষণের দু'চার টুকরো ছিট্‌কে-ছাট্‌কে আমার কাছ পর্যন্তও এসেছে। জীবন সংগ্রামে আমার অনুভবের ধার কমে গেছিল বলে তার সে-সব কটু-কথায় মন দিই নি। আর তুমি বোধহয় 'সাগরে বেঁধেছি ঘর নোনাজলে ভয় কি ?'—এরকম একটা দার্শনিক মানসিকতায় পেঁছে গেছিলে। শুনেছি যে এক দিকে পাশে দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে চলেছেন তোমার মা, '—পরের বাড়ি, পরের ঘর। তোর কি দরকার পরিষ্কার করার ? বাগান করার ? যদি ওরা কটু কথা বলে ?' আর নির্বিকার তুমি মাটি নাড়াচাড়া করে গাছের চারা পুঁতে চলেছো, গাছে জল দিয়েছো, তুলসীমঞ্চের ইঁটের গায়ে মাটির প্রলেপ লাগিয়েছো। একদিকে মেদিনী প্রকম্পিত করে তোমার মা দপ্‌দপ্‌ পা ফেলে চলে গেছেন, অন্যদিকে কাদামাখা হাত নিয়ে তুমি পুকুরের দিকে রওনা হয়েছো।

এ-সবই আমার শোনা কথা। দেখেছি পরিচ্ছন্নতার ধীর উপস্থিতি, আর দু'চারটি পাতার আন্দোলন ক্রমশই বাগানের সবুজ হয়ে হাতছানি

দিচ্ছে। এই একটি কারণেই তোমাকে মন্দ বলে মনে করা হয় নি। মনে হত না। যে মেয়ে নির্যাতন সহ্য করেও পরিচ্ছন্নতা-কামী, যন্ত্রণার মধ্যেও যে বাগানের পূজারী, সেই মেয়ের মধ্যে একটা সৃষ্টির বেদনা আছে, কোনও কিছু করার বাসনা আছে। সমাজে সে অবজ্ঞার পাত্রী নয়, সংসারে সে অনভিপ্রেত নয়।

কিন্তু তুমি কাল ছিলে। শুধু কাল নয় প্রাণহীন, তারুণ্যহীন একটি শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র। দেহে এবং মনে। কি করে এমন হয়? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর পালামৌ যাত্রায় পাথরকেও রসিক বলে জেনেছিলেন। তাই বিস্মিত হলেও মনে হয়েছিল এই কালো কষ্টি মেয়ের মধ্যেও প্রাণের সম্পদ আছে। অবশ্য এসব অনেক পরে ভেবেছি। যখনকার কথা বলছি তখন ভাববার মতো সময় আমার কোথায়? একদিকে সংসারের হিপো-সমান মুখগহ্বর সদাই হাঁ করে আছে অন্যদিকে চাকরি, পড়াশুনো এবং অসম্পূর্ণ বাড়ি-ঘরের কোথায়ও না কোথায়ও তালি-তাপ্পি দেওয়ার অনিবার্য কাজ। এই নিশ্ছিদ্র দিনলিপির দেওয়াল ভেদ করে কোনও কাল-কষ্টি তো দূরের কথা হুরী-পরীরও প্রবেশের পথ ছিল না।

তোমার বাবা ছিলেন কন্দর্পকান্তি, আর্য পুরুষ। তোমাদের দেশে ছিল সম্পন্নতার বৈকুণ্ঠ। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দার মনে ধবধবে, দুধেআলতা বা কাঁচাসোনা বর্ণের মেয়ে-বিষয়ে কেন যেন ভয় ছিল। তাই তিনি পুত্রের জন্যে কালো মেয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। যত কালো হবে তত ভাল হবে! একজনের মনে এই বিশ্বাস আর একজনের জীবনে ভ্রমরের ডাক বয়ে এনেছিল। তোমার ঠাকুর্দা কালো মেয়ে খুঁজছিলেন; আর তোমার দাদু কালো মেয়ে নিয়ে গালে-হাত বসেছিলেন। বসেই ছিলেন না, মাঝে মাঝেই কপালে করাঘাত করে করে অদৃষ্টকে দোষারোপ করছিলেন। কৃষ্ণকায়া ঘনবর্ণের অন্ধকারে বেড়ে ওঠা তোমার মা আহরিত হলেন সেই আর্যপুত্রের জন্যে। তোমার মায়ের সে পাওয়া হাতে চাঁদ নয়, স্বর্গকে পাওয়াই ছিল। এসবও আমার অনেক পরে শোনা।

তোমার এই কৃষ্ণা মা যখন রাধা-র মতো একটি মেয়ে পেলেন প্রথম সন্তান হিসেবে তখন কি ভেবেছিলেন তা তোমারও জানা নেই আমারও না। হাতে দ্বিতীয়বার চাঁদ পেলেন। কিন্তু তার পর? দ্বিতীয়াই তো হল কালি-

কঙ্কালিনী! চোখের জল বন্ধ হল তৃতীয় সন্তানে এসে। পুত্র এবং আর্য! চাঁদ এবং স্বর্গ একঠাঁই? আনন্দের ঢেউ জীবনের পাড়ে বেশি দিন আছড়ে পড়ে আদর জানানোর সুযোগ পেল কৈ? তুমি এলে যে! তাই কি তুমি তোমার মায়ের চোখে একপুটলি গরল হয়ে হাজির হলে না? ততদিনে তোমার মা তার অতীতকে ভুলে গেছেন; ততদিনে দ্বিতীয় সন্তানের 'স্যানড্‌ইচড্‌' অবস্থানকে মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু আবার কেন? বার বার কেন? প্রথম ও তৃতীয়-তে তোমার মায়ের চোখের মণি শেষ। চারনম্বরে না এলেই কি তোমার চলছিল না? এবং সেই যাতনা আরও বাড়তে বাধ্য যদি পঞ্চম সন্তান আবার আর্যবর্ণের প্রকাশটিকে সঙ্গে করে আনে! 'চিপার' মধ্যে পড়ে তুমি তোমার কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকায় নীলকণ্ঠ অস্তিত্বটাকেই তো অমার্জনীয় অপরাধের দড়িতে বেঁধে ফেলেছো, ফেলেছিলে।

তুমি যখন এসব কথা আমাকে বলেছিলে তখন তোমার কথা শোনার মতো মনটা আমার ছিল, যদিও সময় তখন ছিল না! তুমিই বলেছিলে যে তোমার মা তোমাকে 'ঘর জ্বালানী পর ভোলানী' বলে গালমন্দ করে! অবশ্য কারণও বলেছিলে। কালো মেয়েরা একটু আগে আগেই নাকি স্ব-সচেতন হয়; তারা যে অপছন্দের এটা বুঝতে তাদের অনেক বেশি সময় দরকার হয় না। একটা অন্য-অন্য, পর-পর, কিন্তু-কিন্তু ব্যবহার। ঘরেও যেমন, বাইরেও তেমনি। একটু বেশি বয়স হতে না হতেই মেয়েরা নাকি বই পড়ার চাইতে অপরের চোখ বেশি পড়তে পারে। বর্ণমালার অর্থ-তাৎপর্য বোঝা না গেলেও চোখের ভাষা জলবৎ বুঝে ফেলার ক্ষমতা নাকি মেয়েদের অনেক বেশি এবং অনেক তাড়াতাড়িই চলে আসে। সুন্দরদের সেই ক্ষমতা প্রশংসার নেশায় চাপা পড়ে যায়, চাটুবাক্যের প্রলেপ পড়ে পড়ে ভোঁতা হয়ে যায়। কালো যারা, যাদের কপালে নিন্দা, তাচ্ছিল্য আর 'কটুবাক্যের' ঝাঁঝ ঝরে ঝরে পড়ে, তারা তাই নেশার দাস হয় না, বাস্তবের দন্তপুঞ্জ দেখতে পায়। তাদের অহং পিষ্ট হয়, পুষ্ট হয় না। সব কালো মেয়েরাই নাকি তাই একটা জোরালো ঘাড়, দৃপ্ত মন এবং আক্রমণী জেদ পায়। কিন্তু তাদের মনের গভীরে সহানুভূতির কাঙালপনা অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীই থাকে। তাই যদি কখনও কোনও নরম মনের দেখা পায়, সজল চোখের দৃষ্টি পড়ে তাহলে এই কালো

মেয়েরা নিজেদের ঘাড়কে নরম করে, মনকে সরস করে আর তেজকে নিভিয়ে দিয়ে আক্রমণের বদলে নিবেদনে ঘনিষ্ঠ করে দিতে চায়। ঘরে এটা জোটার সম্ভাবনাই থাকে না। বাইরে যদি কখনও জোটে, তাহলেই সেই ক্ষেত্রটিকে এরা 'ওয়েসীস'-এর মতো মনে করে। এরা তাই 'ভোলানী' হয় না, নিজেরাই নিজেদের ভুলিয়ে দিয়ে অন্যের হতে চায়। এটাই সত্য।

দোষ দেবো কাকে? দুখানা ঘর, কিন্তু ঘরভরতি পরিবার। শোয়ার জায়গা নেই। বাবা নেই। মা আছে। আছে পাঁচ মেয়ে এক ছেলে মিলে ছয় জন। বড় মেয়ের ছয়টি ছেলেমেয়ে এবং স্বামী। সাতজন। মেজো মেয়ের স্বামী নেই, দুই সন্তান। তিনজন। ক'জন হল? ষোল জনের সংসার। ছেলে চাকরি করে। মেয়ে এবং এক জামাই 'বাকরি' করে। যা মাসের সংগ্রহ তাতে গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দুটি ঘরের ভাড়া বাড়িতে ঠেসেঠুসে ওরা থাকে। উপচে পড়ে চিলতে বারান্দার চৌকিতে। ছেলে। পিছনে একটুকরো রান্নাঘর। সেখানে সারাদিনই লঙ্গরখানার ভিড়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে। তার জন্যে রান্নাঘরে চিল চিৎকার চলে। বড় মেয়ে রাঁধে আর চেঁচায়, মেজ মেয়ে সকালেই প্রাইমারী স্কুলে পড়াতে চলে যায়। একটু বেলা বাড়তেই বড় জামাই দু'খানা রুটি ব্যাগে পুরে নিয়ে কোথায় যেন কোন দোকানে চলে যায় চাকরি করতে। ফিরবে রাত্রে। বৃদ্ধা মা চেঁচায়, চিৎকার করে, বকা ঝকা করে আর এঘর ওঘর করে। এই লণ্ডভণ্ড অবস্থার মধ্যে একমাত্র তুমিই ছিলে বেকার। পড়াশুনো শেষ। চাকরি হবে না অদূর ভবিষ্যতে। বিয়ে হবে না কোনও দিনই। তাই তোমার উপরই খাঁড়ার কোপ পড়বে। আর সেই অসহায় চঞ্চল সকালে তোমার মা আর দিদি যখন তোমার নাম ধরে ডাকবে, এটা কর ওটা আন, ওকে জামা পরিয়ে দে—বলে নির্দেশ দিতে থাকবে তখন তুমি তোমার যন্ত্রণার বর্তমান আর অমাবস্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে কি করবে? স্বভাবতই ছোটগুলোকে কিল চড় দিয়ে সোজা করতে চাইবে আর বড়দের প্রতি শ্রাবণের ধারা বইয়ে দেবে বাক্যে, কণ্ঠে আর চোখে!

এসবও আমি মায়ের কাছে শুনেছি। নিজেও দেখার-শোনার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু অপেক্ষা করিনি। 'যার যার তার তার' নীতিতে নিজে সরে গেছি নিজের পড়ার ঘরে। পড়ুয়া ভাইদের কান যখন পড়ে থাকত তোমাদের

ঘরে, এক দেয়ালের ওপারে খণ্ডযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আহরণে ব্যস্ত, তখন সেই সব নরম নরম কানগুলোকে টেনে-মুচড়ে বই-মুখো করে দেওয়াও ছিল আমার প্রায় দৈনন্দিনের কাজ। কানে হাত বুলোতে বুলোতে আমার ভাইরা যখন নিজেদের কণ্ঠধ্বনি শুনতো, জোরে জোরে উচ্চারণ করত ভূগোল ইতিহাসের পাঠ, আমি তখন নিজের অহং-এ হাত বুলোতে বুলোতে নিজের পড়ার ঘরে চলে যেতাম।

কিন্তু তোমাদের দুপুরগুলো ছিল নির্ভেজাল শান্ত! আশ্চর্য মনে হত এই ভেবে যে যে-মেঝেতে সকাল অমন কর্কশ, সেই মেঝেতেই দুপুর কেন এমন নম্রনত। ছোট-ছোট কথা, টুকি-টাকি কাজ, এপাশ-ওপাশ একটু আধটু গড়ানো আর ফিস্-ফিস্ কথা। সব মিলে যেন একটা নীরব আবছা জগৎ গাছের নিচে দ্বিপ্রহরের শান্তি উপভোগ করছে। আর আশ্চর্য নয়, বিস্মিত হতাম বিকেলে তোমরা দুই বোনে গোটা উঠোনটা পায়চারি করতে। পায়চারি করতে আর তোমার ছোটজন গান গাইতো। তোমার ফরমাইসেই যে গান চলছে তা বুঝতে অসুবিধা হত না। ওর তখনও স্কুল শেষ হয় নি। তাই দুপুরে সে থাকতো স্কুলে। তুমি কি করতে? সেলাই ফোঁড়াই আর উল-কাটা নিয়ে তোমার দুপুর কাটতো। বেশির ভাগই আমাদের ঘরে, আমার মায়ের পাশে বসে। কেন?

ততদিনে আমাদের উঠোনটা একটা প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছে। তার চারধারে হাস্নুহানা, গোলাপ, গাঁদা ফুটছে। আরও কতো ফুলের গাছ তোমাদের সঙ্গ দেয়। ওদের গন্ধে আর হাসিতে, তোমাদের পদচারণায় আর গানে, আর সেই সঙ্গে বিকেলের মৃদু বাতাস মিলে কেমন যেন একটা কল্পনাময় জগৎ তৈরি করত। কবিতা-কবিতা বলে মনে হত। আমার গদ্যময় জীবনে এই বিকেলগুলো মারাত্মক ধ্যানভঙ্গের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। সাধনার ব্যাঘাত, মনোযোগের পক্ষে বিঘ্নকারী, বাস্তবতায় কাঁটা। আসলে একটা মিশ্রিত অনুভব হত। ভালও লাগে রাগও হয়। ছোট বোন আসার আগে থেকেই, যেন পদধ্বনি শুনেই, তুমি প্রাঙ্গণে পদচারণা শুরু করে দিতে। সে এসেই জামা-কাপড় ছেড়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিত। আমার ধ্যানভঙ্গ হত। শাপ দিতে চাইতাম, মন বাধা দিত। এই বিরুদ্ধতাকে একদিন ছিন্ন করে দৃপ্ত পদে তোমাদের সামনে একেবারে সটান দাঁড়িয়ে বলেছিলাম "এতো জোরে

গান করলে আমার পড়ার অসুবিধা হয়।" তোমরা হকচকিয়ে গেছিলে। বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে। বোধহয় ভেবেছিলে গান যার পছন্দ নয় সে মানুষ খুন করতে পারে!

যদি তাই ভেবেছিলে তাহলে ঠিকই ভেবেছিলে। সত্যিই তো আমি তখন আমাকে খুন করে বসে আছি। নিজের শবদেহের ভিতরে বসেই তো আমি এই গদ্যময় জীবনের বাস্তবতার সাধনা করছিলাম। আমি তো তখন এক তান্ত্রিকই। নিজের করোটি নিজের হাতে ধরে তাকে পুষ্ট করছি, নোতুন জীবন দান করছি, নোতুন অস্ত্র তৈরি করে নিজেরই অতীত জীবনকে আক্রমণের হাতিয়ার করে গড়ে তুলছি। তাই সেই তন্ত্র-সাধনায় গানের স্থান ছিল না, দখিনা বাতাস পরিত্যাজ্য ছিল এমন কি তোমরাও আমার সেই নিটোল পাথুরে আবরণে কোনও টোল ফেলতে পার নি।

আমি তো বাড়িওয়ালা, কর্কশ আমার দায়, কঠিন আমার কর্তব্য। তার উপরে যে বয়সে আমার কণ্ঠে কবিতা আর গানের আনাগোনা স্বাভাবিক সেই বয়সে আমার মুখে একমাত্র কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা নেই। এবং একটি কঙ্কালসার দীর্ঘ চেহারা, শ্রীহীন, ভস্মমাখার উপযুক্ত কাঠামো। সব মিলে আমাকে পছন্দ করার মতো কোনও কারণই ছিল না তোমাদের। এবং প্রধানত তোমার মায়ের। তাঁর কোনও দোষ নেই। তিনি আমাকে সহ্যই করতে পারতেন না। তিনি আমাকে পুচকে একটা ছেলে বলে মনে করতেন। তাই বাড়িওয়ালার মতো গম্ভীর করে যখন 'এটা করবেন না, ওটা চলবে না, সেখানে ময়লা ফেলবেন না,' এমতো নানাবিধ দাবি-নির্দেশ ঘোষণা করতাম তখন সেই বৃদ্ধামহিলা নিশ্চয়ই তা ভাল মনে নিতেন না। বয়সের অসুবিধাকে আড়াল করতে আমি অকারণেই রূঢ় হতাম। বয়সের সুবিধা সামনে আনতেই বোধহয় তিনি আমার প্রতি তীক্ষ্ণ হতেন। শূল বাইরে না থেকে আমাদের দুজনের চোখেই উপস্থিত হয়ে গেল। পরস্পরেরই।

আড়ালে চলে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব তোমার ছিল না তবুও প্রথম প্রথম আমি কাছেপিঠে এলে বা ঘরে ঢুকলে শাড়ির পিছন আর চুলের গোছাটাই দেখেছি। ধীরে অপসৃয়মাণ। উঠোনে পায়চারি বা বারান্দায় অবস্থানের সময়ে যদি কখনও আমি এ-ঘর ও-ঘর করেছি তাহলে তুমি চোখ তুলে তাকাতেই না। আমি যে একটা অস্তিত্ব তা একমাত্র তোমার বোনই আমাকে মনে করিয়ে

দিয়েছে, কখনই তুমি নও। প্রথম প্রথম তোমার উপর তো বেশ বিরূপই হয়েছি। আমার অহং-কে এভাবে টোল খাইয়ে দেবার মতো জেদ তোমার কোথা থেকে আসে? মনে মনে ভেবেছি মেয়েটা একেবারেই 'মেয়েদের' মতো নয়। যাচ্ছেতাই। শত হলেও বয়স হয়েছে, চাকরি করি, পড়াশুনো করছি, বাড়ি আছে এবং সামনে অনেক সম্ভাবনাও তো আছে। মনে একটা 'পিছলা পিছলা' সিরসিরানি তো অন্তত আসতে পারে! তাও নয়? তার পরে একসময়ে ক্ষমা করে দিয়েছি। ক্ষমা স্বতঃস্ফূর্তই হয়েছে। কারণ তুমি তো কালো, শীর্ণদেহ কিন্তু তীক্ষ্নকণ্ঠ। আর দেখতে পাও না, তোমারই বোন, সুন্দর ফর্সা দেখতে, গোলগাল চেহারা, চোখে কাজল-কাজল দৃষ্টি, কেমন আমার চলাচলের পথের ধারে কান পেতে থাকে? উৎকর্ণ? তুমি যে তা বোঝ, বুঝতে পার, তা আমি পরিস্কার বুঝতে পারি। বুঝতে পারি তার কারণ তুমি আমার দিকে তাকাও না বটে কিন্তু বোনের চোখে তোমার নজর তীক্ষ্ন হয়ে কি যেন অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত থাকে। আমার তির্যক দৃষ্টিতে তোমার এই না-দেখা-কিন্তু-অন্য-চোখে-দেখাটা এড়াতে পারে না। তুমি কেন নিজেকে বোনের প্রহরী বলে মনে করতে? নিজের বোনকে আমি ভর্ৎসনা করতেও শুনেছি! কিন্তু কেন? তুমি না হয় নিজের প্রতি বিরূপ ছিলে, রূপ ছিল না বলে; তোমার বোনের তো কোনও দোষ ছিল না। ছেলে হিসেবে আমাকে তোমাদের পছন্দ হবার কথা নয়? মায়ের প্রভাবে তোমরা আমাকেও বাতিলের দলে, অন্ত্যজের দলে ফেলে দিয়েছিলে?

এসব কথা অনেক পরে ভাবা। আমি তখন একটার পর একটা পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং জীবন, বাস্তব জীবন। সবাই পরীক্ষা নিতে যেন তৈরি। আর আমারও তখন একটিই 'গোঁ'। প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করা। পাশ করতেই হবে। সেই সময়ে ঘড়িই ছিল আমার একমাত্র সময়ের পরিমাপ, বয়স নয়; ক্যালেন্ডারই ছিল অতীত ভবিষ্যৎ মাপার একমাত্র হিসেবের বই, যৌবন নয়। [যৌবন কারে কয়?] তাই ঘড়ির কাঁটা আর ক্যালেন্ডারের পাতার উপর দিয়ে চলতে গিয়ে তোমাদের বিষয় অনেক দিনই আর জানা হয় নি।

সেই ফাঁকে তুমি সেলাই স্কুলে ভরতি হলে। শিখলে। পাশ করে প্রত্যয়ন নিয়ে বাইরে চলে এলে। কলেজস্ট্রীটে এই সময়েই তোমাকে দু'একদিন

দেখেছি। আগের চেনা ছিল বলে চিনতেও পেরেছি। এবং ঐ পর্যন্ত। এই সময়ে বাইরের জগতে তোমার কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা তোমার বোন জানলে জানতে পারে। আমি অন্তত জানি না। জানার কারণও ছিল না। আমি চাকরি করি, কলেজ যাই, বাড়ি আসি। যন্ত্রের মতোই। তখনও। তুমি চাকরি খুঁজতে যাও, এখানে ওখানে যাতায়াত কর এবং শূন্য হাতে বাড়ি ফের। এসব পরে জেনেছি। এই করতে করতেই নানান সমস্যা বিষয়ে তোমার প্রশ্নগুলো তুমি আমার কাছে তুলতে চেয়েছো। কখনও চিঠি লিখে দেওয়া, দরখাস্ত-চিঠি।

কখনও কোথায়ও যেতে গেলে সেই জায়গার হদিস, যাবার পথ, বাস রুট ইত্যাদিও জানতে চেয়েছো। টুকটাক বিষয় নিয়ে কাছে এসেছো, কথা বলেছো, সাহায্য নিয়েছো। তোমার বোন চলে গেছে বনগাঁ লাইনে কোন কোথায় 'বেসিক্ ট্রেনিং নিতে'। এরকম সময়েই বোধহয় তুমি কলানবগ্রামে একটা স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে যাবে। আমার সাহায্য চাইলে। আমি সঙ্গে গেলাম। সারা দিনের পথ যাতায়াতে। রাত হয়েছিল ফিরতে। তুমি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলে।

এই কলানবগ্রাম যাবার দিনটি তোমার জীবনে এবং আমার জীবনে অনেক প্রভাব ফেলেছিল। তুমি সেদিন অনেক কথাই বলেছিলে ট্রেনে যেতে যেতে। আমি সেদিন অনেক প্রশ্ন করেছিলাম ট্রেনে ফিরতে ফিরতে। তুমি সেদিন সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে অনেক চোখের জল ফেলেছিলে। আমি সেদিন তোমার মরুভূমি উপরটার অভ্যন্তরে নরম-সুন্দর একটা প্রাণকে দেখেছিলাম। তুমি আমাকে বড়-আকারে দেখেছিলে, ভবিষ্যতে যে আমার বর্তমান হারিয়ে যাবে, আমার জন্যে জয় যে অদূরেই অপেক্ষা করে তার সাফল্যের আঁচলখানি বিছিয়ে রেখেছে তা তুমি সেদিন অনেক জোর দিয়েই বলেছিলে। আমার জীবনের বিষাদ, বিপর্যয় আর বিপদের কথা তুমি আমার মার কাছেই শুনেছিলে। জেনেছিলে আমাদের অতীত দিনের কথা। তাই সেই প্রেক্ষিতে আমার নিজের দেখা বর্তমানকে তুমিই প্রথম অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখেছিলে। তোমার মা পারে নি, তোমার বোন অক্ষম ছিল। সে পারে নি তার কারণ তার চোখে প্রকৃতির আপন ঘরের নিজ হাতে তৈরি কাজল-কালো প্রলেপটি ছিল। তুমিই ছিলে নিস্পৃহ, নির্মোহ এবং নিশ্চেষ্ট। তাই তুমি যখন

প্রথম প্রথম পছন্দ করতে না.আমাকে তখনও যেমন সেই অপছন্দের প্রকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন যখন সেই আমিই তোমার চোখে অন্য মূল্যে সস্নেহ নৈকট্যে ধরা পড়লাম, তখনও তুমি তোমার চোখের জল গোপন না করেই অতীত ভুলের অনুশোচনা করলে।

সেদিনই তুমি তোমার অনেক কষ্টের কথা, অনেক প্রচেষ্টার কথা আর ধিক্কৃত জীবনের কথা আমাকে শুনিয়েছিলে। তুমি তোমার বোনের প্রসঙ্গ তুলে আমার মনে কোনও দুর্বলতা আছে কিনা জানতে চেয়েছিলে। আমার তখন প্রস্তুতির অনেক বাকি। অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ার মতো সময় তখনও আমার হাতে ছিল না। আমরা উভয়ে অনেক কাছে এসেছিলাম উভয়ের। সমান্তরাল। এই কাছে আসাটা ছিল বেদনা-বোধে, যন্ত্রণার উপলব্ধিতে, কষ্টের খরতাপে একই ছত্র-ছায়ায় আসার কারণে। সেদিনই আমরা সমব্যথী, সহব্যথী হয়েছিলাম।

তার পর তুমি চাকরি পেলে। বাড়ি তুমি ছাড়তে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। দূরে যেতে পেরে তুমি নিজেকে আবিষ্কারের সময় ও সুযোগ পেলে। তখন তোমরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ নিজেদের বাড়িতে। সে অনেক দিনই হয়ে গেছে। তোমাদের নোতুন বৌদি তখন অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। পায়ের নিচে 'দাদার' মাটি খুঁজে পেয়েছে। এরকম একটি বাইরে ন্যাকা ভিতরে সেয়ানা বৌদি পেয়ে তোমরা তপ্ত বালু থেকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে, গরম কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ছিটকে গেলে! সে বেশ হল। বাড়ি তোমার অপছন্দই ছিল, এখন প্রায় অগম্য হয়ে দাঁড়ালো। দাদা বেঁকে বসলেন 'টাকা চাই। সংসারের খরচ অনেক'। বৌদি জেঁকে বসলেন ছোট্টটি হয়ে—তার দশবছরের ছোট ননদকেও সে 'ছোড়দি' বলে ডাকে—কারণ সে একেবারেই ছোট। বোনেরা সকলেই আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র বাড়িতে চলে গেল, তোমার মা'এর হাতে বহুবছর পরে হাতাখুন্তি উঠলো আর বাড়িতে আসাটা তোমার সপ্তাহান্ত থেকে সরে যেতে চাইল। কিন্তু তোমার মাসিমা? আমি?

তোমার পাথুরে জমিতে জল রেখা চিহ্ন রেখে যেতে লাগল। রেল স্টেশনে নামলে, ফেরার পথে, তুমি এ বাড়িতে চলে আস আগে। আমি থাকি বা না থাকি আটটা-নটা রাত তোমার কেটে যায় আমার মায়ের কাছে। মায়ের

পাশে পাশে। আমার মায়ের একা-একা জীবনে তুমি তাঁর কাছে থেকে মেয়ের স্নেহ আদায় করে নিচ্ছিলে, পাশে থেকে তাঁর অভাব আর কষ্টকে সহনীয় করে দিচ্ছিলে। শনিবার রবিবার গুলোর একটা অর্ধেক তো তুমি এখানেই এই মায়ের কাছেই দিয়ে দিতে। আর আমার মা মনে করতেন তুমি তোমার জীবনের কর্কশ দিকটাতে স্নেহের জলসেচন করে নিতে তাঁর কাছে আসতে। তোমার একাকিত্বকে আমার মা বেশ অন্তর দিয়েই অনুভব করেছিলেন। তাই ঘরে নিজের তিনটি অবশিষ্ট সন্তানের মধ্যে চব্বিশ-পঁচিশের আমি থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কখনই তিনি ভয় পান নি, তোমাকে নিয়ে তাঁর মনে কোনও দুশ্চিন্তাই আসেনি। দুশ্চিন্তা যে তাঁর মনে স্থান পায় নি তা পরিষ্কার বুঝেছিলাম যখন দিদি, আমার বড়দিদি, চেষ্টা করে মায়ের মনে কোনও দাগ কাটতে পারে নি। দিদি তোমার আসা-যাওয়ার মধ্যে একটা অভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছে ; মা সেই চিন্তাকে নাকচ করে দিয়ে বলেছেন তা হলে ছেলে বাড়ি থাকুক বা না থাকুক তুমি আসবে কেন ? ছেলে যখন বাড়ি থাকে তখনই আসতো ! দিদি বলেছে—বলে রাখলাম, দেখে নিও ! মা বলেছেন—আমার মন সে কথা বলে না।

আচ্ছা তুমি কি কোনও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অন্তরে নিয়েই তখন যাতায়াত করতে ? না, না, অত রাগ করার, একেবারে ক্ষেপে যাবার মতো প্রশ্ন তো তোমাকে করি নি ! আর তাছাড়া তুমিই তো তোমার কথা লিখতে বলেছিলে ! মনে নেই ? তোমার সব কথা কি তুমি আমাকে বলেছো ? লিখতে গেলে একেবারে সাদামাঠা করে কি লেখা যায় ? লেখা ঠিক ? একটু আধটু হুলের খোঁচা না থাকলে কি মধু মিষ্টি হবে ?

জানি তোমার বর্ণেই সব কালি শেষ করে ঢেলে দেওয়া ছিল ; মনের মধ্যে ঢালার মতো কালি তোমার সৃষ্টিকর্তার হাতে আর অবশিষ্ট ছিল না। তোমার মনটা তাই বেশ পরিষ্কারই ছিল। তুমি যে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারতে না তার কারণ তোমার মনের প্রস্তুতি। তুমি শুধু স্নেহের কাঙালই ছিলে না। স্নেহের উৎসও ছিলে। অপরের কষ্টে-যন্ত্রণায়-বেদনায় তোমার প্রথম যা প্রকাশ পেতো তা চোখের জল। তুমি অল্পেই কাতর হয়ে পড়তে। আমার বাবা নেই, ভাই দুটিই ছোট। বোনের পড়াশুনো বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে হয়ে গেল। মা এই বিয়েতে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করলেন। তাঁর ভয় ছিল

যদি তখুনি বিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে অনেক কষ্টের মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে। সামাজিক এবং আর্থিক। বরিশালে বিয়ে শুনে তোমরাও কষ্ট পেয়েছিলে। আমার কুড়ি বছরের জীবনে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। কেন একটা জেলার সব লোকই খারাপ হবে? লোকের স্বভাব কি জেলার দ্বারা নিশ্চিত হয়? ভাল-মন্দ লোক কি সব জায়গাতেই নেই? তাহলে? বরিশালের নামে এই দুর্নাম কেন হবে? কিন্তু মা এবং দাদা, আমার জ্যেঠতুতো দাদা, সব ঠিকঠাক করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। এবং প্রকৃত অর্থেই আমরা তখন কপর্দকহীন।

তাছাড়া তুমি আমার পরের ভাইটির মৃত্যুকে জান। কলেরায় এক-রাত্রেই সব শেষ। শোকে দুঃখে মা পাথর, একেবারে ছোট ভাই কালাজ্বরে আক্রান্ত, চিকিৎসা চলছে। কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়। নিয়ে যেতে হয় তার কারণ ডাক্তারটি আমাদের আত্মীয় এবং পয়সা দিতে হয় না। দিতে পারিনা বলেই দিতে হয় না। এ সব তুমি কিছু কিছু জেনেছিলে, কিছু বা দেখেছিলে। তার মধ্যে আমি কলেজে পড়ছি, চাকরি করছি এবং সংসারের সব দায় বহন করছি। সুতরাং তুমি আমাদের সংসারের মায়ায় আটকা পড়ে গেছিলে। অনেক চোখের জল যা মা ফেলতে পারেন নি, ফেলার মতো সময় বা স্বভাব ছিল না, অথবা অনেকে যেমন চোখের জল অনায়াসেই গিলে ফেলতে পারেন আমার মা সারাজীবনই সেই চোখের জল গিলে ফেলেই অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন, সেই চোখের জল তুমি অকাতরে বইয়ে দিয়েছো। দুঃখের সান্ত্বনা যেখানে আমার মায়ের প্রাপ্য তা অনায়াসেই চোখের ধারাবর্ষণে তুমি আমার মায়ের স্নেহস্পর্শে আদায় করে নিয়েছো। তোমরা অনায়াসেই কাছে এসে গেছ।

আমার অনার্সের রেজাল্ট যখন বের হল তখন তো তোমরা হকচকিয়ে গেছিলে। ঠিক না? ইন্টারমিডিয়েটের ফলাফলকে তোমার দাদা মূল্য দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা? তোমার বোনের মধ্যে একটা উচ্চকিত ভাব লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তোমার মা এবং অন্যান্যরা আমার যোগ্যতাকে তেমন আমলই দেন নি। 'অনার্স' শেষে তোমরা সচেতন হয়েছিলে, বিশেষ করে তোমার বোন এবং তোমার মা। তোমার বোনের দৃষ্টি নরম দেখেছি, একটু যেন সলজ্জ। আর তোমার মায়ের চোখ যেন আরও তীক্ষ্ণ, আরও কঠিন হয়ে ধরা পড়ছিল। তাছাড়া অন্যের কথা আর কি বলব, তুমি? তুমি

তো তখন বেশ 'দিদি-দিদি' ভাব করে বোনের উপর খবরদারি করতে। আমি তা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম। আর সেইটি বুঝতে পেরেই তো তোমাদের আড়াল দিয়েই তোমার বোনের প্রতি আমার আকর্ষণ দানা বেঁধে উঠেছিল! তোমরা দু'জনেই হয়তো উঠোনে পদচারণা করছো। এমন সময় গট্ গট্ করে বুট পায়ে দুহাতে দু'টো ব্যাগের বোঝা নিয়ে আমি এলাম। ঘাড়-শক্ত। তুমি যেমন চলছিলে তেমনই চলতে লাগলে; কিন্তু তোমার পাশ থেকে ছিটকে গেল তোমার বোন। ব্রীড়াবনত সলজ্জ দৃষ্টিপাতে অবশ্যই আমার উপস্থিতিটি দেখে গেল! প্রাণের চাঞ্চল্য কি এতো সহজেই লুকোনো যায়? ফুলের গন্ধ কি ঢাকা থাকে ভ্রমরের কাছে? আমি কি এতোই পাষণ্ড যে প্রকৃতির বর্ণ-অক্ষর-বাণী আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। পাঠ্য বই আর প্রকৃতির পাঠে তো এখানেই তফাৎ।

আর তাই আমি বুঝে গেছিলাম তোমার নদীতে জল থাকলেও তাতে ঢেউ নেই; তোমার বোনের মনে জলও আছে, স্রোতও আছে এবং সেই জলে ঢেউও ওঠে। তুমি নিস্তরঙ্গ, নিস্তব্ধ, কঠিন-প্রাণ। অনুত্তেজিত। আর তোমার বোনটি তরঙ্গক্ষুব্ধ, চঞ্চল এবং প্রাণবান। মথিত। তুমি নিজেকে তখনও পাহারাদার দ্বারোয়ান মনে করে আনন্দ পাচ্ছিলে। 'ধর্মের পথ কঠিন অতি'; আর তুমি তোমার যৌবনের মৃতদেহের উপর বার্ধক্যের শব সাধনায় বুঁদ হয়ে ধ্যানমগ্ন চেহারাটিকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেই বেশি পছন্দ করতে! 'ভালবাসা? ভালবাসা কারে কয়?'—এরকম একটা বুদ্ধিসর্বস্ব চেতনাকেই প্রকৃত মানব চেতনা মনে করে নিজের চারদিকে একটা অপ্রবেশ্য দেওয়াল গড়ে তুলে শ্মশানের শান্তিকে জীবনের সুখ বলে ধরে নিয়েছিলে। তাই তোমার মধ্যে তখনও দেখেছি একটা নিশ্চেষ্টতা, একটা কাজল-ছাড়া চোখের হাজিরা মাত্র। চোখের কাজ যে শুধু দেখা নয়, দেখানোও তা তোমার কাছে বালকের সত্য বলে মনে হবে হয়তো। চোখ যে একটা যন্ত্র নয়, একটা ভাষাও তা কি তুমি তখন জানতে? মানব দেহটি যে শুধু মাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাহার মাত্র নয়, নয় খাদ্যগ্রহণ পাচন যন্ত্র মাত্র, বরং প্রাণ মনের ছন্দের প্রকাশ মাধ্যম সে কথা তোমার বিধাতা হয়তো তোমাকে বলে দিতে ভুলেই গেছিলেন। তুমি শুধু মুখেই কথা বলতে। একটা বয়সে, সব বয়সেই, মানুষ তো তার সমস্ত দিয়েই কথা বলে, কথা কয়, কথা শোনায় তা তুমি কেন তখন

বিশ্বাস করতে না ?

তোমার ছোট বোন তোমার মতো নিরেট ছিল না। সে তার সমস্ত দিয়ে কথা বলতে শিখে গেছিল। বোধহয় একটু বেশি করেই শিখেছিল। তাই তার যা জানার কথা তার চাইতেও বেশি সে বুঝে নিত। তার ছিল অনেক বন্ধু-বান্ধব। আকাশ-বাতাস-প্রকৃতির বাইরেও তার অনেক গুরুপ্রাপ্তি ঘটেছিল। তোমাকে বলতে গিয়ে, তোমার কথা বলতে গিয়ে সে সব কথার উত্থাপন বন্ধ করাই ভাল। তাই থাক তার কথা। কিন্তু তুমি ? সেই উঠোনে চলাচলের তুমি কেন, কবে, কি করে একেবারেই হারিয়ে গেলে ? চাসরাইলে যখন তুমি চাকরি করতে শুরু করলে তখন তোমার কি হল ? কি এমন ঘটল যে তোমার দেহে ভাষা এলো, চোখে কাজল লাগল, চলনে ছন্দ এলো ? তুমি কি দেখে জেগে উঠেছিলে ? কিসের স্বপ্ন ? কি সেই স্বপ্ন ? তুমি তোমার দেহের মধ্যে স্রোতস্বিনীর ছলছলাৎ গতিকে, প্রাণের উদ্দাম বাতাসকে আর হৃদয় নদীর ঢেউকে অনুভব করেছিলে ? কোথায় ? কখন ? কিভাবে ?

তোমার এই পুনর্জন্মে কে তোমাকে প্রাণদান দিয়েছিল ? তোমাদের ঘরে তোমার বোনকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, হত। তোমার অভিভাবকেরা সেই আলোচনার যেমন সূত্রপাত করেছিলেন তেমনি তুমি তো স্বনিযুক্ত দূতের মতো সে সব গোপন কথা আমাদের কাছে, আমার কাছে, আভাসে ইংগিতে প্রকাশও করে দিতে। এই সব করতে গিয়েই কি তোমার ঊষর মনের কাঠ-ফাটা মাটিতে সজীবতার বারিসেচন হয়েছিল ? নিজেকেও কি তুমি আবিষ্কার করেছিলে ? মেয়ে বলে ? নাকি অকুতোভয় নৈকট্য পেয়ে তুমি তোমার মনের তন্ত্রীতে জীবনতারের ঝংকার শুনে ফেলেছিলে ? সেই অনুরণন কি গান হয়ে ফুটে উঠেছিল কলানবগ্রামের পথে ? আমার মনে হয় তোমাকে আমি সেই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম। তুমি তোমার পাথুরে অস্তিত্বের বাইরে বেরিয়ে এসে কণ্ঠের প্রকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছিলে। তোমার মধ্যে আমি সেদিন একটা অন্য তুমিকে খুঁজে পেয়েছিলাম।

তুমি তোমার বোনের চোখ আর মন দেখতে এতোই বেশি ব্যস্ত ছিলে যে নিজের মধ্যে যে একটা অন্যতর ভূমিকম্প ঘটে যাচ্ছে তাকে দেখতেই পাও নি। কি, ঠিক বলি নি ? তুমি আমার মনের গহিন অরণ্যে তোমার অনুসন্ধান

চালাতে সচেষ্ট হয়েছো। খুঁজে দেখতে চেষ্টা করেছো সেখানে কোনও দীপ জ্বলে কিনা। কারণ তুমি তোমার বোনের জন্যে মাত্রাতিরিক্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছো, জানতে চেয়েছো ওর জন্যে আমার মনে কোনও স্থান চিহ্নিত আছে কিনা। হ্যাঁ, একথা একশো বার ঠিক যে তোমার বোনের আকর্ষণ ছিল প্রকৃতি নির্দেশিত, স্বভাবসিদ্ধ। তার সব নিয়েই সে ছিল অপ্রতিরোধ্য একটি কেন্দ্র। তুমি ছিলে বৃত্তের মধ্যেই, আমার দৈনন্দিনের বৃত্তের মধ্যে। তোমার কোনও চিন্তা ছিল না নিজেকে নিয়ে; আমার কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না আমাকে নিয়ে। আমারও যেমন 'সময়' ছিল না তোমারও তেমন 'সময়' ছিল না। আমার প্রতিটি ঘণ্টা- মিনিট আমার জীবনের সেই সময়ের হিসেব-খাতায় সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। তোমার সময় ছিল না তার কারণ তুমি মনে করতে যে তোমার সময় চলে গেছে, হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে। আমার চক্রাপিষ্ট দৈনন্দিন চলনের একেবারে পাশটিতেই তুমি চলে এসেছিলে, দেখছিলে আর তোমার ঘনিষ্ঠ অনুভূতি দিয়ে আমার ক্লান্তি আর আমার মায়ের দুঃখ সহৃদয় অঞ্চলখানি দিয়ে মুছিয়ে দিতে চাইছিলে। তুমি যে একটা মনোযোগ দেবার মতো অস্তিত্ব তা তুমিও না আমিও না আমার মাও না—আমাদের কেউই মনে করি নি। আমার দিদি যে মনে করেছিল সে তার গুণ!

এই করতে গিয়েই তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেলে। মনে আছে? আমার স্বল্পসংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে তুমিও সমমানে এবং সমমাত্রায় মিশে যেতে, যেতে পারতে। তার কারণ তুমি যে অন্য শ্রেণীর তা একমাত্র জৈবিক ব্যাকরণের সত্য ছিল সে সব দিনে!

আচ্ছা তোমার মনে আছে? যখন সত্যি সত্যি আমি একটা বিশেষ চিন্তায় বিব্রত হচ্ছিলাম, তোমার বোনের চিন্তায়, তখন তুমিই বলেছিলে যে পড়াশুনোর ক্ষতি করে আজেবাজে চিন্তা ত্যাগ করা দরকার। অথচ চিন্তাটা আদৌ আজেবাজে ছিল না। আমার বয়স বাড়ছিল, মন নোতুনের সন্ধানে উন্মুখ হচ্ছিল, তারই প্রতিফলন ঘটছিল আমার পড়াশুনোয়, মনোযোগে আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়। এটা কম কথা হল? তুমি উপদেশ দিয়েছিলে তাহলে সিদ্ধান্ত করে ফেল। সাতদিনের ছটফটানিতে সেই সিদ্ধাত করেই ফেলেছিলাম। তোমার বোনের অহংবোধ আর তার বান্ধবীদের মনোবৈজ্ঞানিক

সমীক্ষা-উপদেশ তার সম্ভাবনাকে চিরদিনের জন্যেই কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছিল। সে কথা পরে তোমাকে বলেছি। অন্যত্র লিখেওছি। সে কথা এখানে থাক। কিন্তু তুমি? আমার সিদ্ধান্তমুখী ছটফটানিতেই তুমি মর্মাহত হয়েছিলে। তোমার কষ্ট হত, কষ্ট হয়েছিল। প্রথম প্রথম ভেবেছিলে আমার কষ্টে তোমার কষ্ট বোধ হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন এলোমেলো হয়ে যাবার ভয়ে তুমি সহানুভূতি আর একান্ত বোধ করেছিলে। আর এই করতে গিয়েই তুমি প্রথম ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিলে। তুমি প্রথম টের পেয়েছিলে যে তোমার জীবনের বাঁচা মরা আমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তোমার অনুভবে ধরা পড়ে গেছিলে যে তোমার মনের গভীরে একটা সরস ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে তোমার অজান্তে। সেই জমিতে ভালবাসার বীজ উপ্ত হয়ে গেছে। তাতে অঙ্কুরোদ্গমও হয়ে গেছে। কিশলয় আন্দোলিত হচ্ছে তাই তোমার মনে এক ভয়ানক আলোড়ন তোমাকে মথিত করছিল। তোমার ভিতরটা একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে-চুরে কেমন যেন ক্রমশই অজানা অচেনা বলে মনে হচ্ছিল। তুমিই একদিন বলেছিলে এ তোমার কী হল? কি হচ্ছে? এটাকেই তো আমি ভূমিকম্প বলেছি। স্থির-কঠিন পাহাড়ের মতো অনড় যে মনের অধিকারী ভেবে নিজের সব জ্বালা-যন্ত্রণা-অনুভবকে মৃত্যুর শীতল শয়ানে দেখেদেখে এতোদিন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলে সেই ঘুমন্ত পাহাড়ের অতল গভীরে হঠাৎই আলোড়ন অনুভব করেছিলে। একটা ভয়ের অনুভব তোমার সর্বদেহে শিহরণ তুলেছিল। তুমি একে প্রথমে বোনের প্রতি ঈর্ষা বলে ধিক্কার দিয়েছিলে, এই অনুভবের কণ্ঠরোধ করে একে মৃত্যুর পরোয়ানা দিতে চেয়েছিলে। তুমিই তো তোমার ভিতরের এই গলিত লাভার, এই উষ্ণ-উদ্গমের খবর প্রথম টের পেয়েছিলে। তুমি চোখের জলের প্লাবনে, একা ঘরের কোণে বসে, এই স্বপ্রকৃতির উষ্ণ-উদ্গারকে প্রশমিত করার, রোধ করার, যাবতীয় চেষ্টা করেছিলে। পেরেছিলে কি? যে পথ দিয়ে তোমার 'মৃত্যু' এসেছিল সে পথ দিয়ে কি আর তাকে ফেরানো সম্ভব? প্রকৃতির কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। সে সব নিয়ম আমার তোমার চোখের জলকেও যেমন ভয় পায় না, আমাদের দুঃখ কষ্ট অনিচ্ছাতে হারও মানে না। তাই তুমিই হার মেনেছিলে।

তোমার এই ট্রাজিক অবস্থানে তুমি নিজেকে যে নোতুন করে আবিষ্কার করেছিলে তাতেই তোমার সার্থকতার বীজটি লুকিয়েছিল। এই বোনকে তুমি

তোমার প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসতে। প্রিয়, সখি, বন্ধু। সবই ছিল সে। তোমার মনের কাছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাবোধ অত্যন্ত দুঃখেরই ছিল। তোমার মধ্যে একই সঙ্গে দুটো সত্য মুখোমুখি হয়ে গেল ; দুটো জীবন দ্বৈত রণে একই ক্ষেত্রে যুযুধান হল। তুমি ক্ষতবিক্ষত হলে সেই অসম, অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে। তুমি তোমার আত্মার গলা টিপে আত্ম-হত্যার সংকল্পও করেছিলে। তুমি নিজেকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় চৌচির হতে চেয়েছিলে। যা ছিল অপরের আকাঙ্ক্ষার তাকে ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে পাইয়ে দেবার। সেই আকাঙ্ক্ষার ব্যক্তিটি যখন নিজেরও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ? তুমি তাই ভেবেছিলে এ লজ্জার এ অন্যায় এ অভিশম্পাত যোগ্য! নিজেকে তুমি নিজেই ধিক্‌কার দিয়েছিলে বার বার। মরণ কেন হল না এর আগে ? ভেবেছিলে। ভেবেছিলে অপরের জন্যে চিহ্নিত রাজ্য-পাটে অকারণ লালসার বহ্নি তোমার অন্তরে বিলম্বিত জ্বলনে তোমাকেও জ্বালাচ্ছে, অন্যকেও জ্বালাবে। মনে মনে তুমি মুক্তি চাইছিলে। সেই মুক্তি পলায়নে, সেই মুক্তি মরণে, সেই মুক্তি নিজের হাতেই নিজের অস্তিত্বের কণ্ঠ-রোধে। কতো কথাই সেই অব্যবস্থিতচিত্ত মনে তুমি ভেবেছিলে। আর দম বন্ধ করে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলে। সব কথা আমাকে বলতে চাইছিলে। কিন্তু বলার মধ্যে যে লজ্জার যে অনৌচিত্যের যে অন্যায়ের অনিবার্য উপস্থিতি টের পাচ্ছিলে তাতে তুমি আরও ভেঙ্গে পড়ছিলে।

আমি তো তোমাকে সাদা মনে সব কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম আমি শান্ত হয়ে গেছি। সিদ্ধান্ত সদর্থক না হলেও একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই হয়ে গেছে। নঞর্থক সিদ্ধান্ত। না, হবে না, হবেনা। সিদ্ধান্তহীনতা থেকে নঞর্থক সিদ্ধান্ত অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। মনের গোলমাল, অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং অনিশ্চয়তা এক বিকেলেই কেটে গেল। সব কথা তোমাকে অকপটে, সবিস্তারেই বলেছিলাম। বলেছিলাম ব্যক্তি হিসেবে নয় 'বন্ধু' হিসেবেই। তুমি শুনেছিলে এক মনে। কিন্তু তোমার মধ্যে যে সব পরিবর্তন দেখেছিলাম সেই সময়ে তার সঠিক তাৎপর্য আমি তখন বুঝে উঠতে পারি নি। তোমার নিম্নদৃষ্টি, ঝুলে পড়া ঘাড়, তোমার আড়ষ্টতা এমন কি দু'চার ফোঁটা চোখের জল। আমার কথা শুনতে শুনতে

তোমার এই সব ভাব এবং ভাবান্তরকে আমি সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এবং তাৎপর্যে গ্রহণ করেছিলাম। আমি তোমার নীরব বিমর্ষতাকে তোমার বোনের জন্যে ব্যথার অনুভব বলে মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম আমার বেদনা আরও বেড়ে যাবে ভেবে তুমি নীরব-বিমর্ষ ছিলে। তখন যদি জানতাম তোমার মনের গভীরে এক দোদুল্যমানা প্রকৃতি আলোড়ন তুলেছে, অন্তরের গলিত লাভাস্রোত অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে, নিজেকে আবিষ্কারের প্রথম অভিঘাতে তোমার অন্তর জর্জরিত হচ্ছে তাহলে অন্য কথা হত। তা হয় নি। আর তা বোধহয় হবারও নয়।

বই পড়ে জেনেছি মেয়েরাই নাকি প্রেমের পদধ্বনি প্রথমে টের পায়। প্রকৃতি জননী বোধহয় মেয়েদের অন্তরে প্রেমের একটা 'এ্যানটেনা' সবুজ পাতাছাড়ার সময়েই ঝুলিয়ে দেন! ওদের মনে 'রাডার' লাগান থাকে? অনেক দূরের হলেও অনেক ক্ষীণ হলেও, সেই মনের 'অ্যানটেনায়' বা 'রাডারে' সব 'মাইক্রোওয়েভ' ভালবাসার ছবি-গান-কথা অচিরেই ধরা পড়ে। তোমরা, এবং তুমি প্রকৃতির আপন অন্দরমহলের বাসিন্দা। তাই তোমার মনে যা সহজেই ধরা পড়েছিল আমার মনে তার ছায়াও তখন ছিল না। আমি, আমরা, তো বাইরের, প্রান্তরের ভবঘুরে অধিবাসী। আমাদের ঘরের টান আজন্ম হয় না; ঘর আমাদের টানে বলেই আমরা গৃহী হয়ে উঠি।

তোমার ঊষর মরুভূমিতে যে ঘন-বুনটে আচ্ছন্ন একটা মরূদ্যান তৈরি হচ্ছিল তার হদিস যখন তুমি প্রথম টের পেয়েছিলে তখন তোমার মধ্যে একটা ভয়ংকর ভাঙাগড়ার তাণ্ডব চলছিল। তুমি জেনে গেছিলে যে তুমি শেষ হয়ে গেছ, তোমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু দিন যাপনের দৈনন্দিনতার গ্লানি। তোমাকে সকলে মিলে নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে তোমার জীবন আছে যৌবন নেই, শরীর আছে সৌন্দর্য নেই, বাসস্থান আছে গৃহ নেই; তুমি জানতে তোমার মা আছে স্নেহ নেই, দাদা-দিদি আছে ভালবাসার ক্ষেত্র নেই, সমাজ আছে কিন্তু সংসার নেই। এই এতো নেই নেই এর মাঝে হঠাৎই যখন তোমার জীবনে ধীরে ধীরে একটা মাসিমা এলেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখের সান্ত্বনা, দুঃসময়ের শান্তি আর দিনান্তের স্নেহাঞ্চলখানিও সহজলভ্য হয়ে দেখা দিল; যখন হঠাৎই কিন্তু ধীরে ধীরে অতি নিকটে একজন অন্য-দৃষ্টি পুরুষের আবির্ভাব ঘটল যার সকল দায় সমস্ত দায়িত্ব নির্লোভ, নিঃস্বার্থ

পালন করতে মনে কোনও দ্বিধার অবকাশ রইল না ; যখন একাধিক ছোট ছোট কিশোর-মন তোমার মধ্যে 'দিদি'-র সান্নিধ্য-সুখটুকু অকাতরেই আহরণ করে নিতে লাগল, তখন তুমি তোমার কর্কশ জীবনের মধ্যেও প্রাণের উৎসরণ খুঁজে পেলে, মনের গভীরে ভালবাসার পদধ্বনি শুনতে পেলে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে দখিন হাওয়ার আনাগোনা অনুভব করতে লাগলে। তোমার বয়সে এবং সময়ে, তোমার বিন্যস্ত মনে এবং চেতনায় এই জাগৃতি তোমাকে আঘাত দিল, ভেঙে দিতে চাইল। তাই তুমি তখন তীরবিদ্ধ পাখির মতো ছট্‌ফট্‌ করছো মনে মনে। একবার ভেবেছো 'এ আমার কি হল', একবার ভেবেছো 'বোনের মুখের গ্রাসের প্রতি এ আমার অন্যায় লোলুপতা'। ভিসুভিয়াস পম্পাই নগরীকে ঢেকে দিয়েছিল, ধ্বংস করে বিনষ্ট করে ফেলেছিল। তোমার মধ্যে যে ভিসুভিয়াস জেগে উঠেছিল তাকে আমি বিলম্বে হলেও টের পেয়েছিলাম। সেই অগ্ন্যুৎগারে তুমি ভেঙে-চুরে একেবারেই অন্য তুমি হয়ে গেলে। তুমি হঠাৎই স্থির হয়ে গেলে। তারুণ্যের সলজ্জতা তোমার পায়ে বেড়ি পড়াল, যৌবনের চেতনা তোমার চোখে আবেশ টেনে দিল, প্রাণের আবেগ মাঝে মাঝেই চোখের জল হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

এই সময়েই মা বললেন 'কি হয়েছে'। আমি ভাবলাম গৃহ-অশান্তি। মা বললেন 'মায়ের কটুকথা বা দাদার শাসন' ; আমি মনে করলাম ছোট বোনের জন্যে বড়র দুশ্চিন্তা। এবং, দু'চার দিনেই ঠিক হয়ে যাবে—বলে আমরা মাতা-পুত্র অন্য বিষয়ে মন দিলাম। কিন্তু দু'দিনের জায়গায় বহুদিন চলে গেল। ঠিক আর হল না। তুমি আর তেমন করে বাইরে আস না। আমাদের ঘরে আস না। তোমার পায়ের সহজ গতি এখন কেমন যেন আড়ষ্ট। ছোট ছোট সন্তানের বড় বড় প্রশ্নে মা বিব্রত বোধ করেন। তুমিও ওদের এড়িয়ে যাও। তোমাদের দ্বৈত পদচারণা এখন আর স্বাভাবিক নয়। একজন থাকে দূরে। যখন আসে তখনও কেমন যেন অতীত আর তেমন করে বর্তমান হয় না। কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, কোথায় যেন কি ছিল আর কি নেই হয়ে গেছে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্রই। তোমাদের তরফ থেকে প্রস্তাব গুণ গুণ করে মায়ের কানে এলো। মা মিন মিন করে সমর্থনসূচক "ছেলে জানে" বলে পাশ কাটালেন। শুনে তোমার মা মুখ ঘুরিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলেছিলেন,

'দাড়ি কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেবো!' তুমি তখন অনেক চেঁচিয়েছিলে। নিজের বোবা অন্তরকে হাড়িকাঠে চড়িয়ে বোনের ভবিষ্যতের সার্থকতা চেয়েছিলে। আমার দুর্বাসা-দৃঢ়তা সব আগুনে বালি ঢেলে দিল। তাপ বাড়ল অনেক, অনেকের। উত্তাপ ছড়ালো অনেক দূর, অনেক তীব্র। হিমালয় হিমেল অনড়। যে প্রেমে বিসর্জন নেই, ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই; যে প্রেম সহানুভূতির অভাব সূচনা করে, যে প্রেম জালবিস্তারে আগ্রহী করে আর যে প্রেম ভালবাসার টানের চাইতে জালের বন্ধনকে বেশি উপযোগী বলে মনে করে সে প্রেম প্রেম নয়, তা একধরনের অস্ত্র, এক মিথ্যাচার একটি কৌশল মাত্র।

তাই যা হতে পারতো তা হল না, আর যা হবার কথা নয় তাই ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলো। একজন তার বর্ণে-গন্ধে-সুরে ভরা আত্মাভিমান নিয়ে হারিয়ে গেল, অন্য জন তার ত্যাগে, বঞ্চনায়, আন্তরিকতায় ভরপুর আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে কাছে এসে গেল। তোমার অপরাধবোধ তোমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে, তোমার প্রাপ্তিকে তুমি অপরের বঞ্চনার ভিতে প্রতিষ্ঠিত দেখে বিমূঢ় বোধ করেছো, মমতা বোধ থেকে যে নৈকট্য তাকে ভালবাসার আসনে বসাতে তোমার মন সাড়া দেয় নি, এবং অতি-পরিচয় অতি-ঘনিষ্ঠতা তোমার মনে দ্বন্দ্বের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে।

একথা সত্য যে তোমার প্রেম গঙ্গার পাড়ে বৃক্ষতলে নিজের পাপড়ি মেলেনি। তোমার ভালবাসা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উন্মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে নি। একথা সত্য যে তুমি দীর্ঘশিহরিত প্রেম-জ্বরের অনুভব থেকে বঞ্চিত থেকেছো! অকারণ আজে-বাজে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ঘণ্টাভর সময়কে মুহূর্তমাত্র মনে করে তোমার সময়ের উচ্ছলতাকে তুমি অনুভব করতে পারনি। এ সব সত্যের মধ্যে সবথেকে বড় সত্য যা তুমি খুঁজে পেয়েছিলে তা হল একটা সত্যি জীবন। একটা সংসার, একটা গৃহ। স্নেহের নীড়, সান্ত্বনার আচ্ছাদন আর শান্তির আশ্রয়।

তোমার এই পাওয়াটাকে তুমি দুর্মূল্য নয় অমূল্য বলে মনে করেছো। তোমার সন্দেহ ছিল অসীম। নিজের অযোগ্যতা বোধই তোমাকে পীড়ন করেছে সর্বাধিক। তুমি প্রেমের পথে আসনি এসেছিলে বন্ধুর পথে। বন্ধুত্বের পথে। আর আর সকলে যখন তোমার বাইরেটা দেখেছে তখন তুমি

তোমার অজান্তেই তোমার ভিতরটাকে আমাদের কাছে, আমার কাছে পরিষ্কার তুলে ধরেছো। তুমি তোমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়েই আমাদের সকলের, সংসারের এবং আমার ভাল চাইতে। আমার ঘরে প্রবেশ করার কোনও বাসনা নিয়ে তুমি কোনও পরিকল্পনা কর নি। তাই আমি যখন তোমার হাত ধরে আমার ঘরের মাঝখানটিতে নিয়ে আসতে চাইলাম তখন তুমিই সর্বপ্রথম অনেক বাধার কাঁটাতারের উল্লেখ করলে, অনেক সম্ভাব্য বিপত্তির সন্ধান পেলে। তোমার জীবনের সম্ভাব্য মরুদ্যানের চাইতে আমার জীবনের লক্ষ্যটাই তোমার বেশি ভাবনার ছিল। দুশ্চিন্তা ছিল আমার মা, দিদি এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। দুশ্চিন্তা ছিল তোমার। তখন আমার ইচ্ছাটা তোমার ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করলেও, তুমি নিজেকে স্বতন্ত্র করেই দূরে রাখতে চেয়েছিলে। যেন, তুমি ভেবেছিলে, তোমার জীবনের কালো ছায়া আমার জীবনের উজ্জ্বলতাকে না মেঘাচ্ছন্ন করে।

আমার জীবনে তখন ঝড়ের গতি, গিরি উল্লঙ্ঘনের অমেয় শক্তি আর বৈদ্যুতিক চেতনার তড়িৎ তেজ। তাই তুমি উড়ে গেলে, ঝরে গেলে এবং হারিয়ে গেলে আমার ইচ্ছার কাছে। এবং একই গতি হল সকল বাধা, সমস্ত বিপত্তির। পরিকল্পনা, পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং তোমাকে আমাদের গৃহে প্রতিস্থাপন করতে আমার লেগেছিল পক্ষকাল। কারণ সময় ছিলনা সময় নষ্ট করার মতো। সামনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছিল যে!

তোমার তুমিকে একেবারেই পাল্টেদিয়ে আমার তুমিতে পর্যবসিত করেছিলাম। এখানেই তোমার তুমি আর আমার তুমির তফাৎ। একটা ছন্নছাড়া অস্থির-অস্তিত্ব তুমির উত্তরণ, পরিবর্তন। বলা যায় অভ্যুদয়। সেই তুমির মধ্য থেকে একটা এই তুমির অভ্যুদয়।

তার পরের তুমিটা আমার গার্হস্থ তুমি। সংসারী তুমি। মাতা, ভগ্নী কন্যা তুমি। বন্ধু তুমি, প্রিয় তুমি, সখা তুমি আর অভিভাবক তুমির নবযাত্রা।

এই তো তোমার কথা। এর মধ্যে লেখার মত কিই বা আছে, কিই বা থাকতে পারে?

———

লেখকের অন্য বই প্রসঙ্গে মতামতের উদ্ধৃতি

১। এবং ভাঙাকুলো

কবি প্রাবন্ধিক শ্রীসুনীল কুমার নন্দী বলেন—

"ব্যক্তিগত প্রবন্ধমালার একটি মনোগ্রাহী সংকলন।······ভাষারীতি সংযত গতিশীল ও তির্যক-তীক্ষ্ণ; কোথাও গুরুগম্ভীর নয়। ধূসর পাতায় জ্ঞান, নীতিবাক্য বা অযাচিত পাণ্ডিত্য বর্ষণের চেষ্টা নেই তাঁর কলমে।"

"গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ২৪ টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলিত। এক একটি গদ্য যেন জীবনের এক একটি দিকের পুনর্বিবেচনা। সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে শৈশবের মধুর স্মৃতি, বল্গাহীন তারুণ্য, প্রৌঢ়ত্বের স্থিরতা, বার্ধক্যের সংকট। কিছু গদ্য···জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক চিন্তার সূত্র খুলে দেয়···যেন মৌলিক অনুভবের সংহত আবেগময় অভিব্যক্তি।"

"কী ভাবে এক জীবন পাল্টে যায় অন্য জীবনে—সংসারের নিয়মে, প্রকৃতির নিয়মে, রক্তের নিয়মে। একদিন বার্ধক্য এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে এবং মানুষ তখন 'ভাঙাকুলো' অথবা 'বেবিসিটার'। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখক পরিবেশন করেছেন প্রয়োজনীয় মানসিক আয়োজনসমূহ।"

"গ্রন্থটিতে সময় মনে হয় নিজেই একটি চরিত্র।······যৌবনে মানুষ সময়কে ঝড় হিসেবে পেতে চায়। আবার 'পারানির কড়ির প্রার্থনায় অঞ্জলিবদ্ধ অপেক্ষা যখন অনিবার্য"—তখন যুদ্ধ নয়; স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের প্রত্যাশা সময়ের কাছে। এমনতরো মহৎ উপলব্ধির শরিক হবেন পাঠক গ্রন্থটিতে···।"

এবং শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"···তাই বোধহয় লঘুপদ প্রজাপতির মতই কখনও তিনি মুক্তপক্ষ, শুধুমাত্র বৈচিত্রের ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত প্রগাঢ় অনুভূতিগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন তখন তার নন্দিত সঞ্চরণ।·········বিষয় নির্বাচনে আকাশই তাঁর সীমানা। ·····এক মনকে নিয়েই কত যে তাঁর বক্তব্য যার বর্ণালি পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। অসংখ্য কঠিন কথা তিনি পর্যাপ্ত সহজ করে বলতে পারেন। ···অভিজ্ঞতার উদ্ভাস রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে দ্যুতি ছড়ায়, কিন্তু আলোর সেই ঝলকানিতে পাঠকচিত্ত ধাঁধিয়ে না গিয়ে ঝলমল করে ওঠে।······শানিত কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে স্নিগ্ধ তাঁর বাকভঙ্গিটির বাঁধন কখনও কখনও এমনই সহজ আর সাবলীল যে পাঠকের পক্ষে বিনা আয়াসেই চড়াই উতরাইগুলো পার হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায়; তখন তাঁর মনে হতেই পারে যে জীবনের বাঁকে বাঁকে এত যে কথা আছে পর্বে পর্বে এত যে অনুভাবনা আছে, সেগুলি একান্ত আপন হয়েও এমন করে তো ধরা দেয় নি এতদিন!"

২। এবং প্রেম-অপ্রেম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেন—

'অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের গল্প সংকলন 'এবং প্রেম অপ্রেম' এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। লেখক পেশায় দর্শনের অধ্যাপক নেশায় জীবনের রূপকার। তাঁর ছোট গল্প জাতে সত্যি ছোট গল্প। কয়েকটি অনু-গল্পও আছে।···শ্রীভট্টাচার্য ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া নরনারীর জীবনের প্রতি একটা গূঢ় আকর্ষণ বোধ করেন।·· অনুচ্চকণ্ঠে নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এই সব ভাঙগা মাস্তুল নরনারীর ছবি এঁকেছেন লেখক।

"···রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয়েছে এমন কিছু ছোট গল্প বা কবিতা এবং এমন কিছু কবিতা যা ছোটগল্প।···ছোট গল্পে কাব্যধর্মিতা বা কাব্যিক মেজাজ থাকলেও তাতে সোশ্যাল রিয়েলিটির প্রকাশ ঘটানো যায়।···শ্রী ভট্টাচার্য এই শিল্প সত্য জানেন এবং আয়ত্তে এনেছেন এর শিল্পপ্রকরণ। তাঁর পরিচায়ক প্রথম তিনটি গল্প···বস্তুত এই তিনটি গল্পে যে জীবনানুভূতি, কাব্যময়তা, শিল্প দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা তারিফ করার মতো।···

"···শতাব্দীর সায়াহ্নে এমন সব গল্প পড়ার সুযোগ দিয়েছেন বলে গল্পকার শ্রী অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

ঐ একই বই প্রসঙ্গে শ্রীসুনীল আচার্য পূর্বাভাষে বলেন—

"কিছু গল্প আর কয়েকটি ফিচার নিয়ে সংকলিত এই বইটি পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত। কখনও কৈশোরের আবেগানুভব, কখনও যৌবনের হৃদয়ানুভূতি কখনও বা পৌঢ়ত্বের জীবন জিজ্ঞাসা রচনাগুলির কেন্দ্রমূলে. কিন্তু সব কিছুকেই এক মানবিক মানদণ্ডে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াসে লেখকের আন্তরিকতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। ভিন্নধর্মী স্বাদের বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল লেখাগুলি পড়ে পাঠক তৃপ্তি পাবেন···আবেগের যে ঘূর্ণি নিরন্তর দ্বন্দ্বের অভিঘাত আনে···লেখকের বর্ণনায় তার পরিচয় পেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই।

"বইটিতে কিছু প্রেমের গল্পও আছে যার কয়েকটি আবার রোমান্টিক ধর্মী।···'তুমি ও সময়' গল্পে···আপ্লুত পাঠক অনায়াসে চলে যেতে পারেন রোমান্টিক কবি Keats-এর কাব্যভাবনায় যেখানে অনবদ্য চিত্রকল্পে কবি বলে ওঠেন—Bold lover, never never canst thou kiss···For ever wilt thou love and she be fair."

৩। এবং জল বাংলার মনচিত্র

"এবং জল বাংলার মনচিত্র" প্রসঙ্গে ভূমিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীশৈবাল মিত্র বলেন—

"অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য-এর 'এবং জলবাংলার মনচিত্র' গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি পাঠের সময়ে আচম্বিতে পুষ্পভারানত একটি গাছ আবিষ্কারের রোমাঞ্চ জাগলো।···লেখক এমন এক শৈলী উদ্ভব করেছেন, যার মধ্যে সাহিত্যের পরিচিত আঙ্গিকগুলির প্রায় সব লক্ষণ মিশে স্বতন্ত্র এক আকার গড়ে তুলেছে···"

"অর্ধেন্দুবাবুর স্মৃতিচারণায় দার্শনিকতার সঙ্গে আছে সরসতা, সারল্য।···প্রথম হলেও পরিণত, পোক্ত রচনা। পাকা লাঠিয়ালের মতো পয়লা আঘাতেই তিনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর নৈপুণ্যে পাঠক যে বিমোহিত হবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।"

ঐ একই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্যিক শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"সচেতনে বা অবচেতনে আবেশময় প্রকৃতির রসে সম্পৃক্ত হয়নি এমন বাঙ্গালীমনন সংখ্যায় সম্ভবতঃ নগণ্য। পটভূমি পূব বাংলার দিগন্ত প্রসারী পরিবেশ প্রতিবেশ এবং মনীষা ··সৃজনশীল, সংবেদনশীল।···সেখান থেকে তুলে আনা কিছু সোনালী ফসলের সম্ভার নিয়ে এই বইটির আত্মপ্রকাশ। এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর ঝিলিক···রসসৃষ্টির নিরিখে তিনি (লেখক) চিরন্তনের পাষাণে নিজের আখর চিহ্নিত করেছেন নিঃসন্দেহে।"

৪। দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা

"দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার এমন যে এক আলো উদ্ভাসিত সহজ সরল সরণী থাকতে পারে সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের লেখায় আমরা অবশেষে তার হদিস পেয়ে যাই। বাংলাভাষী পাঠকের দরবারে এ বিষয়টিতে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে পূর্বসূরির আসনে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

—শ্রীসুনীল আচার্য ।।

৫। এবং ভূত

'এবং ভূত' প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপির শ্রোতা-পাঠকেরা কি বলেন ?

তুলিকা (৮) : ডিটেকটিভ গল্প সব থেকে ভাল লেগেছে আমার। আমাদের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি গুলো আছে, ঝগড়া আছে, সেগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।

পাপাই (১০) : অনেক মজা আছে। হাদান আর বনমালীর জন্যে কষ্ট হয়েছে। চোর ধরার ব্যাপারটা দারুণ ভাল লেগেছে। অন্য ভূতের গল্পে শুধু ভয় থাকে। তোমার গল্পে আমরা জড়িয়ে গেছি—এটা খুব ভাল লেগেছে। আমাদের ঝগড়াগুলো দারুণ জমেছে।

টুকান (১৩) : ভূত, গোয়েন্দাগিরি, মিনি-পুষি এবং হাজুকাকার ভূত, ছিনাথের ভূত—সব একসঙ্গে এসেছে বলে বেশি ভাল লেগেছে। ছোটদের, আমাদের, ঝগড়া-তর্ক—এসব বেশ নোতুন, বেশ ইন্টারেস্টিং হয়েছে। লেখার মধ্যে একটা মজা যেন সর্বক্ষণ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বলার কায়দাটা সব সময়েই টেনে ধরে রাখে।

শ্রীজয় (২২, বিজ্ঞান-ছাত্র) : জোর দিয়েই বলতে পারি যে এই গল্প সম্ভারের প্রতিটা গল্পই নিজ নিজ বিষয় সাপেক্ষে এক একটি ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ভূত সম্বন্ধীয় গল্পগুলো আমার পড়া অন্যান্য ভূতের গল্প থেকে একেবারেই আলাদা। আমার মত অন্যান্য যুক্তি এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের এই গল্পগুলি ভাল লাগবে।

সানুশ্রী (অধ্যাপিকা) : কিশোর মনের এলোমেলো চলার সেই চিরচেনা পথে 'এবং ভূত' এক নতুন মোড় এনেছে। লেখকের চিন্তার পরিশীলনে এবং প্রকরণনৈপুণ্যে ফেলে আসা সেই ভূত-প্রেত, পুতুল-মিনির পুরোনো জগৎটাই নতুন চোখে দেখার সুযোগ পেলাম।

সমীর (৬২) : 'এবং ভূত' শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও অনাবিল আনন্দ দেবে।

সুনীল (৬২) : 'এবং ভূত' গ্রন্থের গল্পগুলিতে এক মোহময় অথচ দৃপ্ত সুরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য যা টানটান আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে পাঠককে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখবে। হাজুকাকার চরিত্রটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি, যিনি অত্যন্ত নাটকীয় রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোটদের হাজুদাদু হয়ে সারাসরি গল্পের আসরে হাজির হয়ে সকলকে মাতিয়ে যান। এমন কি শ্রীনাথ বহুরূপীও এসে যায় তাঁর আকর্ষণে।

'এবং ভূত' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নবতম সংযোজনই শুধু নয়, এক অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষাও।